কোরআন শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

কোরআন শরীফ

বাঙ্গলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তফছির

দ্বিতীয় খণ্ড
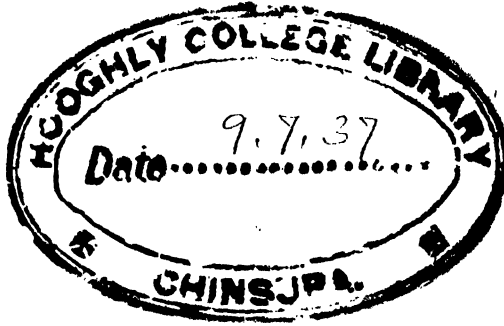
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রকাশক
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী বুক এজেন্সি
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

— সাড়ে তিন টাকা —

প্রিণ্টার
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

সূচী—টীকা অনুসারে

(বিষয়ের পার্শ্বে পৃষ্ঠার ও বন্ধনীর মধ্যে টীকার সংখ্যা দেওয়া হইল)

অ — অ — অ

আ — আ — আ

ভ্রম-সংশোধন—৩৯ পৃষ্ঠায় ৩৪২নং টীকা ভুলক্রমে ২৪২ বলিয়া ছাপা হইয়াছে এবং এই ভুল শেষ টীকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমটা সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব।

আ—জের

ই — ই — ই

ঈ — ঈ — ঈ

উ — উ — উ

এ — এ — এ

ও — ও — ও

ক — ক — ক

খ — খ — খ

গ — গ — গ

ছ — ছ — ছ

জ — জ — জ

ত — ত — ত

দ — দ — দ

ধ — ধ — ধ

ন — ন — ন

প — প — প

ফ — ফ — ফ

ফ—জের

ব — ব — ব

ভ — ভ — ভ

ম — ম — ম

ম—জের

য — য — য

র — র — র

ল — ল — ল

শ — শ — শ

শ—জের

স — স — স

হ — হ — হ

য় — য় — য়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নিশ্চয় আমার সব প্রার্থনা-সব উপাসনা, আমার সব সাধনা-সব কোর্‌বান, আমার সকল জীবন-সকল মরণ —সকল বিশ্বের স্বামী আল্লার নামে নিবেদিত

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ !

প্রভুহে !

নিজের দীন-দাসের পক্ষ হইতে ইহাকে কবুল কর নিশ্চয় তুমিই ত সম্যক্‌শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা !

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا !

প্রভুহে !

যদি ভুলিয়া যাই বা ভুল করিয়া ফেলি—সেজন্য এই দুর্ব্বল দাসকে দায়ী করিও না !

আমীন !

সূচীপত্র

(রুকু' অনুসারে)

কোরআন শরীফ

ছুরা আলে-এমরান

নাম করণ ঃ—

এই ছুরার ৩২ আয়তে আলে-এম্‌রান বা এম্‌রান বংশের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই এই নামকরণ হইয়াছে। হজরত মূছা ও হজরত হারুণের পিতার নাম ছিল এম্‌রান। সুতরাং আলে-এম্‌রান বলিতে হজরত মুছা ও হারুণের বংশধর বা আধ্যাত্মিক সন্তানদিগকে বুঝাইতেছে।

সময় ঃ—

সম্পূর্ণ আলে-এম্‌রান ছুরাটী যে হেজরতের পর মদিনায় নাজেল হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্তের মধ্যে যে এই ছুরা প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ ছুরাটী সম্বন্ধে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলার মত কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ আমার হস্তগত হয় নাই। তবে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্যে এবং প্রাসঙ্গিক হাদিছে এই ছুরার প্রকাশ-কাল সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

(১) এবনে-আব্বাছের এক বর্ণনায় জানা যায়—এই ছুরার ১১ ও ১২ প্রভৃতি আয়ত বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এহুদীদিগের আস্ফালনের উত্তরে নাজেল হইয়াছিল (আবুদাউদ, বায়হাকী)। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ২য় হিজরীর মধ্যভাগে। সুতরাং এই আয়তগুলি ২য় হিজরীর মধ্যভাগে বা তৎপরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

(২) ১৩ রুকু'তে এবং তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য কতিপয় আয়তে ওহোদ যুদ্ধের স্পষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত আছে। ওহোদ যুদ্ধ ৩য় হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এই আয়তগুলি ৩য় হিজরীতে বা তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৩) হজরত রছুলে করিম 'হরকল' বাদশাহ বা Heracleusকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই ছুরার ৬৩ আয়তটী সেই পত্রে অবিকল ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই পত্র লিখিত হয় হিজরীর ৬ষ্ঠ সনে। অতএব আয়তটী ঐ সময়ের পূর্ব্বে নাজেল হইয়াছিল।

(৪) নজরানের খৃষ্টান-ডেপুটেশন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল নবম হিজরীর শেষভাগে—অথবা দশম হিজরীর প্রাক্কালে। ছুরার ৬০ আয়তে এবং অন্যান্য কএকটা আয়তে এই ডেপুটেশন-প্রসঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ঐ আয়তগুলি যে নবম হিজরীর শেষভাগে বা তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই ছুরার প্রথমভাগে খৃষ্টানদিগের ভ্রান্ত-ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও নাজরান-ডেপুটেশন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ বলিয়া কথিত হয়।

(৫) এই ছুরার ৯৬ আয়ত দ্বারা হজ ফরজ হওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে হজ ফরজ হইয়াছে ৯ম হিজরীতে, জিল্‌কা'দ মাসের পূর্ব্বে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই আয়তটী—এবং ইহার প্রাসঙ্গিক অন্য আয়তগুলি—নিশ্চয়ই নবম হিজরীর শেষভাগে অবতীর্ণ।

শিক্ষা :—

সমস্ত উপকরণ-উপলক্ষের মধ্যে ধর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে—আল্লার সত্যকার তাওহিদকে দুনয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিক্ষিপ্ত বিশ্বমানবকে এক অচ্ছেদ্য প্রেম-পাশে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগুলি অবস্থাগতিকে প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক ও সাময়িক রূপ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সেগুলির ছিল না। মানব সমাজের তাৎকালিক অবস্থা অনুসারে তখনকার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অনাগত-অপেক্ষিত বিশ্বধর্ম্মের জন্য, নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যাওয়ারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, পরবর্ত্তী অবিশ্বাসী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের দ্বারা তাঁহাদের মূল শিক্ষাগুলিও এমন মারাত্মকরূপে বিকৃত হইয়া পড়িল যে, সেই অপেক্ষিত-অনাগত বিশ্ব-ধর্ম্মের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরিবর্ত্তে, সেই বিকৃত ধর্ম্মগুলি সেখানে বিষ-কণ্টকের বীজই বপন করিয়া যাইতে লাগিল।

বিক্ষিপ্ত বিশ্ব-মানবকে সংহত ও সম্মিলিত করিতে হইলে, তাহাদের সকলের অন্তরের অন্তস্তলে এমন একটা কেন্দ্রের অনুভূতি জাগাইয়া দিতে হইবে, যাহা সকলের পক্ষে সমান ও সাধারণ, সকলের প্রতি যাহার সমান স্বাভাবিক আকর্ষণ। বিশ্বমানবের সেই একমাত্র সম্মিলন-কেন্দ্র হইতেছেন—আল্লাহ! কিন্তু ধর্ম্মের শোচনীয় বিকার ফলে আল্লার সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ একেবারে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্র সংক্রান্ত সেই অজ্ঞতাই তখন দুনয়ার বিভিন্ন মানবসমাজকে ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়া পরস্পর হইতে আরও বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের প্রতি আরও বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিল।

ছুরা বকরায় আমরা দেখিয়াছি, আল্লাহ মুছলমানকে এক নিরপেক্ষ মহান জাতিরূপে অভ্যুত্থিত করিয়াছেন—ধর্ম্মের নামকরণে জগৎময় প্রচারিত এই বিকারের সংশোধন করিতে,

আল্লার তাওহীদকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে সেই অভিপ্সিত প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে, এবং সেজন্য পূর্ব্বকার সাময়িক প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলির সারশিক্ষা-সকলকে একত্র সমন্বিত করিয়া যুগযুগের আকাঙ্ক্ষিত সেই আদর্শ-ধর্ম্মকে তাহার সুন্দর ও বিরাটরূপে প্রকট করিয়া তুলিতে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ছুরা বকরায় প্রধানতঃ এহুদীজাতির ধর্ম্ম ও সংস্কারগুলির সমালোচনা করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। আলে-এম্‌রানে প্রধানতঃ খৃষ্টানজাতির ধর্ম্ম ও সংস্কারের বিচার করা হইতেছে।

বিভিন্নমুখী শাস্ত্রবাদী ও সংস্কারবাদী ধর্ম্মগুলির সমন্বয় যে কিরূপে হইতে পারে, এই ছুরায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্বন্ধ :—

ছুরা বকরার সহিত এই ছুরার শিক্ষা ও বর্ণনাগুলি যে কত গভীর এবং কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, কোর্‌আনের চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নে তাহার সামান্য একটু আভাষ দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি :—

(১) ছুরা বকরার শেষ আয়তে মুছলমান প্রার্থনা করিতেছে—"হে আমাদের প্রভু! কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর!" আলে-এম্‌রানে বদর ও ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গে সেই প্রার্থনার পূর্ণ সফলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বকরায় জেহাদের আদেশ ও উপদেশ, জেহাদের অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা—আর এখানে বাস্তব জেহাদ, প্রত্যক্ষ অগ্নিপরীক্ষা। বকরায় তালুতের সমর যাত্রার যে উপাখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে, আলে-এম্‌রানে হজরতের ঐ সব যুদ্ধযাত্রায় অক্ষরে অক্ষরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইতেছে। সেখানে সংখ্যাগুরু ও শক্তিগুরুর জয়পরাজয় সম্বন্ধে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে—বদর সমর সেই ভাবের বাস্তব অভিব্যক্তি।

(২) বকরায় বলা হইয়াছে—আল্লাহ কা'বাকে মুছলমানের কেবলা ও কেন্দ্র করিয়াছেন। কিন্তু মুছলমান তখন কা'বা ও মক্কা হইতে নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত। সেখানে প্রবেশ-অধিকার লাভের কোন আশাও তখন বাহ্যতঃ তাহাদের ছিল না। আলে-এম্‌রানে সেই ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইতেছে, মক্কা-বিজয়ী মুছলমানের উপর কা'বার হজকে এখানে ফরজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ছুরা বকরায় সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের কথা নীতির হিসাবে বলা হইয়াছে। আর এখানে ৬৩ আয়তে (ও অন্যান্য আয়তে) ধর্ম্মসমন্বয়ের এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত সংঘর্ষ নিবারণের বাস্তব ও সঙ্গত উপায়গুলি স্পষ্টতঃ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

(৪) বকরায় উপদেশের হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই। হজরত রছুলে করিম জীবনের শেষভাগে এই উপদেশকে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, নজরান-ডেপুটেশন প্রসঙ্গে এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে।

(৫) মৃতজাতির নবজীবন লাভের উপাখ্যান ছুরা বকরায় মুছলমানের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে—ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হিসাবে। আলে-এম্‌রানে সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে পরিণত হইয়া বকরার বর্ণিত ইঙ্গিত বাস্তব সত্যরূপে উজ্জল হইয়া উঠিতেছে।

আয়ত-সংখ্যা :—

সাধারণ গণনা অনুসারে এই ছুরায় মোট দুই শত আয়ত ও ২০টী রুকু' সন্নিবেশিত আছে।

কোর্‌আন শরীফ

৩। ছুরা আলে-এম্‌রান

٣ - سورة آل عمران

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

بسم الله الرحمن الرحيم

১ আমি আল্লাহ্ জ্ঞানময়,—[৩২১]

২ আল্লাহ্ !— তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই, চিরঞ্জীব তিনি স্বয়ংসত্ত্ব ও বিশ্ব-সত্ত্বার কারণ তিনি ;—[৩২২]

৩ তিনি তোমার প্রতি কেতাব নাজেল করিয়াছেন সত্যসহকারে - যাহা নিজ-অগ্রবর্ত্তীর তছদিক করে,[৩২৩] এবং তিনি তাওরাৎ ও ইঞ্জিলকে ইতিপূর্ব্বে নাজেল করিয়াছিলেন - মানবের পথ-প্রদর্শনের জন্য,[৩২৪] সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোর্কানও নাজেল করিয়াছেন[৩২৫] ; নিশ্চয় আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করে যাহারা - তাহাদিগের জন্য কঠোর দণ্ড (নির্দ্ধারিত) আছে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন প্রবল, প্রতিফলের মালিক ;—[৩২৬]

١ الٓمٓ ۚ

٢ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

٣ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ

৪ নিশ্চয় (তিনিই-ত) আল্লাহ্ - যাঁহার নিকট কি মর্ত্তের, কি স্বর্গের, কোন বস্তুই গোপন থাকিতে পারে না।[৩২১]

٤ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۗ

৫ সেই-ত তিনি, যিনি তোমাদিগকে জরায়ুতে যেরূপে ইচ্ছা আকার দান করেন ; তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহ্ নাই— প্রবল, প্রজ্ঞাময় তিনি।[৩২৮]

٥ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

৬ সেই-ত তিনি, যিনি তোমার প্রতি কেতাব নাজেল করিয়াছেন - তাহার কতকাংশ 'মোহক'ম' আয়ত - সেইগুলিই কেতাবের মূল - এবং অন্যগুলি হইতেছে 'মোতাশাবেহ্' ; ফলে যাহাদের মনে আছে কুটিলতা, তাহারা কিন্তু (কেবল) উহার 'মোতাশাবেহ্' আয়তগুলির পাছ লাগিয়া যায় — বিসম্বাদ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এবং উহার (নিজেদের মন মত) তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে, অথচ তাহার তাৎপর্য্য কেহই অবগত নহে - কিন্তু আল্লাহ্ - ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ - তাহারা বলিয়া থাকে—আমরা উহাতে

٦ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ

يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ ◎

বিশ্বাস করিয়াছি-(মোহক'ম ও মোতাশাবেহ্-) সমস্তই আমাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে (সমাগত),—বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না[৩২৯]।

٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ◎

৭ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পথ দেখাইবার পর আমাদের হৃদয়গুলিকে আর অসরল হইতে দিও না, এবং আমাদিগকে নিজ হুজুর হইতে করুণাদান করিও! নিশ্চয় তুমি-তুমিই ত হইতেছ পরম দাতা[৩৩০]।

٨ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ع ◎

৮ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি (যে) একদিন জনগণকে একত্র সম্মিলিত করিবে-তাহাতে সন্দেহ নাই ; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনই ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না[৩৩১]।

টীকা :—

৩২৯ **আলেফ-লাম-মীম :—**

কোর্‌আনের কতকগুলি ছুরার প্রথমে এই শ্রেণীর কএকটা বর্ণ সাধারণতঃ এগুলিকে 'মোতাশাবেহ' বলা হয়। এই ছুরার ৬ষ্ঠ আয়তের প্রমাণ দিয়া ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, 'মোতাশাবেহ' আয়তগুলির অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই অবগত হইতে পারে না। ইহার অনুকূলে হজরতের ছাহাবী আবদুল্লাহ-এবনে-মছউদ ও আবদুল্লাহ-এবনে-আব্বাছের অভিমতকে গুরুতর প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হইয়া থাকে।

অথচ এই দুইজন ছাহাবীই 'আলেফ-লাম-মীম' বর্ণত্রয়ের অর্থ করিয়াছেন—"আমি আল্লাহ জ্ঞানময়" বলিয়া। (১নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩২২ **হাইও-কাইয়ুম** :—

ছুরা বকরার ২৬৮ টীকায় এই শব্দ দুইটীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ছুরার প্রাথমিক আয়তগুলি খৃষ্টানদিগের মতবাদের বিচার প্রসঙ্গে এবং সম্ভবতঃ নাজরান-ডেপুটেশনের খৃষ্টানদিগের প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

কোন্ ধর্ম্ম সত্য আর কোন্ ধর্ম্ম মিথ্যা, তাহার বিচার করা যাইতে পারে সকল ধর্ম্মের স্বীকৃত একটা সাধারণ নীতিকে মানযন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, একমাত্র তাওহীদ ব্যতীত আর কিছুই সেই সাধারণ মানযন্ত্ররূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। এই মানযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আল্লার স্বরূপ ও সত্বার জ্ঞান সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম দুন্য়ায় কি বিকার ও বিপর্য্যয় আনয়ন করিয়াছে—ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য হইতে খৃষ্টানগণ কতটা ভ্রষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য খৃষ্টানদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রারম্ভে কোর্‌আন আল্লার কএকটা গুণের উল্লেখ করিতেছে। আল্লাহ জ্ঞানময়, আল্লাহ অদ্বিতীয়, আল্লাহ চিরঞ্জীব, এবং আল্লাহ কাইয়ুম অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে ধারণ করেন এবং সৃষ্টির সমস্ত বস্তু তাঁহাকে ধারণ করিয়াই কাএম হইয়া আছে। কিন্তু খৃষ্টানেরা যীশুকে, পবিত্রাত্মাকে, এমন কি যীশু-জননী মেরিকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করিতেছে। ইহাতে আল্লার অদ্বিতীয়-গুণকে অস্বীকার করা হইতেছে। অথচ আল্লার শরিক মানা আর তাঁহাকে অস্বীকার করা একই কথা। ফলতঃ ত্রিত্ববাদের প্রচার করিয়া খৃষ্টানেরা ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য এবং ধর্ম্ম সাধনার চরম আদর্শেরই বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছে—সুতরাং তাহা মিথ্যা ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে যীশুকে খৃষ্টানেরা ঈশ্বর বলিতেছে, অথচ নিজের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধেই তিনি অজ্ঞ ছিলেন—জ্ঞানময় হওয়া ত দূরের কথা। খৃষ্টানদিগের স্বীকৃতি মতেও তিনি অত্যাচারী এহুদী শাসনকর্ত্তার হাতে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—জাল্লাদের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এমনভাবে নিজকেই রক্ষা করিতে অসমর্থ যিনি, নিজেই জরা-মরার অধীন যিনি, তাঁহাকে ঈশ্বর বলার মত অজ্ঞতা আর কি হইতে পারে? এইরূপে কোর্‌আন এখানে বিচারের মানযন্ত্র বা তাওহীদের স্বরূপকে খৃষ্টানদিগের মোকাবেলায় অতি সঙ্গত ভাষায় প্রকাশ করিতেছে। এই আলোকে খৃষ্টানধর্ম্মের অসারতা আপনা আপনি উদ্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে।

৩২৩ **হক্** :—

"প্রজ্ঞার (হেকমতের) নির্দ্দেশ অনুসারে যে বিষয়টা, ঠিক যে অনুসারে, ঠিক যে পরিমাণে এবং ঠিক যে সময়ে হওয়া উচিত—ঠিক সেই অনুসারে, সেই পরিমাণে ও সেই

সময়ে সেই বিষয়টী সম্পন্ন হইলে তাহাকে 'হক্' বলা হয় (রাগেব)।" এরূপ ব্যাপক ভাব প্রকাশক কোন বাঙ্গলা-প্রতিশব্দ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। সেই জন্য অগত্যা উহার অনুবাদ করিয়াছি "সত্য" বলিয়া। অতএব "আল্লাহ সত্য সহকারে কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন"-পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে ঃ—সেই জ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ অনুসারে, কোর্‌আন পূর্ণ পরিণত শিক্ষা লইয়া যথা সময়ে দুন্‌য়ায় প্রচারিত হইয়াছে। "কোর্‌আন পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির তছদিক করে"—অর্থাৎ, তাহার পূর্ব্বে দুন্‌য়ার দিকে দিকে যুগে যুগে আল্লার যে সব বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তকে আল্লার বাণী বলিয়া স্বীকার করে—তাহাতে জাতি বিশেষের বা দেশ বিশেষের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করে না। পক্ষ স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ আবহমান কাল হইতে যে বিশ্ব-ধর্ম্ম ও বিশ্ব-নবীর সুসংবাদ দিয়া আসিতেছেন, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে কোর্‌আনের ও তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষার মধ্য দিয়া। সুতরাং এদিক দিয়াও কোর্‌আন পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির সত্যতার প্রমাণ।

৩২৪ **তওরাৎ ও ইঞ্জিল ঃ—**

কোর্‌আনের পরিভাষায়, হজরত মূছার নিকট আল্লার যে সকল বাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সমষ্টির নাম তওরাৎ—এবং হজরত ঈছার নিকট আল্লার যে সব কালাম নাজেল হইয়াছিল, তাহার সমষ্টির নাম ইঞ্জিল। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে পুরাতন নিয়ম বা নূতন নিয়ম বলিয়া যে সকল পৌরাণিক গ্রন্থ বা জীবনী, "ধর্ম্ম-পুস্তক"-নামে প্রচলিত আছে, তাহা হজরত মূছা ও হজরত ঈছার পরলোক গমনের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলিকে হজরত মূছার প্রতি অবতীর্ণ তওরাৎ এবং হজরত ঈছার প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। এহুদী ও খৃষ্টান-দিগের 'ধর্ম্মপুস্তক'গুলির প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদার কতকটা আভাব মোস্তফা-চরিতের ১১২—১১৮ এবং ১২৯—১৩৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

খৃষ্টান-ধর্ম্মবিশ্বাসের অসারতার প্রতি এখানে একটী সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইতেছে—মোহাম্মদের প্রতি, মূছার প্রতি এবং আর সমস্ত নবীর প্রতি আল্লাহ যেরূপে নিজের কালাম প্রেরণ করিয়াছেন, ঈছার প্রতিও তিনি সেইরূপে নিজের বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এ হিসাবে অন্য নবীগণের তুলনায় যীশুর বিশেষত্ব কিছুই নাই। পক্ষান্তরে যীশুর নিকট আল্লার কেতাব নাজেল হইয়াছে, একথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে যে—সেই বাণীর কর্ত্তা, প্রেরক ও প্রভু আল্লাহ, এবং যীশু হইতেছেন সেই প্রভুর অনেক আজ্ঞাবহ দাস এবং তাঁহার বাণীর বাহক মাত্র। ফলতঃ অন্যের আজ্ঞাবহ এবং অন্যের আদেশ-নিষেধের বাহক যে যীশু, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা মহাপাপ।

৩২৫ ফোর্কান বা বিচার বুদ্ধি ঃ—

কোন বস্তু বা বিষয়কে অন্য বস্তু বা বিষয় হইতে পৃথক করিয়া দেয় যাহা—তাহাই ফোর্কান। ছুরা আন্‌ফালের ৪১ আয়তে বদর যুদ্ধকে ফোর্কান বলা হইয়াছে। কোর্‌আনের পরিভাষায়, সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়া দেয় যাহা, তাহাকে 'ফোর্কান' বলা হয়। এমাম রাজী বলিতেছেন—সেই ফোর্কান হইতেছে নবীদিগের মো'যেজা বা অলৌকিক কার্য্যকলাপ। তাঁহাদের মতে, আয়তে বলা হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে কেতাব্‌ বা কোর্‌আন দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে তাঁহার মো'যেজার দ্বারা। কিন্তু এমাম এবনে-জরির বলিতেছেন—অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করা অথবা প্রবলা-শক্তি সহকারে সত্যকে নির্ব্বিঘ্নরূপে প্রতিষ্টিত করাই ফোর্কান (৩—১১১)। মুফ্‌তি আবদুহু বলেন—

ان الفرقان هو العقل الذي به تكون التفرقة بين الحق و الباطل -

—"যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করা সম্ভব হয়, তাহাই ফোর্কান (৩—১৬০)" কেহ কেহ বলিয়াছেন—আয়তে ফোর্কান অর্থে কোর্‌আন, কারণ এখানে ফোর্কান "নাজেল করার" কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। কারণ, আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন ... এবং ফোর্কান নাজেল করিয়াছেন। কোর্‌আন আর ফোর্কান অভিন্ন হইলে, তাহার মধ্যে হরফে আৎফ (Copulative Particle) বা সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা অশুদ্ধ হইবে (কবির ২—৫৯০)। তাহার পর, নাজেল হওয়া বা করার সাধারণতঃ যে অর্থ করা হয়, তাহাও অসঙ্গত (৮ টীকা দেখ)। পক্ষান্তরে কোর্‌আন ব্যতীত অন্য বহু বস্তু সম্বন্ধে "নাজেল করা"-ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছুরা হাদিদে বলা হইতেছে— و انزلنا الحديد —"এবং আমরা লৌহকে নাজেল করিলাম।" এখানে নাজেল করার অর্থ যে দান করা বা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ছুরা শূরাতে ঠিক এই ভাবে বলা হইয়াছে—আল্লাহ সত্য সহকারে কেতাব এবং 'মীজান' নাজেল করিয়াছে। সকলেই বলিতেছেন—দুইটী বিষয়কে তুলনা করিয়া তাহার প্রত্যেকটীর গুরুত্বের ক্রম নির্দ্ধারণ অর্থাৎ তাহার মধ্য হইতে সঙ্গত-অসঙ্গতকে নির্ব্বাচন করিতে পারে যে ন্যায় বিচার, এখানে তাহাকেই মীজান বলা হইয়াছে। ফলতঃ আলোচ্য আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ পূর্ব্বে তওরাৎ ও ইঞ্জিল নাজেল করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন। কোর্‌আন সেই প্রকৃত তওরাৎ-ইঞ্জিলের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে এবং প্রচলিত বিকৃত তওরাৎ-ইঞ্জিলের ও তাহার শিক্ষার প্রতিবাদ করিতেছে।

খৃষ্টান ও মুছলমান উভয়ই নিজ নিজ ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষাকে সঙ্গত বলিয়া দাবী করিতেছে, দুন্‌য়াময় ধর্ম্ম লইয়া এই প্রকার দাবী ও সংঘর্ষ। তাই বিশ্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কোর্‌আন ইহার সমাধানের জন্য বলিতেছে যে, আল্লাহ দুন্‌য়ায় শুধু নিজের কেতাব পাঠাইয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তিনি ফোর্কান ও মীজান বা জ্ঞান ও বিচারশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই জ্ঞান ও বিচারশক্তির দ্বারা মানুষ সহজে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে যে, বাইবেলের ত্রিত্ববাদ ও কোর্‌আনের একত্ববাদের মধ্যে কোন্ শিক্ষাটা সঙ্গত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কেবল খৃষ্টানদিগের কথা বলা হইল। কিন্তু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সকল বাদবিতণ্ডা ও মতভেদের জন্য কোর্‌আন এই মুক্তজ্ঞান ও বিচারবৃত্তিকেই সর্ব্বত্র একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে। হজরত রছুলে করিম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন— قوام المرء العقل و لا دين لمن لا عقل له —"মানুষের subsistence হইতেছে তাহার জ্ঞান। বস্তুতঃ যাহার জ্ঞান নাই, তাহার ধর্ম্ম নাই (বায়হাকী)।" দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের উভয় চরমপন্থী দলই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়েরই ধারণা এই যে, কোর্‌আন জ্ঞান ও বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ঘোর মিথ্যা অপবাদ। কোর্‌আন যে-আল্লার মহীয়সী বাণী, জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিও সেই আল্লারই শ্রেষ্ঠতম দান। সুতরাং উহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন স্থানে বাহ্যতঃ এইরূপ বিরোধের সন্দেহ হইলে, নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিতেছি, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানবিভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে—অথবা, যাহাকে আমরা কোর্‌আনের শিক্ষা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছি, বস্তুতঃ তাহা কোর্‌আনের অর্থ-বিকার মাত্র।

৩২৬ **এন্তেকাম—প্রতিফল ঃ—**

এন্তেকাম শব্দের অর্থ—কোন কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া, মন্দ কাজের প্রতিফল দান করা (তাজ, রাগেব, কবির)। লেন বলিতেছেন, انتقمت منه পদের অর্থ—I inflected penal retribution on him for that which he had done. রডওয়েল aveng বলিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সেল প্রমুখ অন্য কএকজন অনুবাদক অন্যায়ভাবে এন্তেকামের অনুবাদ করিয়াছেন revenge বা প্রতিশোধ বলিয়া। মুফতী আবদুহু তাঁহার তফছিরে বলিতেছেন ঃ—এন্তেকাম শব্দ প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে বর্ত্তমান সময়, কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল না (৩—১৬১)। আধুনিক যুগের পরিবর্ত্তিত ব্যবহার দ্বারা ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বকার সাহিত্যের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া যে কত দূর অন্যায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আর তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে, এই শব্দের প্রতিফল দান ও প্রতিশোধ গ্রহণ—উভয় প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহা হইলেও স্থানকালপাত্রাদি ভেদে উহার সঙ্গত তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই

ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য হইবে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে প্রতিশোধ গ্রহণ, তাহা হইতেছে হীন ও পাশববৃত্তি, মহিমময় আল্লার প্রতি তাহার আরোপ কখনই হইতে পারে না।

আয়তের উপরিভাগে বলা হইয়াছে যে, মানবের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য জ্ঞানময় আল্লাহ তাহার নিকট নিজের কালাম প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কালামের বাহক নবী ও রছুলগণকে দিয়া তাঁহার শিক্ষাগুলিকে বাস্তবরূপে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন এবং কেতাব ও পয়গাম্বরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তিনি জ্ঞান বিবেক ও বিচারশক্তি দান করিয়াছেন। ইহার পরেই বলা হইতেছে যে, আল্লার নিদর্শনগুলি অমান্য করিলে মানুষকে তাঁহার নির্দ্ধারিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে: অতএব, আল্লার বাণী, আল্লার পয়গাম্বর এবং আল্লার প্রদত্ত মুক্ত-বিচারবৃত্তিকেই এখানে 'আল্লার নিদর্শন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নিদর্শনগুলির কোন একটাকে পরিত্যাগ করিলে মানুষকে তাহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৩২৭ **আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ ঃ—**

এই আয়তে আল্লার আর একটী গুণ বা বিশেষণের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ছুরা বকরায় বলা হইয়াছে—আল্লার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। এখানে বলা হইতেছে—একমাত্র সেই জ্ঞানময় প্রভুই ত ঈশ্বর হইতে পারেন, যাঁহার নিকট স্বর্গের বা মর্ত্তের কোন বস্তুই গোপন থাকিতে পারে না। যাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ, যাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, এহেন অক্ষম কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। খৃষ্টানেরা যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বীকৃত বাইবেল হইতেই বহু বিষয়ে যীশুর অজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কের নামকরণে প্রচারিত যীশুর জীবন-চরিতে লিখিত হইয়াছে ঃ—"পর দিবস তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর যীশু ক্ষুধার্ত্ত হইলেন, এবং দূর হইতে সপত্র এক ডুমুর গাছ দেখিয়া, হয় ত তাহা হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া, কাছে গেলেন ; কিন্তু নিকটে গেলে পত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; কেন না তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না (১১, ১২—১৩)।" যীশু স্বয়ংই নিজের স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন —"কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন (মথি ২৪—৩৬)।" কএক হাত মাত্র তফাতে অবস্থিত ডুমুর গাছটীতে যে ফল নাই, যীশু তাহাও জানিতে পারিলেন না, বরং তাহাতে ফল আছে মনে করিয়া তাহার তলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যে ডুমুর ফলের মওসুমই নহে, ক্ষুধার তাড়নায় তিনি তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কোর্‌আন খৃষ্টানের মোকাবেলায় বলিয়া দিতেছে—অসীম জ্ঞানের অসীম আধার যিনি, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর হইতে পারেন। সসীম জ্ঞানের সসীম আধার যে-মানব, তাহাকে ঈশ্বর বলিলে আল্লার

দেওয়া 'ফোর্কানের' অবমাননা করা হইবে। অতএব, যে ধর্ম বা যে ধর্মপুস্তক যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা।

৩২৮ জরায়ুজ ঈশ্বর হইতে পারে না :—

এই সমস্ত আয়ত প্রতিপক্ষের সহিত বিচার প্রসঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোর্‌আন এই বিচারের কিরূপ সংযত সঙ্গত ও সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, পাঠকগণকে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। খৃষ্টানেরা বলেন—যীশু বিনা বাপে পয়দা হইয়াছেন, এই অলৌকিক জন্মের জন্যই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যীশু বস্তুতঃ বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন কি না, এখানে সে আলোচনায় কথা না বাড়াইয়া কোর্‌আন খৃষ্টানদিগের স্বীকৃতি মতেই তাহাদের ধারণার খণ্ডন করিয়া দিতেছে।

যীশুর জন্ম সম্বন্ধে পিতার সংশ্রব থাক বা না থাক, জননীর জরায়ুতেই যে তাঁহার প্রথম সঞ্চার ঘটিয়াছিল এবং অন্যান্য জরায়ুজ জীবের ন্যায়ই ভ্রূণ-জীবনের বিভিন্ন রূপ, স্তর ও আকারের মধ্য দিয়াই যে তাঁহাকে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। এখন Embryology বা ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য কিছুও জানা আছে, তাঁহাকে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, জরায়ুতে ভ্রূণের সঞ্চার হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত, বাহিরের একটা শক্তির বা নিয়মের অধীন হইয়াই তাহাকে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে হয়। এই নিয়মের অধীন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হয় যাহাকে, ঈশ্বর সে নয়। বরং সেই নিয়মের নিয়ামক যিনি, তিনিই ঈশ্বর। অতএব, "যীশু বিনা বাপে পয়দা হইয়াছেন"-ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদ্বারা তাঁহার ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ হয় না, বরং তিনি যে অন্য এক শক্তির অধীন, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কারণ, তিনি জরায়ুজ জীব।

৩২৯ মোহ্‌কাম—মোতাশাবেহ্‌—তাবিল :—

মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে দশ প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, আরবী সাহিত্যের হিসাবে এই শব্দগুলির কি তাৎপর্য্য হওয়া সঙ্গত। হজরত রছুলে করিমের সময় এবং তাঁহার ছাহাবাগণের মধ্যে "তাবিল"-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহারও সন্ধান লইব। তাহা হইলে এই শোচনীয় মতভেদের মধ্যে আয়তের প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে।

মোহ্‌কাম্‌ শব্দ "হুকুম" হইতে উৎপন্ন। সর্ব্ববাদী সম্মত মতে, ধাতুগত হিসাবে উহার অর্থ— منع বা বারিত করা, বিপর্য্যয় হইতে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হওয়া। শাসনকর্ত্তা

জালেমকে জুলুম হইতে বারিত রাখেন, এই জন্য তাঁহাকে হাকেম বলা হয়। যে প্রাসাদে বা দুর্গে বাহিরের কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে মোহকম-প্রাসাদ বা মোহকম-দুর্গ বলা হয়। জ্ঞানকে 'হেকমত' বলা হয়, কারণ তাহা মনকে অসঙ্গত ধারণা হইতে রক্ষা করে, মনে ঐরূপ ধারণা প্রবেশ করিতে দেয় না। মোতাশাবেহ, তাশাবোহ হইতে উৎপন্ন, শেব্‌হাতুন ধাতু। উহার অর্থ—"কোন বিষয় বা বস্তুর অন্য বিষয় বা বস্তুর অনুরূপ প্রতীয়মান হওয়া।" এই হিসাবে যে শব্দের বা বচনের একটী মাত্র অর্থ হইতে পারে এবং সেই একটী ব্যতীত তাহার অন্য কোন অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহাই মোহকাম। পক্ষান্তরে যে শব্দের বা বাক্যের একাধিক অর্থ হওয়া ভাষার হিসাবে সম্ভব, তাহাই হইতেছে মোতাশাবেহ।

ইংরাজী অনুবাদকেরা মোতাশাবেহ শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন Allegorical বা Fegurative বলিয়া। আমার মতে ইহা মোতাশাবেহ শব্দের প্রকৃত অনুবাদ নহে। কারণ রূপক লাক্ষণিক ও গৌণার্থ মাত্রে ব্যবহৃত শব্দকেই কেবল মোতাশাবেহ বলা যাইতে পারে না। বরং আরবী ভাষায় এরূপ বহু শব্দ প্রচলিত আছে, আভিধানিক হিসাবে যাহার একাধিক মৌলিক অর্থ বিদ্যমান। আবার একই শব্দের পরস্পর বিপরীত অর্থও হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অনেক শব্দ মূল অর্থের ন্যায় নানা গৌণার্থেও সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে একাধিক অর্থ সম্পন্ন শব্দগুলি সমস্তই মোতাশাবেহ।

এমাম আহমদ বলিয়াছেন :—

المحكم ما استقل بنفسه و لم يحتج الى بيان و المتشابه ما احتاج الى بيـــان -

"যাহা স্বয়ং সিদ্ধ self-expressing এবং কোন ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নহে, তাহাই মোহকাম। পক্ষান্তরে যাহা অন্য ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ, তাহাই মোতাশাবেহ।"

এমাম শাফেয়ী বলিতেছেন :—

المحكم ما لا يحتمـــل من التاويل الا وجها واحدا - و المتشابه ما احتمـــل من التـــاويل وجوهـــا -

"একটী ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্য্যের সম্ভাবনা যাহাতে নাই, তাহাই মোহকাম। আর যাহার একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব, তাহাই মোতাশাবেহ।"

এবনুল-আম্বারী (প্রভৃতি বিখ্যাত আভিধানিক পণ্ডিতগণও) এই মতের সমর্থন করিয়াছেন (আবহুহ ৩—১৯০ প্রভৃতি)। আমার মতে, মোটের উপর ইহাই মোহকাম ও মোতাশাবেহ শব্দের সঙ্গত ব্যাখ্যা।

মতভেদ :—

তফছিরকারগণের বর্ণনায় জানা যায় যে, এই আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ছাহাবাগণের সময় হইতে একটা গুরুতর মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। একপক্ষ বলিতেছেন :—কোর্‌আন

শরীফের মধ্যে অল্পসংখ্যক (মাত্র পাঁচ শত) আয়ত মোহকাম, মানুষ ইহার অর্থ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত আয়তই মোতাশাবেহ, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই তাহার অর্থ জানিতে পারে না। * এমন কি, যে হজরত রছুলে করিমের উপর কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, এই আয়তগুলির অর্থবোধ করার সাধ্য তাঁহারও ছিল না— উম্মত ত দূরের কথা।

তাঁহারা আলোচ্য আয়তটীকে প্রমাণ স্বরূপে পেশ করিয়া বলেন ঃ—এই আয়তে বলা হইতেছে—(১) মোতাশাবেহ আয়তের তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে না (২) কুটিল-হৃদয় ব্যক্তিগণই ঐ আয়তগুলির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং এই আয়ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানুষের পক্ষে মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ অবগত হওয়া অসম্ভব এবং তাহার চেষ্টা করা অন্যায়।

অন্যপক্ষ বলিতেছেন ঃ—কোর্‌আন আসিয়াছে মানুষকে পথ দেখাইবার জন্য। যাহা অবোধগম্য, মানুষের পক্ষে তাহার সার্থকতা কিছুই নাই। কোর্‌আনের অধিকাংশ আয়ত মানুষের—এমন কি তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফারও—অবোধগম্য, এরূপ কথা বলা সর্ব্বতঃভাবে অন্যায়। আলোচ্য আয়ত হইতেও এরূপ কথা কোন প্রকারেই সপ্রমাণ হয় না। বরং এই আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ এবং সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত মোতাশাবেহ আয়তের অর্থ আর কেহ অবগত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন, ইহা ত এই আয়ত হইতেই স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থবোধের (তাবিলের) চেষ্টা করে যাহারা, আয়তে তাহাদের সকলকে সাধারণভাবে নিন্দা করা হয় নাই। বরং অসৎ উদ্দেশ্যে ও অসঙ্গত প্রণালীতে যাহারা এই শ্রেণীর আয়তগুলি হইতে নিজেদের মনমত তাৎপর্য্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে, আয়তে কেবল তাহাদেরই কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই মতভেদের সমাধান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে— প্রথমতঃ আয়তে সঙ্গতভাবে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহারের এবং দ্বিতীয়তঃ 'তাবিল'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের উপর। আমরা এখন এই দুইটী বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ণচ্ছেদ সংক্রান্ত বিচার ঃ—

বর্ত্তমান সময় কোর্‌আন শরীফের আয়তগুলির মধ্যে যে সকল ছেদ অথবা যোজক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, হজরতের বা তাঁহার ছাহাবাগণের সময় এই শ্রেণীর চিহ্ন আদৌ প্রচলিত ছিল না (এবনে-কছির ও এৎকান ৭৬ প্রকরণ দেখ)। ছাহাবাগণ হজরতের

* কুফীদিগের গণনা অনুসারে কোর্‌আনে মোট ৬২৩৭টী আয়ত আছে। ফলে এই মত অনুসারে কোর্‌আনের ৫৭৩৭টী আয়তের অর্থ আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে!

আবৃত্তি শুনিয়া সেই অনুসারে কোর্‌আন তেলাঅৎ করিতেন, পরবর্ত্তীরা তাহার অনুকরণ করেন। এইরূপে আবৃত্তির ও অর্থগ্রহণের সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী লিপিকারগণ ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তীদের আবৃত্তির অনুসরণে এই চিহ্নগুলি কোর্‌আনে বসাইয়া দিয়াছেন—সাধারণতঃ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আয়তের ছেদ বা যোজক চিহ্ন গুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বস্তুতঃ হজরত রছুলে করিমের আবৃত্তি হইতে তাহার প্রমাণ বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া যাইতেছে কি না? যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সব বিচার বিবেচনা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ, যাঁহার উপর কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। পক্ষান্তরে যদি ঐরূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে আয়তের মধ্যকার ছেদগুলি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যুগপৎভাবে কোর্‌আনের নীতি ও আরবী সাহিত্যের সাধারণ ধারা অনুসারে। এই হিসাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আলোচ্য আয়তে "الا الله" বা কিন্তু আল্লাহ"-পদাংশের পর, হজরত রছুলে করিম তাঁহার আবৃত্তিতে পূর্ণচ্ছেদ বা وقف تام, ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অবশ্য তফছিরের কেতাবগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এবনে-আব্বাছ, এবনে-মছউদ, উবাই-এবনে-কা'ব এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী কএকজন ব্যক্তি "তাহার তাবিল কেহই অবগত নহে - কিন্তু আল্লাহ" - এই পদের পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করিয়া আয়তটীর আবৃত্তি করিতেন। এ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। তাহার মধ্যকার দুইএকটা কথা নিম্নে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি :—

(১) তফছিরের এই বর্ণনাগুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হজরত এবনে-আব্বাছ এই আয়ত সম্বন্ধে বহু পরস্পর বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন! কারণ, তফছিরকারগণ তাঁহার উপরোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন :—"অন্যমতে 'কিন্তু আল্লাহ'-পদের পর পূর্ণচ্ছেদ বসিবে না। বরং তাহার তাবিল কেহই অবগত নহে কিন্তু আল্লাহ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ"—এখানে আসিয়া ছেদ পূরা হইতেছে।

و روي هذا عن ابن عباس و مجاهد و الربيع بن انس و محمد بن جعفر و اكثر المتكلمين -

—"অর্থাৎ এবনে-আব্বাছ, মোজাহেদ, রবী'-এবনে-আনাছ, মোহাম্মদ এবনে-জা'ফর এবং কালাম বা Scholastic Theology-র অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন (জরির, কবির, এবনে-হাইয়ান প্রভৃতি)।" ছুরা আন্‌আমের তিনটী আয়ত মাত্র মোহকাম *, অর্থাৎ সমগ্র কোর্‌আনের মধ্যে তিনটী ব্যতীত আর সমস্ত আয়তই মোতাশাবেহ, ইহাও এবনে-আব্বাছের প্রমুখাৎ তাঁহারাই রেওয়ায়ত করিয়াছেন (কবির ২—৫৯৭)। সুতরাং

* হাকেম, এবনে-জরির প্রভৃতি। হাকেম আবার এই রেওয়ায়তকে ছহি বলিয়াছেন। দেখ—মনছুর ২—৪ পৃষ্ঠা।

এবনে-আব্বাছের নামকরণে বর্ণিত দুইটী রেওয়ায়ত একসঙ্গে বুঝিতে গেলে তাহার মর্ম্ম এই দাঁড়াইবে যে, কোর্‌আনের ৬২৩৭টী আয়তের মধ্যে ৬২৩৪টী আয়তই মানবের অবোধগম্য। পক্ষান্তরে, মোজাহেদ বলিতেছেন—আমি এবনে-আব্বাছের নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোর্‌আন পেশ করিয়াছি, প্রত্যেক আয়তের অর্থ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি—

وهو يقول :— انا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تاويله -

—"এবং তিনি বলিয়াছেন—যে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি উহার তাবিল অবগত আছেন, আমিও তাঁহাদের একজন (আবদুহু, জরির, কছির প্রভৃতি)।" তফছিরের কেতাবগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে, এবনে-আব্বাছ বস্তুতঃ কোর্‌আনের সমস্ত আয়তেরই তফছির করিয়াছেন। এমন কি, কতিপয় ছুরার প্রারম্ভে আলেফ-লাম-মীম বা এই শ্রেণীর যে সব বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ ধারণার বিপরীত, তাহার অর্থও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) আবদুল্লাহ-এবনে-মছউদের নাম করণে তফছিরের কেতাবগুলিতে সাধারণতঃ যে সব রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, দুই কুল্-। আউজো ও ছুরা ফাতেহাকে কোর্‌আন হইতে বাদ দিতে হইবে (এৎকান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) অসতর্ক রেওয়ায়ত সঙ্কলকগণ এই শ্রেণীর অবিশ্বস্ত ও মিথ্যা বর্ণনাগুলি বিনা বিচারে উদ্ধৃত করিয়া এছলামের যে ঘোর ক্ষতিসাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার পর, আমরা তফছিরে দেখিতে পাইতেছি যে, এবনে-মছউদ "মোতাশাবেহ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন মনছুখ বলিয়া (জরির ৩—১১৫)। অথচ বহু 'মনছুখ আয়তের' অর্থও ঐ সকল তফছিরেই তাঁহারই নামকরণে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আবদুল্লাহ-এবনে-মছউদ নিজেই মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সকল তফছির হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত ঐ আয়তগুলি মনছুখ বা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত মুছলমানগণ নিশ্চয়ই সেই অনুসারে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। হজরত ও তাঁহার ছাহাবাগণ কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিলে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার উপর আমল চলিল কি করিয়া? ফলতঃ এই সব রেওয়ায়তের মানে-মতলব কিছুই নাই। তাহার পর, আবদুল্লাহ-এবনে-মছউদের আবৃত্তির দোহাই দিয়া যে রেওয়ায়তটী বর্ণিত হইয়াছে—

ليس لها اسناد يعرف حتى يحتج بها -

—"বস্তুতঃ তাহার কোন ছনদ বা সাক্ষী-পরম্পরাই পাওয়া যায় না, তাহাকে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করা'ত দূরের কথা (তফছিরুল-কোর্‌আন ১—১৮৫)।" পক্ষান্তরে, এই কেরআৎ বা আবৃত্তির বর্ণনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আয়তটী একেবারে অদল-বদল করিয়া লিখিতে হইবে। কারণ, কোর্‌আনে আছে— لا يعلم تاويله الا الله আর এবনে-মছউদের ঐ কেরআতে উহার স্থলে বসান হইতেছে— ان تاويله الا عند الله (জরির ৩ —১২৩)। অথচ মুছলমানদিগের দাবী ও বিশ্বাস এই যে, সম্পূর্ণ কোর্‌আন হজরতের সময়

লিখিত অবস্থায় সুরক্ষিত হইয়া ছিল, এবং আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত কোর্‌আন, হজরতের সেই কোর্‌আনের নিখুঁৎ ও অবিকল অনুলিপি—তাহার কুত্রাপি একটী বিন্দুবিসর্গেরও রদ-বদল হয় নাই। মুছলমানদিগের এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের আলেমগণ তাহাও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা হজরতের কোর্‌আনের অনুসরণ করিব, না তাহাতে রদ-বদল করিয়া (তথাকথিত) এবনে-মছউদের আবৃত্তির অনুসরণ করিব, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এবনে-মছউদ তাবিল-শব্দের কি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেন, পাঠকগণ একটু পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

(৩) আয়তে "কিন্তু আল্লাহ্"-পদের পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করার অনুকূলে এমাম রাজী কএকটা যুক্তি প্রদান করিয়াছেন (৬০২), ইহার একটীতে ব্যাকরণের দিক দিয়াও বিষয়টার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু শেখুল-এছলাম এমাম এবনে-তাইমিয়া ও মুফতী আবদুহু ঐ সকল যুক্তির অসারতা সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (যথাক্রমে ছুরা এখলাছের তফছির ও এই আয়ত সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

"তাবিল"-শব্দের তাৎপর্য্য :—

অভিধানকারগণ বলিতেছেন :—

التاويل من الأول اي الرجوع الى الاصل - و منه الموئل للموضع الذي يرجع اليه و ذلك هو رد الشيئ الى الغاية المراد منه —(راغب) - و اول اليه رجعه —(قاموس) -

"অর্থাৎ 'তাবিল' আওলুন হইতে সম্পন্ন, ইহার অর্থ মূলের পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা। 'মাওয়েল'-এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ—যাহার পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। কোন বিষয়কে তাহার চরম উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাই হইতেছে 'তাবিল' (রাগেব)।" কামূছ ও অন্য সমস্ত অভিধানেই তাবিল শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তফছির ও অছুলকারগণের পরিভাষায় ইহার অর্থ ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, এবং পরিণামে তাৎপর্য্য, গৌণতাৎপর্য্য এমন কি রূপকতাৎপর্য্য অর্থে উহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

কোর্‌আন শরীফের অন্য ছয়টী ছুরার ১৪ স্থানে এই তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এমাম এবনে-তাইমিয়া নানা যুক্তিপ্রমাণ দিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন—

ان لفظ التاويل لم يرد فى القرآن الا بمعنى الامر العملى الذي يقع فى المال تصديقا لخبر او رويا اولا مر غامض يقصد به شيئ فى المستقبل -

—"কোন সংবাদের বা স্বপ্নের বাস্তব পরিণাম, অথবা এমন কোন প্রচ্ছন্ন বিষয় যাহাদ্বারা

ভবিষ্যতে কোন উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য থাকে, এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কোন অর্থে তাবিল-শব্দের ব্যবহার হয় নাই।"

হজরত রছুলে করিমের ছাহাবাগণের মধ্যেও তাবিল শব্দ এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। এমাম এবনে-তাইমিয়া এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সার এই যে, আদেশ নিষেধাদি সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার অর্থ হইবে —বাস্তবে সে আদেশকে কার্য্যে পরিণত করা অথবা সেই নিষেধ পালন করিয়া চলা। যেমন বিশ্বস্ত হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, বিবি আএশা বলিতেছেন :—

كان رسول الله صلعم يقول فى ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي - يتاول القرآن — الحديث -

অর্থাৎ—"হজরত রছুলে করিম তাঁহার রুকু' ও সেজদায় উপরোক্ত দোওয়া পাঠ করিয়া আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে তিনি ছুরা ফৎহের فسبح بحمد ربك و استغفره (অতঃপর তুমি আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে) আয়তের তাবিল করিতেন (বোখারী, মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি)।" সুতরাং আদেশ কার্য্যে পরিণত করাকেই এখানে তাবিল বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান অতীত বা ভবিষ্যতের কোন সংবাদ অথবা ওয়াদা সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া, সেই ওয়াদা পূর্ণ হওয়া অথবা সেই বিবরণের বাস্তব স্বরূপ প্রকট হওয়াকেই সেখানে তাহার তাবিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন এবনে-মছউদ কোর্‌আন সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

...... فمنه آي قد مضي تاويلهن قبل ان ينزلن و منه آي وقع تاويلهن على عهد النبي صلعم و منه آى وقع تاويلهن بعد النبي صلعم بيسير و منه آي يقع تاويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تاويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع تاويلهن يوم القيامة -

—"কোর্‌আনের কতকগুলি আয়তের তাবিল তাহা নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের সময়ে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের অল্প পরে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে আরও কিছুদিন পরে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে আখেরী জামানায় এবং কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে কিয়ামতের দিনে (এৎকানের তফছির ৭৭ পৃষ্ঠা)।" ছাহাবাগণ "আয়তের তাবিল" বলিতে কি বুঝিতেন, উপরের দুইটী বিবরণ হইতে তাহা খুব স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে।

ছাহাবাদিগের যুগ অতিবাহিত হওয়ার বহুকাল পরে, এমাম এবনে-জরির প্রমুখ তফছির সঙ্কলকগণ তাবিলকে তফছির বা তাৎপর্য্য অর্থে ব্যবহার করিতে থাকেন। যেমন তিনি তফছিরের সর্ব্বত্রই বলেন— القول فى تاويل هذه الاية كذا —"এই আয়তের তাবিল

লিখিত অবস্থায় সুরক্ষিত হইয়া ছিল, এবং আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত কোর্‌আন, হজরতের সেই কোর্‌আনের নিখুঁৎ ও অবিকল অনুলিপি—তাহার কুত্রাপি একটী বিন্দুবিসর্গেরও রদ-বদল হয় নাই। মুছলমানদিগের এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের আলেমগণ তাহাও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা হজরতের কোর্‌আনের অনুসরণ করিব, না তাহাতে রদ-বদল করিয়া (তথাকথিত) এবনে-মছউদের আবৃত্তির অনুসরণ করিব, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এবনে-মছউদ তাবিল-শব্দের কি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেন, পাঠকগণ একটু পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

(৩) আয়তে "কিন্তু আল্লাহ"-পদের পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করার অনুকূলে এমাম রাজী কএকটা যুক্তি প্রদান কবিয়াছেন (৬০২), ইহার একটীতে ব্যাকরণের দিক দিয়াও বিষয়টীর আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু শেখুল-এছলাম এমাম এবনে-তাইমিয়া ও মুফতী আবদুহু ঐ সকল যুক্তির অসারতা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (যথাক্রমে ছুরা এখলাছের তফছির ও এই আয়ত সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

"তাবিল"-শব্দের তাৎপর্য্য :—

অভিধানকারগণ বলিতেছেন :—

التاويل من الأول اي الرجوع الى الاصل - و منه الموئل للموضع الذي يرجع اليه و ذلك هو رد الشيئ الى الغاية المراد منه —(راغب) - و اول اليه رجعه —(قاموس) -

"অর্থাৎ 'তাবিল' আওলুন হইতে সম্পন্ন, ইহার অর্থ মূলের পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা। 'মাওয়েল'-এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ—যাহার পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। কোন বিষয়কে তাহার চরম উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাই হইতেছে 'তাবিল' (রাগেব)।" কামূছ ও অন্য সমস্ত অভিধানেই তাবিল শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তফছির ও অছুলকারগণের পরিভাষায় ইহার অর্থ ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, এবং পরিণামে তাৎপর্য্য, গৌণতাৎপর্য্য এমন কি রূপকতাৎপর্য্য অর্থে উহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

কোর্‌আন শরীফের অন্য ছয়টী ছুরার ১৪ স্থানে এই তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এমাম এবনে-তাইমিয়া নানা যুক্তিপ্রমাণ দিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন—

ان لفظ التاويل لم يرد فى القرآن الا بمعنى الامر العملى الذي يقع فى الحال تصديقا لخبر او رويا اولا مر غامض يقصد به شيئ فى المستقبل -

—"কোন সংবাদের বা স্বপ্নের বাস্তব পরিণাম, অথবা এমন কোন প্রচ্ছন্ন বিষয় যাহাদ্বারা

ভবিষ্যতে কোন উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য থাকে, এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কোন অর্থে তাবিল-শব্দের ব্যবহার হয় নাই।"

হজরত রছুলে করিমের ছাহাবাগণের মধ্যেও তাবিল শব্দ এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। এমাম এবনে-তাইমিয়া এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সার এই যে, আদেশ নিষেধাদি সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার অর্থ হইবে —বাস্তবে সে আদেশকে কার্য্যে পরিণত করা অথবা সেই নিষেধ পালন করিয়া চলা। যেমন বিশ্বস্ত হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, বিবি আএশা বলিতেছেন :—

كان رسول الله صلعم يقول فى ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي - يتاول القرآن — الحديث -

অর্থাৎ—"হজরত রছুলে করিম তাঁহার রুকু' ও সেজদায় উপরোক্ত দোওয়া পাঠ করিয়া আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে তিনি ছুরা ফৎহের فسبح بحمد ربك و استغفره (অতঃপর তুমি আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে) আয়তের তাবিল করিতেন (বোখারী, মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি)।" সুতরাং আদেশ কার্য্যে পরিণত করাকেই এখানে তাবিল বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান অতীত বা ভবিষ্যতের কোন সংবাদ অথবা ওয়াদা সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া, সেই ওয়াদা পূর্ণ হওয়া অথবা সেই বিবরণের বাস্তব স্বরূপ প্রকট হওয়াকেই সেখানে তাহার তাবিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন এবনে-মছউদ কোর্‌আন সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

...... فمنه آي قد مضي تاويلهن قبل ان ينزلن و منه آي وقع تاويلهن على عهد النبي صلعم و منه آى وقع تاويلهن بعد النبي صلعم بيسير و منه آي يقع تاويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تاويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع تاويلهن يوم القيامة -

—"কোর্‌আনের কতকগুলি আয়তের তাবিল তাহা নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের সময়ে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের অল্প পরে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে আরও কিছুদিন পরে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে আখেরী জামানায় এবং কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে কিয়ামতের দিনে (এখলাছের তফছির ৭৭ পৃষ্ঠা)।" ছাহাবাগণ "আয়তের তাবিল" বলিতে কি বুঝিতেন, উপরের দুইটী বিবরণ হইতে তাহা খুব স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে।

ছাহাবাদিগের যুগ অতিবাহিত হওয়ার বহুকাল পরে, এমাম এবনে-জরির প্রমুখ তফছির সঙ্কলকগণ তাবিলকে তফছির বা তাৎপর্য্য অর্থে ব্যবহার করিতে থাকেন। যেমন তিনি তফছিরের সর্ব্বত্রই বলেন— القول في تاويل هذه الاية كذا —"এই আয়তের তাবিল

সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।" ফলতঃ এমাম এবনে-জরিরের সময় পর্য্যন্ত তাবিল শব্দ তফছির বা ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য অর্থেই ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী তফছিরকারেরা এই অর্থকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া বলেন :—

التاويل عبارة عن نقل الكلام الى ما يحتاج في اثباته الى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ -

—"যে তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিতে এমন দলিলের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, যে দলিল না থাকিলে আয়তের স্পষ্ট অর্থ বর্জ্জন করা যাইত না—স্পষ্ট অর্থের স্থানে সেইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করাকে তাবিল বলা হয় (ঐ)।" তাহার পর আমাদের অছুল-লেখকগণ উহাকে আরও মাজিয়া ঘষিয়া এই পরিভাষাটী পাকা করিয়া দিলেন যে—

التاويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل -

—"যে শব্দের যে অর্থ হওয়া অধিক সঙ্গত, কোন প্রমাণ বলে, তাহা ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করাকে তাবিল বলা হয়।" বর্ত্তমান সময় তাবিল-শব্দ আধুনিক লেখকগণের এই স্বরচিত পরিভাষায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আয়তের তাৎপর্য্য :—

আয়তে বলা হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অবতীর্ণ কেতাব, অর্থাৎ কোর্‌আনের আয়তগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আয়তগুলি মোহকাম, অর্থাৎ তাহার অর্থ স্পষ্ট, অন্য নিরপেক্ষ, এবং তাহার একাধিক তাৎপর্য্য হইতে পারে না। এই মোহকাম আয়তগুলি হইতেছে কোরআনের 'ওছুল' বা মূলনীতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়তগুলি মোতাশাবেহ, অর্থাৎ ভাষার হিসাবে তাহার একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব। নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত জ্ঞানী যাহারা, তাহারা মোহকাম ও মোতাশাবেহ উভয় প্রকার আয়তকেই আল্লার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে মোতাশাবেহ আয়তগুলির তাবিল করিয়া তাহার সত্যার্থ অবগত হইয়া থাকে। "তাবিল করিয়া"-অর্থে, মূলনীতি Principle বা মোহকাম আয়তগুলির সহিত সেগুলিকে সমঞ্জস করিয়া। সেই মোহকাম আয়তগুলির শিক্ষার ব্যতিক্রম হয়, এরূপ কোন তাৎপর্য্য তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু কোর্‌আনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা যাহাদের উদ্দেশ্য নহে, সেই কুটিল-হৃদয় ব্যক্তিগণ কেবল মোতাশাবেহ আয়তগুলি লইয়া আলোচনা করে, মূল মোহকাম আয়তগুলির সহিত মিলাইয়া তাহার সত্যার্থ নির্ণয় করিতে চায় না। বরং তাহারা মূলনীতিকে বাদ দিয়া একাধিক অর্থবাচক বাক্যগুলির এমন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চায়—যাহা মূলের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত এবং যে অর্থের দ্বারা মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ফলতঃ এই শ্রেণীর তার্কিকদের পক্ষে সত্যতত্ত্ব অবগত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।

একটা উদাহরণ দিয়া বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা পাইব। ছুরা আলে-এম্‌রানের প্রাথমিক আয়তগুলি খৃষ্টানদিগের মোকাবেলায় এবং নজরানের খৃষ্টান-ডেপুটেশনের সহিত বাদ-প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায়, এই বিচারের সময় কএকজন খৃষ্টান যাজক কোর্‌আনের কএকটা উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। যেমন কোর্‌-আনে হজরত ঈছাকে রূহুল্লাহ বলা হইয়াছে। এই অজুহাতে তাঁহারা বলেন—রূহ অর্থে আত্মা, অতএব রূহুল্লাহ হইতেছে আল্লার আত্মা। আল্লার আত্মা যিনি, তিনি নিশ্চয় তাঁহার অংশ। অতএব কোর্‌আনের শিক্ষা অনুসারে যীশুও ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "রূহ" হইতেছে একাধিক অর্থবাচক অর্থাৎ মোতাশাবেহ শব্দ। যাহাদ্বারা মানুষ কোন প্রকার জীবন লাভ করিতে পারে, সে সমস্তকে রূহ বলা হয়। এই অর্থে কোর্‌আনকেও রূহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ—তাহা মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনদান করে। কোর্‌আন বলিতেছে—ইহা মোতাশাবেহ শব্দ, অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাওহীদ সংক্রান্ত মোহকাম আয়তগুলির সহিত মিলাইয়া ইহার অর্থগ্রহণ করিতে হইবে। সেখানে আমরা দেখিতে পাইব—

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة و ما من اله الا اله واحد -

—"যাহারা বলে যে আল্লাহ 'তিনের তৃতীয়' তাহারা নিশ্চয় কাফের হইয়াছে, বস্তুতঃ এক আল্লাহ ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই (৫—৭৩)।" ইহা ব্যতীত তাওহীদের সমর্থন ও খৃষ্টান মতবাদের প্রতিবাদ আমরা কোর্‌আনের শত শত আয়তে দেখিতে পাইব। আলোচ্য আয়তে আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোর্‌আনে যেখানে এইরূপ বহু অর্থবাচক শব্দ বা বাক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার মধ্যকার সেই অর্থটী মাত্র গ্রহণ করিবে, মোহকাম আয়তগুলির মূল শিক্ষার সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে।

মোহকাম ও মোতাশাবেহ আয়ত সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে— و ما يذكر الا اولوا الالباب -

—"বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যতীত আর কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।" ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে :—

(১) কোর্‌আন হইতে উপদেশগ্রহণ করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোর্‌আনের প্রকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না।

(২) জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে, কোর্‌আনের মোতাশাবেহ আয়তগুলির সত্যার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাহাও আয়তের এই উপসংহার হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে।

৩৩০ জ্ঞানবানের প্রার্থনা :—

উপরের আয়তের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না।" সঙ্গে সঙ্গে এই আয়তে সেই জ্ঞানবানদের প্রার্থনাটাও

বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়া কএকটা গভীর তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। প্রথমে বলা হইতেছে, সত্যকে বুঝিবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সেই জ্ঞান আবার গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে সরল ও পক্ষপাতহীন মনের সহিত। কারণ, মন যদি কুটিল হয়, অথবা কোন একটা সংস্কারের পক্ষপাত যদি তাহাতে পূর্ব্ব হইতে আসন জমাইয়া বসে, তাহা হইলে জ্ঞানধারা সত্যপ্রাপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। বরং এ অবস্থায় ধী-শক্তির প্রখরতার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারধারার গতিপথও ক্রমশঃ বক্রতর হইয়া যাইতে থাকিবে। তাহার পর বলা হইতেছে যে, জ্ঞানই যে মনুষ্যত্বের পরম অবদান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যসন্ধ সাধককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং নানা বিভ্রমবিপর্য্যয়ের অধীন। এই বিভ্রম ও বিপর্য্যয় যাহাতে তাহার জ্ঞান মার্গে আলেয়ার আলো সৃষ্টি করিয়া দিতে না পারে, সেই জন্য সাধককে সর্ব্বদাই সেই জ্যোতি-স্বরূপ জ্ঞানময় আল্লার শরণ-গ্রহণ করিতে হইবে।

'জএগ'-শব্দের অর্থ সরল মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্তের কোন একদিকে ঢলিয়া পড়া (রাগেব)। এই দুইটী দিক হইতেছে—অবিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস। ধর্ম্মকে গ্রহণ করার পর, কালক্রমে অসতর্ক মানুষ ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষাগুলি বিসর্জ্জন দিয়া স্বরচিত কতকগুলি সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং সেই সংস্কার অনুসারে তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষ করিতে থাকে। অবিশ্বাসের তুলনায় হেদায়তের ছদ্মবেশে গৃহীত এই অন্ধবিশ্বাস অধিকতর ক্ষতিজনক। তাইএখানে "আমাদিগকে পথপ্রদর্শন কর" - না বলিয়া—পথপ্রদর্শনের পর আমাদিগের মনগুলি কুটিল হইতে দিও না"-এইরূপ বলা হইতেছে।

মোহকাম ও মোতাশাবেহ সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এবং খৃষ্টানদিগের প্রতিবাদ উপলক্ষে এই আয়তটী বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ আয়তে "পথপ্রদর্শনের পর" ভ্রষ্ট হওয়ার নজির স্বরূপ খৃষ্টানদিগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। খৃষ্টানেরা হজরত ঈছার মারফতে হেদায়ত লাভ করিয়াছিল—আল্লার কালাম ইঞ্জিলের সাহায্যে। ইঞ্জিলের শিক্ষা অনুসারে নিজেদের ধর্ম্মজীবনকে মঙ্গল মণ্ডিত করিয়া তোলাই তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু ইঞ্জিলের শিক্ষা কত মহান, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহারা কেবলই ভাবিতে লাগিল—ইঞ্জিলের বাহক যীশুর মহিমা। তখন অন্ধভক্তি আসিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া লইল, এবং তাহারই ফলে যীশুর ব্যক্তিত্বকে তাহারা নিজেদের অন্ধভক্তি ও কুসংস্কার অনুসারে এত বড় করিয়া তুলিল যে, তাঁহার প্রকৃত আদর্শ ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যাজক ও পুরোহিতগণ খৃষ্টানদিগকে গোমরাহ করিয়া ফেলিল—বাইবেলের মোতাশাবেহ শব্দ ও বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই। বাইবেলেরই বহু আয়ত হইতে খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় যে—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং অন্য মানব-সাধারণের ন্যায় যীশুও একজন মানুষ ও তাঁহার বান্দা। কিন্তু বাইবেলে স্থানে স্থানে আবার ঈশ্বরকে পিতা ও

যীশুকে পুত্র বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাওহিদ সংক্রান্ত মূল ও মোহকাম বচনগুলির সহিত একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে অতি অজ্ঞলোকও বুঝিতে পারিবে যে, এখানে পিতা ও পুত্র প্রচলিত সাধারণ অর্থে কখনই গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ অর্থগ্রহণ করিলে বাইবেলের তাওহীদ সংক্রান্ত মূলশিক্ষাগুলির সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়।

দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানেরা হজরত ঈছা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছে, মুছলমানগণও হজরত ঈছা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে। মুছলমান যীশুর পুত্রত্বের ও ঈশ্বরত্বের মৌখিক প্রতিবাদ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ ও শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করে, যাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও আয়ত্ত হইতেই পারে না। যেমন—জীবসৃষ্টি, মৃতকে জীবন দান, জন্ম-মৃত্যুর সাধারণ নিয়মের অতীত হওয়া, ইত্যাদি। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে মুছলমান সমাজের একস্তরে ভীষণ অন্ধভক্তির প্রাদুর্ভাব যেরূপভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, খৃষ্টানদিগের অন্ধবিশ্বাসকে তাহারা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে!

৩৩১ **জনগণের সম্মিলন**:—

এই আয়তের দুই প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ মত অনুসারে আয়তে 'দিন' অর্থে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানবকে একত্র সম্মিলিত করিবেন, আয়তে এই কথা বলা হইতেছে। এমাম রাজী বলেন, এ অবস্থায় আয়তে للجزاء কথাটা উহ্য স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, আয়তে আগামী যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। কোফর ও এছলামের বাহক-জনগণ সেই দিন সমরক্ষেত্রে সম্মিলিত হইবে এবং এছলাম-বৈরীদিগের মেরুদণ্ড সেদিন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে সেই যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

২ রুকু’

—০০০—

৯ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۙ

৯ নিশ্চয় কাফের হইয়াছে যাহারা -তাহাদিগের ধনসম্পদ অথবা তাহাদিগের সন্ততিবর্গ তাহাদিগকে কদাচ আল্লাহ্ হইতে একটুও বেনায়াজ করিতে পারিবে না ; বস্তুতঃ আগুনের ইন্ধন’ত তাহারাই,[৩৩২]—

১০ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১০ ফের্‌আওনের স্বজনগণের ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ন্যায়; —আমাদের নিদর্শনগুলির প্রতি মিথ্যার আরোপ করিয়াছিল তাহারা, অতএব তাহাদের অপরাধ সমূহের ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দণ্ডদান করিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন কঠিন-দণ্ডদাতা[৩৩৩]।

১১ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১১ কাফের হইয়াছে যাহারা-তাহাদিগকে বলিয়া দাও :— শীঘ্রই তোমরা পরাভূত হইবে ও জাহান্নামের পানে বহিষ্কৃত হইবে ; বস্তুতঃ অতিমন্দ পরিণামস্থল তাহা[৩৩৪]।

١٢ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

১২ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল যে দুই (যুযুধান)-সঙ্ঘ, তাহাতে তোমাদিগের জন্য একটী বিশেষ নিদর্শন ছিল ; (তাহাদের) একদল যুদ্ধ করিতেছিল আল্লার পথে আর অন্যটী ছিল বিদ্রোহী, তাহাদিগকে দেখিতেছিল নিজেদের দ্বিগুণ-চাক্ষস দর্শনে ; আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ-সাহায্যের দ্বারা শক্তিদান করেন ; নিশ্চয় চক্ষুষ্মান ব্যক্তি-দিগের জন্য এই ব্যাপারে একটা বিশেষ শিখিবার বিষয় আছে।[৩৩৫]

١٣ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

১৩ নারীদিগের, পুত্রগণের, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য-রাশির, সুশোভিত অশ্বরাজির, পশুপালের ও ভূ-সম্পদের ন্যায় বাসনা-বস্তুগুলির প্রেম মানবের পক্ষে সুমোহন করা হইয়াছে ; এগুলি হইতেছে পার্থিব-জীবনের সম্বল,[৩৩৬] আর আল্লাহ্ ! — সুন্দরতম প্রত্যা-বর্ত্তনস্থল ত তাঁহারই নিকটে।

১৪ বল ঃ— ইহা অপেক্ষা উত্তম (সম্পদের) সংবাদ তোমাদিগকে (বলিয়া) দিব কি ? সংযমশীল হয় যাহারা, তাহাদিগের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য কানন-কলাপ আছে - যাহার তলদেশ দিয়া নদী-নির্ঝর সমূহ প্রবাহিত হইতেছে - সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী - এবং (সেখানে) সুপবিত্র যুগলার্দ্ধগণ (অবস্থিত) আর (সর্ব্বোপরি) আল্লার রেজওয়ান[৩৩৭]; বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদিগের সম্বন্ধে সম্যক্-দৃষ্টিমান—

١٤ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۚ

১৫ তাহারা বলিয়া থাকে ঃ— হে আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয়ই ঈমান আনিয়াছি, অতএব আমাদের অপরাধগুলি ক্ষমা কর এবং আগুনের যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ![৩৩৮]—

١٥ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ

১৬ ধৈর্য্যশীল, সত্যবান, সদাবিনীত, ব্যয়শীল, এবং রজনীর শেষযামে ক্ষমাপ্রার্থী তাহারা।[৩৩৯]

١٦ اَلصّٰبِرِينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالْقٰنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

১৭ আল্লাহ 'সাক্ষ্য দিতেছেন' যে, তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই

١٧ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

নাই, এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ - ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায় যাহারা (তাহারাও সাক্ষ্য দিতেছে যে) তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই—প্রবল, প্রজ্ঞাময় তিনি।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

১৮ নিশ্চয় আল্লার সমীপে ধর্ম্ম হইতেছে — এছ্‌লাম। আর কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা, তাহারা'ত বিসম্বাদ ঘটাইয়াছে- তাহাদের নিকটে জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরে - নিজেদের হিংসা বিদ্বেষের ফলে, এবং আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করে যে ব্যক্তি (তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন ত্বরিত নিকাশ গ্রহণকারী।

١٨ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

১৯ অতঃপর তাহারা যদি তোমার সহিত হঠতর্ক আরম্ভ করে, তবে বলিয়া দাও ঃ— আমি নিজে আল্লার হুজুরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আর আমার অনুসরণ করিয়াছে যাহারা (তাহারাও আত্মসমর্পণ করিয়াছে); যাহারা কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে - তাহা-দিগকে ও নিরক্ষর (পৌত্তলিক)-দিগকে আরও বল ঃ—তোমরাও কি (তাঁহাতে) আত্মসমর্পণ

١٩ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ

اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

করিতেছ ? ফলে যদি আত্ম-সমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল[৩৩২]—পক্ষান্তরে তাহারা যদি পরাঙ্মুখ হয়, তবে তোমার কর্ত্তব্য'ত কেবল পৌঁছাইয়া দেওয়া, আর বান্দাদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ হইতেছেন সম্যক্ দৃষ্টিবান।

টীকা :—

৩৩২ কাফেরদিগের ভবিষ্যৎ :—

এছলাম আত্মপ্রকাশ করিতেছিল মুছলমানকে অবলম্বন করিয়া। তাই আরবের এহুদী ও পৌত্তলিকগণ সকলেই মুছলমানকে বিধ্বস্ত করিয়াই এছলামের ধ্বংসসাধন করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা নির্ভর করিয়াছিল নিজেদের ধনবল, জনবল ও ক্ষাত্রশক্তির উপর। কিন্তু সত্যের ও সত্যাশ্রয়ী ঈমানের যে একটা সর্ব্ববিজয়ী শক্তি আছে, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এই শক্তিবাদের অহমিকতার প্রতিবাদ করিয়া আয়তে বলা হইতেছে—তাহাদের ধনবল ও জনবল যতই থাকুক না কেন, সে সমস্তেরই মূলকেন্দ্র হইতেছেন আল্লাহ। আল্লার এই শক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া বান্দার কোন শক্তি কখনই কার্য্যকারী হইতে পারে না। অর্থাৎ আল্লার দয়া নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে কিম্বা তাঁহার দণ্ড হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে, এমন শক্তি অর্জ্জন করা বান্দার পক্ষে কস্মিন-কালেও সম্ভব হইতে পারে না।

আয়তের প্রথমাংশে এছলামবৈরীদিগের পার্থিব পরাজয় ও দুরবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। দুন্‌য়ার এই পরাজয় ও দুর্দ্দশায় তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়া যাইবে না, পরকালেও তাহাদিগকে নরকের ইন্ধন হইতে হইবে—আয়তের শেষভাগে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আহলে-কেতাবদিগের সম্বন্ধে ছুরা মায়দার ৬৪ আয়তে বলা হইয়াছে—

كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله -

অর্থাৎ—"যখনই তাহারা যুদ্ধের জন্য অগ্নিপ্রজ্জলিত করিয়াছে, আল্লাহ তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন।" এই আয়তকে অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ কোর্‌আনের সর্ব্বত্র 'নার' অর্থে

'সমরানল' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে সর্ব্বত্র এইরূপ অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে না। নরকাগ্নি ও নরকের ইন্ধন সম্বন্ধে ২৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩৩ **"ফের্‌আওনের ন্যায়"** :—

আরবের খৃষ্টানগণ সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও খৃষ্টান রোম-সম্রাটদিগের ভরসা তাহারা খুবই করিত। তাহারা মনে করিত, রোম-সাম্রাজ্যের বিরাট সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় তিষ্ঠান মুষ্টিমেয় নিঃস্ব মুছলমানদের পক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সম্ভবপর হইবে না। বাইবেলের পাঠক খৃষ্টানদিগকে তাই তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। একদিকে ছিলেন হজরত মূছা ও দুর্ব্বল বানি-এছরাইল, অন্যদিকে ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত মিসর-সম্রাট ফের্‌আওন। আল্লার আদেশে ফের্‌আওনের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য চক্ষের নিমেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আরবের খৃষ্টানরা এছলামের মোকাবেলায় যে সব পার্থিব শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, ফের্‌আওনের ও তাহার সহকর্ম্মাদের রাজশক্তির ন্যায়, তাহাও ভবিষ্যতে এই নিঃস্ব ও দুর্ব্বল মুছলমানদিগের হাতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। হজরত আবুবকরের ও হজরত ওমরের খেলাফত কালে এই ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

৩৩৪ **আশু পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী** :—

"কাফের হইয়াছে যাহারা"-বলিতে আরবের এহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক সকলকেই বুঝাইতেছে। তাহারা সকলেই যখন একযোগে ও একমতে "মোহাম্মদ ও তাঁহার অভিনব ধর্ম্ম"কে সমূলে বিনাশ করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া উত্থান করিতেছে এবং সে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা মুছলমানের পক্ষে পার্থিব হিসাবে যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে—সেই সময় আল্লার আদেশে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আরবের সকল কাফের সমাজকে আহ্বান করিয়া স্পষ্ট ও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"তোমরা অতি শীঘ্রই পরাভূত হইবে।" শক্তি মদমত্ত আরবপ্রধানগণ হজরতের এই ঘোষণাকে "পাগলের প্রলাপ" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কএক মাস মাত্র যাইতে না-যাইতে, সমগ্র আরবজাতিকে বিস্মিত, বিচলিত ও বিহ্বলিত করিয়া এই ঘোষণার সার্থকতা প্রকটিত হইল তীব্রতর বাস্তবরূপে। কোন্ শক্তির বলে সেই "নিঃস্ব, দুর্ব্বল ও মুষ্টিমেয়"-মুছলমান এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিল, আর সংখ্যায় ৪০ কোটি হইয়াও কেনই বা আজ তাহারা দুন্‌য়ার দিকে দিকে পরের হাতে ক্রমাগত বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে, ১৩ হইতে ১৭ আয়ত পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে তাহার কার্য্যকারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

৩৩৫ 'বদর'যুদ্ধের নজির :—

পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, কাফেরগণ শীঘ্রই পরাজিত হইবে। শক্তি মদমত্ত আরব-গোত্রপতিরা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। উপরের তিনটী আয়তে নানা যুক্তি ও নজির দিয়া তাহাদের এই অবিশ্বাস দূর করার চেষ্টা হইয়াছে। কারণ, তাহারা সেই দুর্দ্দশায় উপনীত না হউক, ইহাই ছিল কোর্‌আনের ও তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার একান্ত উদ্দেশ্য। তাই ১২ আয়তে বদরযুদ্ধের প্রত্যক্ষ নজিরের উল্লেখ করিয়া শক্তিমদমত্ত আরব-জননায়কদিগের চৈতন্য-উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

হেজরতের পূর্ব্বে অবতীর্ণ কোন কোন ছুরাতে, বিশেষতঃ ছুরা কমরের ৪৪ হইতে ৪৬ আয়তে, বদরযুদ্ধের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজেদের ধনবল ও জনবলের উপর নির্ভর করিয়া, কোরেশপ্রধানগণ তখন সেই সতর্কবাণীর প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া-ছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে, আরব-গোত্রসমূহের তাহা অবিদিত নহে। বদরযুদ্ধে আততায়ী কোরেশ-সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। সাজসরঞ্জাম ও রণসম্ভারের কোন ক্রটিই তাহাদের ছিল না। এদিকে হজরতের সঙ্গী মুছলমানদিগের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন মাত্র। ইহার মধ্যে দুই জন ব্যতীত আর সকলে পদাতিক। অস্ত্রশস্ত্র অল্প লোকের হাতে ছিল, লাঠি ও পাথর লইয়াই তাঁহাদের অনেকেই সুসজ্জিত কোরেশ-বাহিনীর মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সত্যকে সম্বল করিয়া। এ অবস্থাতেও অল্পক্ষণ মোকাবেলা করার পর আবুছুফ্‌য়ানকে তাঁহাদের হাতে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতে হয়, বহু কোরেশসৈন্য মুছলমানের হাতে হতাহত ও বন্দী হইয়া যায়। কোর্‌আন বলিতেছে— বদরযুদ্ধের এই পরিণামে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটা বিশেষ শিখিবার বিষয় আছে।

সেই শিক্ষা এই যে, মুছলমান যখন সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ও সত্যকার মোজাহেদরূপে আল্লার পথে জেহাদ আরম্ভ করিয়া দেয়, তখন আল্লার শক্তি ও সাহায্য আসিয়া তাহার বাহুকে শক্ত করিয়া তুলে, মৃত্যুবিজয়ী আত্মাই তাওহীদের তেজ দীপ্ত হইয়া অসত্যের সকল শক্তিকে নিমিষে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। বদরযুদ্ধের ইতিহাস উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে—শক্তি সংখ্যায় নহে, রণসম্ভারে নহে। বরং প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে মোছলেম-সাধকের মনে ও মস্তিষ্কে। নিজে সম্পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী না হইলে, তাওহীদের মূলমন্ত্রে তন্ময় হইতে না পারিলে এবং আত্মসত্যে অবিচল দৃঢ় প্রতীতি না জন্মিলে, কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানে ও আস্ফালনে ঐ শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয় না।

আয়তে বলা হইতেছে—বদরযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তোমরা তাচ্ছীল্য করিয়া একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। আবার তোমরা মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করার ষড়যন্ত্র করিতেছ। সাবধান, ইহা সফল হইবে না। এই প্রকার সংঘর্ষের ফলে তোমরা নিজেরাই পরাভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ছুরা আলে-এমরানের প্রাথমিক আয়তগুলিতে প্রধানতঃ খৃষ্টানদিগের সহিত বিচার আলোচনা চলিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খৃষ্টানদিগের মোকাবেলায় বদরযুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার একটা বিশেষ সার্থকতাও আছে। কারণ, বাইবেলে "আরব বিষয়ক" যে এল্‌হামী কালাম বা ভাববাণী আছে, তাহাতে বদরযুদ্ধের এবং কোরেশ-সরদারদিগের পরিণামের কথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যিশাইয় ভাববাদীর, পুস্তকে বলা হইতেছে ঃ—

হে দেদানীয় পথিকদল সমূহ, তোমরা আরবের বনের মধ্যে রাত্রিযাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন, হে তীমা দেশের অধিবাসীগণ, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদিগের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারীযুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের স্থায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদারের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে ; আর কেদার বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রাইলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন (২১ অধ্যায় ১৩—১৭ পদ)।

এই ভাববাণীতে দেদান Dedan প্রদেশ, তীমা Tema বা তায়মা প্রদেশ এবং কেদার Kedar-বংশের উল্লেখ আছে। বাইবেলিকা বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন—Probably Dedan was a tribe with permanent seats in S. or central Arabia and trading settlements in N. W. অর্থাৎ—সম্ভবতঃ দেদান-গোত্রের স্থায়ী নিবাস আরবের দক্ষিণ বা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল এবং তাহাদের বাণিজ্যনিবাস ছিল উত্তরপশ্চিম প্রদেশে (১০৫৩ কলম)। আরবের বিখ্যাত ভৌগলিক Edward Glasser তাঁহার Geography of Arabia পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, দেদানীয়দিগের অধিবাস মদিনার উত্তরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলের বিখ্যাত টীকাকার হেন্‌রি ও স্কট, "তীমা প্রদেশের অধিবাসিগণ"-এই পদের টীকায় বলিতেছেন—These people were also Arabians. The country had its name from Tema, of the sons of Ishmael. অর্থাৎ—এই লোকগুলিও আরব। এসমাইলের এক পুত্রের নাম তেমা, তাঁহা হইতেই এই প্রদেশটীর ঐ নাম করণ হইয়াছে (৪নং টীকা)। বাইবেল, আদি পুস্তক, ২৫ অধ্যায়ের ১৫ পদে এই তেমার উল্লেখ আছে। হজরত এছমাইলের এক পুত্রের নাম কেদার (ঐ, ঐ, ১৩ পদ)। ইনিই কোরেশ-গোত্রের পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং কেদার বলিতে কোরেশ-গোত্রকে বুঝাইতেছে।

নিষ্কোষিত খড়্গের সম্মুখ হইতে মদীনায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার ভক্ত মুছলমানগণ। ইঁহাদের সকলের মদীনায় আসিতে এবং সেখানে নিজেদের অধিবাস স্থাপন করিতে ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পর ঠিক

এক বৎসরের শেষভাগে কোরেশবাহিনী মদিনা আক্রমণ করে এবং কেদারের বা কোরেশের সব প্রতিপত্তি এই যুদ্ধে লুপ্ত হইয়া যায়। বাইবেলের এই ভাববাণীর ও তাহার সত্যতার প্রতি বিশেষ করিয়া খৃষ্টানদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই আয়তের একটী লক্ষ্য।

"তাহাদিগকে চাক্ষস দর্শনে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল" আয়তের এই অংশের তাৎপর্য্যে রাগেব বলিতেছেন—

اي يظنونهم بحسب مقتضي مشاهدة العين مثليهم -

অর্থাৎ—"নিজেদের চাক্ষস দেখা অনুসারে অন্যপক্ষকে তাহারা নিজেদের দ্বিগুণ বলিয়া অনুমান করিতেছিল।" কেহ কেহ বলেন—কোরেশবাহিনীর এক অংশ পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, সেই জন্য মুছলমানরা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই। যাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারা কমবেশী ছয় শতের অধিক হইবে না। এই জন্যই মুছলমানপক্ষ তাহাদিগকে নিজেদের দ্বিগুণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

আমার মতে এই মতটী অসঙ্গত নহে। কারণ, কোরেশবাহিনীর সমস্ত সৈন্যই একেবারে মুক্তপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, বরং তাহার এক অংশ যে বালি-পর্ব্বতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাবরী ২—২৭৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বদরযুদ্ধের বিবরণ ছুরা আন্‌ফালে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সেখানেই করার ইচ্ছা রহিল।

৩৩৬ **বাসনা-বস্তু ও তাহার প্রেম :—**

সত্যের জয় এবং তাহার বিরোধী শক্তিগুলির ক্ষয়ের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বদর সমরের নজির দেখাইয়া এই জয় পরাজয়ের সূত্রপাতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। নিঃসম্বল মুষ্টিমেয় মুছলমান, নিজের অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কোরেশ-বাহিনীকে কএক ঘণ্টার মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে, মুছলমান অমুছলমান সকলের সম্মুখে এ দৃশ্যটা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই আয়তে ও ইহার পরবর্ত্তী দুইটী আয়তে এই সিদ্ধির ও তাহার মূলগত সাধনার গূঢ় রহস্যের প্রতি তত্ত্বদর্শী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

আলোচ্য আয়তে প্রথমে সেই সাধনার অভাবাত্মক দিকের বর্ণনা করা হইতেছে। সত্য কি এবং তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের মোছলেম-জীবনের কর্ত্তব্য কি?—আমরা তাহা অনেক সময়ই বুঝিতে পারি। এমন কি, সেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য আমাদের অন্তরে সময় সময় ঈমানের প্রেরণাও জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার পরই কামিনী-কাঞ্চনাদি বাসনা-বস্তুগুলি দুন্‌য়ার সমস্ত মায়ামোহ লইয়া আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আবিষ্ট ও সম্মোহিত করিয়া ফেলে। আর অমনি আমরা সত্য ও কর্ত্তব্যকে ত্যাগ করিয়া ঐ মায়া-মোহগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে থাকি। ইহাই হইতেছে সমস্ত

দুর্ব্বলতার মূল। অতএব, বিশ্ববিজয়-অভিলাষী মোছলেম-মোজাহেদ সর্ব্বপ্রথমে নিজের ভিতরকার এই সর্ব্বনাশী দুর্ব্বলতাকে জয় করিতে শিখিবে। অবশ্য, এই বাসনা-বস্তুকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে এছলাম মানব সাধারণকে আদেশ করে নাই। এখানে ঐ বস্তুগুলির নিন্দা করা হয় নাই, নিন্দা করা হইয়াছে উহার মায়া-মোহকে। কারণ, এই মোহই মানুষের সঙ্কল্পকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় এবং তাহারই ফলে সে কাপুরুষ ও কর্ত্তব্য-বিমুখ হইয়া পড়ে। তাই শক্তি-সাধনার এই অভাবাত্মক দিকটার প্রতি সর্ব্বপ্রথমে সাধকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, এই বাসনা-বস্তুগুলি হইতেছে মানুষের পার্থিব জীবনধারণের উপলক্ষ। লক্ষ্যে উপনীত হইতে সাহায্য করে যতক্ষণ, উপলক্ষ-গুলি ততক্ষণই মানুষের হিতকর হইয়া থাকে। কিন্তু, লক্ষ্যকে ভুলাইয়া উপলক্ষই যখন মানুষকে নিজের মোহজালে জড়াইয়া ফেলে, তখন তাহাই হয় তাহার সাধকজীবনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। তাই বলা হইতেছে—হে মানব! তোমার চরম লক্ষ্য ও পরম সুন্দর প্রত্যাবর্ত্তনের স্থল'ত হইতেছে আল্লার সন্নিধানে। অর্থাৎ তোমার জীবন হইতেছে সাধনা এবং তাহার সাধ্য হইতেছেন তিনি। অতএব, সাধনার উপলক্ষই যদি তোমাকে সেই সাধ্য হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা চরম দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে?

৩৩৭ **রেজওয়ান :—**

অভিধান হিসাবে রেজওয়ান শব্দের অর্থ رضا كثير বা বিপুল সন্তোষ। হজরতের এক হাদিছে জানা যাইতেছে—আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরকালে যে অনন্ত প্রেম ও অফুরন্ত সন্তোষ দান করিবেন, তাহাই হইতেছে বেহেশ্‌তের শ্রেষ্ঠতম নে'মৎ এবং এই নে'মতের নামই রেজওয়ান (বোখারী, মোছলেম)। ছুরা তাওবার ৭২ আয়তে বেহেশ্‌তের অন্যান্য নে'মৎগুলির বর্ণনার পর বলা হইতেছে— و رضوان من الله اكبر ' ذلك هو الفوز العظيم
—"এবং এ সব অপেক্ষা বৃহত্তম হইতেছে আল্লার রেজওয়ান ; আর মহান সফলতা'ত ইহাই।" উপরে, বাসনা-বস্তুসমূহের মায়া-মোহ বর্জ্জন করতঃ লক্ষ্যকে অর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখন বলা হইতেছে যে, সংযমশীল লোকেরাই পরকালে আল্লার এই অনন্ত রেজওয়ান লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং এই ঐ মায়া-মোহ হইতে মুক্ত থাকাকেই এখানে বিশেষ ভাবে সংযম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৩৮ **মুছলমানের প্রার্থনা :—**

১১ ও ১২ আয়তে বলা হইয়াছে যে, মুছলমানগণ অচিরে বিজয়লাভ করিবেন এবং তাঁহারা আল্লার সাহায্যে শক্তিমান হইবেন। কিন্তু এই বিজয় ও ঐশিক সাহায্যের অধিকারী হওয়ার জন্য একটা বিরাট সাধনার দরকার। কতকগুলি কর্ম্ম ও বৃত্তিকে বর্জ্জন ও অন্য কতকগুলিকে অর্জ্জন করার আন্তরিক প্রচেষ্টার নামই সাধনা। বর্জ্জনীয় বিষয়গুলির বা এই

সাধনার অভাবাত্মক দিকটার বিষয় ১৩ আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আয়ত হইতে তাহার ভাবাত্মক বা অর্জ্জনীয় বিষয়গুলির বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে। এই সাধনার প্রাণ-বস্তু হইতেছে প্রার্থনা, এবং ঐ প্রার্থনার মূল অবদান হইতেছে আল্লার প্রতি বান্দার প্রগাঢ় অচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে একটা সদা-জাগ্রত তীব্র অনুভূতি, আল্লার হুজুরে সেই অনুভূতির বিনীত অভিব্যক্তি এবং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেই কৃপানিধানের শরণ-ভিক্ষা। বস্তুতঃ এই ভাবটাই হইতেছে মুছলমানের সব সাধনার প্রথম বস্তু ও প্রধান বস্তু। তাই মোনাজাতের মধ্যবর্ত্তিতায় সেই শক্তিকেন্দ্রের সহিত সাধক-প্রাণের যোগসাধন করিয়া লইতে হয়।

৩৩৯ মোছলেম-জীবনের পাঁচটী লক্ষণ :—

প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার পর এই আয়তে মোছলেম-জীবনের পাঁচটী বিশেষ লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সদ্ভাবগুলি হইতেছে সাধনার অর্জ্জনীয় বিষয়। এই লক্ষণ পাঁচটীর তাৎপর্য্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) **ছাবেরীন**—ছাবের শব্দের বহুবচন। ছবর করিতে সমর্থ যে, সে-ই ছাবের। উহার মূল ধাতুগত অর্থ বন্ধন করা, বন্দী করিয়া রাখা। রাগেব বলিতেছেন—"জ্ঞানের ও শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে মনকে সংযত করিয়া রাখা, অথবা জ্ঞান ও ধর্ম্মের নিষেধ অনুযায়ী কোন বিষয়কে মনে স্থান না দেওয়া, ইহাই হইতেছে ছবরের মূল তাৎপর্য্য। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকাশ-রূপ অনুসারে এই ছবরই আবার বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।" মুফ্‌তি আবদুহু বলিতেছেন :—

الصبر ملكة فى النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله و الرضا بما يكره في سبيل الحق - وهو خلق يذملق به بل يتعلق عليه كمال كل خلق -

অর্থাৎ—"মনের সেই সাধনজাত বৃত্তিকে ছবর বলা হয়, যাহার ফলে এমন সব (ভার) বহন করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়, যাহা দুর্ব্বহ। এবং যাহা দ্বারা সত্যের জন্য নিজের অপ্রীতিকর বিষয়গুলিকেও সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানব-জীবনের পূর্ণতার সহিত এই বৃত্তিটার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বরং (প্রকৃত কথা এই যে) ইহা ব্যতীত মানব-জীবন পূর্ণতালাভ করিতে পারে না (২৫২)।" ফলতঃ সত্য গ্রহণ করার জন্য মানুষকে যে সব পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহাতে অবিচলিত চিত্তে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার শক্তিসঞ্চয় করিয়া দেয় যে মানসবৃত্তি, তাহারই নাম ছবর। বিশ্ব-বিজয়ী ও আল্লার সাহায্যে শক্তিমান হইতে চায় যে মোছলেম-সাধক, সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে ছাবের বা ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে ; ইহাই মোছলেম-জীবনের প্রথম লক্ষণ।

(২) **ছাদেকীন**—ছাদেক শব্দের বহুবচন, ছেদ্‌ক হইতে উৎপন্ন। কথা কাজ ও সঙ্কল্প সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার হয়। মিথ্যা হইতে দূরে থাকা, অর্থাৎ নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে যাহা

অপ্রকৃত—সেইরূপ উক্তি না করা, ইহা হইতেছে কথার ছেদ্‌ক বা সত্যতা। কর্তব্যকে যথাযথ ভাবে সম্পাদন করিতে থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিরত না হওয়া—ইহাই হইতেছে কাজ সম্বন্ধে সত্যতা। আর সঙ্কল্পে সত্যবান হওয়ার অর্থ হইতেছে—কর্ম্মের সূত্রপাত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সঙ্কল্পকে মনে প্রাণে জাগ্রত করিয়া রাখা (রাজী প্রভৃতি)। ফলতঃ মোটামুটিভাবে এক কথায় ছাদেক শব্দের অনুবাদ—সত্যাশ্রয়ী। মোছলেম-জীবনের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে এই সত্যাশ্রয়।

(৩) **কানেতীন**—একবচন কানেৎ, কোনুৎ হইতে উৎপন্ন। অর্থ—আজ্ঞাবহ হওয়া বা বিনীত হওয়া। 'কোর্‌আনে উভয় অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে' (রাগেব)। দুর্দ্ধর্ষ, দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও অবিনীত যে, এছলামের দাবী তাহাতে আদৌ শোভা পায় না। আল্লার এবাদতের মূল হইতেছে এই বিনয়। অনেক সময় নামাজ রোজা, জাকাত খয়রাত বা অন্য সৎকর্ম্ম সম্পাদনের ফলে আমাদের মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। ইহাতে সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। আল্লার বান্দাদিগের সম্বন্ধেও মুছলমানের ব্যবহার সর্ব্বদাই বিনয়নম্র হওয়া উচিত।

(৪) **মোন্‌ফেকীন**—একবচন মোন্‌ফেক, এন্‌ফাক হইতে উৎপন্ন। ইহার সাধারণ অর্থ কোন কাজে ধনসম্পদ ব্যয় করা। কোর্‌আন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুছলমানকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হাদিছের কেতাবগুলি এই উপদেশে পরিপূর্ণ। জাকাত ওশর প্রভৃতির আদেশ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই তাকিদের কারণ এই যে, অর্থসম্বল ব্যতীত জাতির কোন সঙ্কল্প বা প্রতিষ্ঠান জয়যুক্ত হয় না, তাহার কোন জয়যাত্রা সফলতালাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, নানাবিধ আভ্যন্তরীণ দুঃখদৈন্যের প্রকোপ হইতে জাতিকে রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদাই জাতীয়-তহবিল বা বায়তুল-মালের দরকার। সমাজ কৃপণস্বভাব ও ব্যয়কুণ্ঠিত হইলে ইহার কোনটাই সম্ভবপর হইতে পারে না।

(৫) **মোস্তাগ্‌ফেরীন**—একবচন মোস্তাগফের, ধাতু গফর। উহার অর্থ—আচ্ছাদন করা, ঢাকিয়া ফেলা, اللباس ما يصونه عن الدنس কলুষ হইতে রক্ষা করে যাহা, তাহা দ্বারা কোন বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া (রাগেব, জওহারী)। আরবী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদিগের সমবেত মত অনুসারে, ব্যবহারে উহার নিম্নলিখিত দুই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে :—

(ক) আল্লার রহমত দ্বারা বান্দার মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করা, যাহাতে কোন পাপ-প্রবৃত্তি তাহাতে প্রবেশ বা স্থানলাভ করিতে না পারে।

(খ) নিজকৃত পাপের দণ্ড হইতে বান্দার রক্ষা পাওয়া। —(কস্তলানী, রাগেব প্রভৃতি)।

আয়তে মোছলেম-জীবনের পঞ্চম লক্ষণে বলা হইতেছে—রজনীর শেষযামে তাহারা আল্লার হুজুরে এস্তাগফার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, পাপপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহারা আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে—প্রভু হে ! নিজ দয়া ও রহমত দ্বারা আমার মনপ্রাণকে এমনভাবে

আচ্ছাদিত করিয়া দাও, যেন পাপের প্রবৃত্তি তাহাতে প্রবেশই করিতে না পারে। অথবা, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়া বলে—আমাকে স্বকৃত পাপের দণ্ড হইতে রক্ষা কর, আমার অপরাধগুলি ক্ষমা কর!

রজনীর শেষযাম, নিভৃত নিশীথ জগৎ। নিদ্রার পর দৈহিক-গ্লানিমুক্ত সাধক, লোক-লোচনের অগোচরে আপন প্রেমাস্পদের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, প্রাণের সব গুপ্ত আশা ও বেদনাগুলি তাঁহার সম্মুখে নিবেদন করিবে। বস্তুতঃ এই বিঘ্নহীন কুণ্ঠাহীন আত্ম-নিবেদনের নামই তাহাজ্জদ। হজরত রছুলে করিম জীবনে কখনও এই তাহাজ্জদ পরিত্যাগ করেন নাই।

মোছলেম-জীবনের ইহাই কোর্‌আন বর্ণিত লক্ষণ। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর, পাঠকগণকে আয়তের অনুবাদটা আর একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

আল্লার 'সাক্ষ্য' :—

প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা বা অন্য প্রকারে লব্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যে প্রতীতি জন্মে, সেই প্রতীতিকে কথায় প্রকাশ করার নাম শাহাদৎ। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি 'সাক্ষ্য' বলিয়া। 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই'—অর্থাৎ, যুগে যুগে প্রকাশিত নিজ কালামের, মানবের জ্ঞান-বিবেকের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আল্লাহ তাআলা নিজের অস্তিত্ব ও একত্বকে প্রকাশ করিতেছেন।

'বিদ্বান ব্যক্তিরাও এইরূপ সাক্ষ্য দেয়'—না বলিয়া, আয়তে বলা হইতেছে যে, যে সব বিদ্বান-লোক ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহারাও আল্লার অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য দিয়া থাকে। কারণ, ন্যায় ও সত্যের প্রতি একটা গভীর নিষ্ঠা না থাকিলে কেবল বিদ্যার দ্বারা এ সব ক্ষেত্রে সফলতালাভ করা যায় না। 'বিদ্বানেরা সাক্ষ্য দেয়'-অর্থে, তাহারা আল্লার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীতিলাভ করে এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার ও ঘোষণা করিয়া থাকে।

৩৪০ **এছলাম :—**

এছলাম س-ل-م বা ছ-ল-ম ধাতু হইতে উৎপন্ন। অভিধানে উচ্চারণভেদে এই ধাতুর কএক প্রকার অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাল্‌মুন্‌ ও ছেল্‌মুন্‌ অর্থে—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া, সন্ধি ও শান্তি, অনুগত হওয়া বা আত্মসমর্পন করা, কাহাকে কোম জিনিষ সমর্পণ করা। سلم ছাল্‌মুন্‌ অর্থে الخالص من الشئ অন্য কোন বস্তুর সংমিশ্রণ বা ভেজাল হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। ছুরা জুমারের একটা আয়তে বলা হইতেছে :—

ب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً سلما لرجل ° هل يستويان مثلا

—"আল্লাহ উপমা দিতেছেন—যেমন এক ব্যক্তি বহু পরস্পরবিরোধী শরিকের, আর অন্য এক ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে একমাত্র একজনের, এই দুই ব্যক্তির তুলনা কি সমান হইতে পারে ?" অর্থাৎ এক ব্যক্তি বহু প্রভুর দাস বা অনেক মনিবের চাকর, আর অন্য ব্যক্তিটীর দাসত্বে বা চাকুরীতে একজন ব্যতীত অন্য কোন প্রভুর বা মনিবের কোন স্বত্বাধিকার নাই, সে সম্পূর্ণভাবে কেবলমাত্র একজন প্রভুর অধীন। ফলতঃ এক ব্যতীত অন্য কাহারও সংশ্রব, সংমিশ্রণ বা ভেজাল যাহাতে নাই, তাহাকেই ছালম্ বলা হইয়াছে।

'এছলাম'-শব্দ ধাতুগত হিসাবে এই সমস্ত তাৎপর্য্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে উহার শেষোক্ত অর্থটী অধিক স্পষ্ট ও স্থানোপযোগী বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী আয়তে এই অর্থেরই সমর্থন হইতেছে। সে যাহা হউক, জ্ঞান ও কর্ম্মের যে সমষ্টিগত ধারা মানুষকে ভিতরের ও বাহিরের সকল প্রকার আপদ হইতে রক্ষা করে, যাহা বিশ্বমানবের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করে, যাহা আল্লার ও তাঁহার বান্দাদিগের প্রাপ্য সমর্পণ করিতে সাধককে শিক্ষা দেয়, আল্লাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাই যে ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা এবং যে ধর্ম্মের ভাষায় ভাবে ও তাহার প্রকাশ-ভঙ্গিমায়, ধ্যানে ধারণায় ও পূজায় প্রার্থনায়, কোন স্থানে কোন প্রকারে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন সংশ্রব বা ভেজাল নাই—তাহাই হইতেছে আল্লার সন্নিধানে গৃহীত সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম এবং তাহারই নাম এছলাম।

এই এছলাম তের শত বৎসর বয়সের কোন নূতন ধর্ম্ম নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পূর্ব্বে দুনয়ায় যে সব নবী ও রছুল আসিয়াছিলেন, কোর্‌আনে তাঁহাদের ধর্ম্মকে এছলাম এবং সেই ধর্ম্মের প্রকৃত অনুসারীদিগকে মোছলেম বলিয়া সর্ব্বত্রই উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়তের পরবর্ত্তী অংশে বলা হইতেছে যে, এহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি যে সব জাতির নিকট আল্লার কালামের মারফতে এই সত্য-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল, জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাহাদের আলেম বা বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘোর মতভেদ আরম্ভ হইয়া যায়, এবং তাওহীদের প্রকৃত শিক্ষা ও সাধনাকে তাহারা বিস্মৃত হইয়া বসে। ফলতঃ নিজেদের পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষের জন্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘনের ফলে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বহু মতের ও দলের সৃষ্টি করিয়া লয় এবং ধর্ম্মের নামে আপনাদিগের মধ্যে সাঙ্ঘাতিকভাবে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিয়া দেয়।

৩৪১ হঠতর্ক অন্যায় :—

মুখ্যতঃ নাজরানের খৃষ্টানদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, এই স্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি লোকে তোমার সঙ্গে হঠতর্ক করিতে থাকে, তাহা হইলে, এই সব হঠতর্কের কোন উত্তর না দিয়া, তুমি আরবের পৌত্তলিক ও গ্রন্থধারী সম্প্রদায়গুলিকে ডাকিয়া বল :—উপরে এছলামের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, আমি ও আমার অনুসরণকারী-মোমেনগণ সেই অনুসারে একমাত্র

আল্লাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তোমরাও যদি এই প্রকারে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হও, তবে তোমরাও ধর্ম্মের ঠিক পথ অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে তাহারা যদি অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তোমার আর কোন দায়িত্ব নাই। কারণ, ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ হইতেছে সত্যকে স্পষ্টরূপে মানব-সমাজে পৌছাইয়া দেওয়া, ইহার অতিরিক্ত তাহার আর কোনই কর্ত্তব্য নাই।

এই যে একমাত্র আল্লাহতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ, এই যে বিশ্বমানবের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তিস্থাপনের পরম সাধনা, এই যে রিক্ত মুক্ত ও অনাবিল তাওহীদের ধর্ম্ম—এছলাম, মুছলমানত্বের দাবীদার-আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব কতটুকু বিদ্যমান আছে, এখানে তাহা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে মুছলমান-পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

---

৩ রুকু'

২০ নিশ্চয়, আল্লার নির্দর্শনগুলিকে[২৪২] অমান্য করে যাহারা আর নবী-দিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে যাহারা, এবং জনগণের মধ্যে যে সমস্ত লোক ন্যায়-বিচারের আদেশ (প্রদান) করিয়া থাকে - সেই লোকগুলিকে হত্যা করে যাহারা, তাহাদিগকে তুমি পীড়াদায়ক দণ্ডের সংবাদ (জানাইয়া) দাও[২৪৩]।

২০ انّ الّذين يكفرون بايت الله
ويقتلون النّبيّن بغير حقّ لا
ويقتلون الّذين يامرون
بالقسط من النّاس لا فبشّرهم
بعذاب اليم ۝

২১ এই'ত তাহারা, যাহাদের কর্ম্ম-গুলি ইহকালে ও পরকালে 'বি-ফল' হইয়া গেল, বস্তুতঃ তাহাদের সাহায্যকারী কেহই নাই[২৪৪]।

২১ اولئك الّذين حبطت اعمالهم
في الدّنيا والاخرة ز وما لهم
من نّصرين ۝

২২ কেতাবের অংশবিশেষ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা-তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছ না!— তাহারা আহুত হইতেছে আল্লার কেতাবের পানে - যেন উহা তাহাদিগের মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়, অতঃপর

২২ الم تر الى الّذين اوتوا نصيبا
مّن الكتب يدعون الى
كتب الله ليحكم بينهم

ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞

তাহাদিগের মধ্যকার একদল ফিরিয়া দাঁড়ায়—বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে (সত্য-) বিমুখ[২২৫]।

٢٢ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

২৩ —ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলে—'গণিত কএকটা দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না'—বস্তুতঃ তাহাদিগের মিথ্যা-রচনাগুলি তাহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে[২২৬]।

٢٤ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞

২৪ অতএব, কিরূপ (অবস্থা ঘটিবে) তখন - সেই সন্দেহহীন দিনে তাহাদের সকলকেই যখন আমরা সমবেত করিব—এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন নিজের কর্ম্মফলগুলি পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে, আর তাহারা অত্যাচারিত(ও) হইবে না।

٢٥ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ

২৫ বল!—হে আল্লাহ, হে রাজ্যাধিপ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর আর যাহা হইতে ইচ্ছা রাজ্যহরণ কর, এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আর যাহাকে ইচ্ছা অবমানিত কর! তোমারই হাতে সকল কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান।—

٢٦ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২৬ দিবসের মধ্যে রজনীকে প্রবিষ্ট কর তুমি—আর রজনীর মধ্যে দিবসকে প্রবিষ্ট কর তুমি! এবং মৃত হইতে জীবিতকে বাহির কর তুমি, আর জীবন্ত হইতে মৃতকে বাহির কর তুমি! আর যাহাকে ইচ্ছা অগণিত-ভাবে 'রেজ্‌ক'-দান কর তুমি!

٢٧ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط

২৭ মোমেনগণ যেন মোমেনদিগকে ত্যাগ করিয়া, কাফেরদিগকে 'অলি'-রূপে গ্রহণ না করে!—আর এরূপ (আচরণ) করিবে যে ব্যক্তি, আল্লার সহিত তাহার (সম্বন্ধ-সংশ্রব) কিছুই থাকিল না—তবে তাহাদিগের (অনিষ্ট) হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা যাহা করিবে (তাহাতে দোষ নাই), আর আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের সম্বন্ধে

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ◎

সতর্ক করিয়া দিতেছেন, বস্তুতঃ ফিরিবার স্থান'ত একমাত্র আল্লারই সন্নিধানে।[২৪৮]

٢٨ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ◎

২৮ বল !—নিজেদের অন্তরের বিষয়-গুলি তোমরা গোপন কর বা প্রকাশ কর—আল্লাহ সে সমস্ত অবগত হন ; আরও স্বর্গের সব-কিছু ও মর্ত্তের সব কিছু তিনি অবগত হন, বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান।

٢٩ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا صلے ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ع

২৯ সেই-সেদিন, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেদিন নিজকৃত সৎকর্ম্মগুলিকে বিদ্যমান (দেখিতে) পাইবে, এবং স্বকৃত অসৎকর্ম্মগুলিকেও (প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইবে) ; সে কামনা করিবে—তাহার এবং তাহার এই কৃতকর্ম্মের মধ্যে যদি দূর-ব্যবধান হইয়া যাইত ! আর আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ হইতেছেন বান্দাদিগের প্রতি পরম স্নেহশীল।

টীকা :—

২৪২ 'আয়ত' বা নিদর্শন :—

আয়ত শব্দের অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন—যাহাদ্বারা অন্য কোন বিষয় বা বস্তুর সত্যতার বা অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, ধোঁওয়া দেখিলে জানা যায় সেখানে আগুন আছে, এখানে ধোঁওয়া আগুনের নিদর্শন। ঘট দেখিলে কুম্ভকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে, এখানে ঘট কুম্ভকারের নিদর্শন। এই হিসাবে কোর্‌আনে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে আল্লার নিদর্শন বলা হইয়াছে, নবীদিগকে ও আল্লার বাণীকে নিদর্শন বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফের্‌আওনের মৃতদেহকে ও জালুতের পরাজয়কে, বদর-যুদ্ধে মুছলমানদের বিজয়লাভকে এবং যুক্তিপ্রমাণ প্রভৃতিকেও 'আয়ত' বা নিদর্শন বলা হইয়াছে।

আল্লার বহু আয়ত ও নিদর্শনের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই ছুরার ১১ আয়তে অচিরে কাফেরদিগের পরাজিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, ১২ আয়তে বদর যুদ্ধকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর আয়ত বা নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মোছলেম আমীর তালুত অল্প-সংখ্যক দৃঢ়বিশ্বাসী অনুচরদিগকে মাত্র লইয়া জালুতের বিরাট বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিতেছেন, এই ঘটনার উল্লেখ করার পর ছুরা বকরে বলা হইয়াছে—ইহাও আল্লার এক নিদর্শন। ছুরা মোমেনিনে বলা হইয়াছে— وجعلنا ابن مريم وامه آية

অর্থাৎ—"ঈছাকে ও তাহার জননীকে আমরা আয়ত বা নিদর্শন করিয়াছিলাম।"

এছরাইলীয় জাতির লোকেরা আল্লার এই সমস্ত নিদর্শনকেই অমান্য করিয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ তাহারা হজরত ঈছাকে অমান্য করিয়াছে, বিবি মর্‌য়মকে অবমানিত করিয়াছে। সকলের উপর, তাহাদের সমস্ত শক্তিসম্পদকে পরাভূত করিয়া এই মুষ্টিমেয় মুছলমান যে একদিন এছলামের জয়-পতাকাকে দুন্‌য়ার উপর উঁচু করিয়া ধরিবে—উপরে বর্ণিত জয়-পরাজয় ও উত্থান-পতনের বিচিত্র বিবরণগুলি অবগত হইয়াও—খৃষ্টান-দলপতিরা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, সেই প্রত্যক্ষ সত্য নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিতেছে। পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জিলে জগতের শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার আগমনের যে সব খোশখবর এবং তাঁহার সত্যতার যে সমস্ত নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে, এহুদী ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত সে নিদর্শনগুলিকেও অমান্য করিতেছে। এই অমান্য করার ফল কি হইবে, আয়তের শেষভাগে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৪৩ নবী ও সত্যসেবকদিগকে হত্যা :—

নবী ও রছুলগণ হইতেছেন আল্লার নিদর্শনগুলির প্রথম ও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা এবং তাঁহার আয়ত বা বাণীর সাক্ষাৎ বাহন। কাজেই আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিতে চায় যাহারা, তাহাদের প্রধান চেষ্টা হয় ঐ নবীদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে। কারণ, তাহারা মনে করে, এইরূপে

আল্লার প্রদর্শিত সত্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা সম্ভবপর হইবে। আবার নবীরা সব কাজ নিজেরাই শুধু করিতে পারেন না, তাঁহারা চিরকাল বাঁচিয়াও থাকেন না। এ অবস্থায় মানব-সমাজে নবীদিগের প্রদর্শিত সত্যকে জয়যুক্ত করিয়া রাখেন—তাঁহাদের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল মহামানব। অতএব, সত্যকে ধ্বংস করার জন্য এই মহামানবদিগকে হত্যা করার চেষ্টাও ঐ শ্রেণীর লোকেরা চিরকালই করিয়া থাকে। সকল দেশের সমস্ত পুরাণ-ইতিহাসে সত্যের বিরুদ্ধে শয়তানের এই প্রকার সংগ্রামের বহু নজির দেখিতে পাওয়া যায়। এছরাইলীয়দিগের এই হত্যা-প্রচেষ্টার প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে হজরত এহ্য়া ও হজরত ঈছার হত্যা ও হত্যাচেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মক্কার কোরেশ, মদিনার এহুদী, পারস্যের অগ্নিউপাসক ও রোমের খৃষ্টানশক্তি—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে নিহত ও বিধ্বস্ত করার জন্য ইহাদের কেহই সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

"নবীদিগকে হত্যা করে"—অর্থে, নবীদিগের প্রাণবধ করে, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে চায়। আবার "হত্যা করে" অর্থে, হত্যা করিয়া ফেলে অথবা হত্যা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই মহাপাতকে লিপ্ত হয় যাহারা, আয়তের শেষে তাহাদিগকে পীড়াদায়ক দণ্ডের সংবাদ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দণ্ড শুধু পরকালের জন্য নির্দ্ধারিত নহে, পার্থিব-জীবনেও তাহাদিগকে সেই কঠোর দণ্ডের অংশভাগী হইতে হইবে। রাজ্যরাজত্ব হারাইয়া, মানসম্ভ্রম খোওয়াইয়া, জাতির জীবনসাধনার সব উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকিয়াই জীবন্ত জাতি ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই হইতেছে দুনয়ার সেই পীড়াদায়ক দণ্ড। ২৫ ও ২৬ আয়তে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২৪৪ **হব'তুন—'বি-ফল' হওয়া :—**

মূলে حبطت শব্দ আছে, সাধারণতঃ 'পণ্ড হইয়া যাওয়া' 'ব্যর্থ হইয়া যাওয়া' বলিয়া উহার অনুবাদ করা হয়। কিন্তু ইহাতে শব্দের সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ পায় না। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হয়, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া গেল—এই অবস্থাতে حبط শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ধাতুগত হিসাবে উহার মূল তাৎপর্য্য এইরূপ:—"পশু কোন এক উপাদেয় চারণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এমন অসঙ্গতভাবে আহার করিল, যাহাতে তাহার পেট ফাঁপিয়া উঠিল এবং সে মরিয়া গেল। এ অবস্থাতেই বলা হয় حبطت الدابة অর্থাৎ পশুর কার্য্য 'পণ্ড ও বিপরীত ফলপ্রদ' হইয়া গেল (রাগেব, বেহার, জওহারী)।" আহারের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরের পুষ্টিসাধন ও শক্তিলাভ, তাহা'ত হইলই না। পক্ষান্তরে তাহার বিপরীত ফল ফলিল—এই অন্যায় কার্য্যের দ্বারা পশু পীড়া ও মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিল। এইরূপে, ধর্ম্মের বৈরীরা নবী ও রছুলদিগকে হত্যা করার চেষ্টা পায় সত্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে। এ উদ্দেশ্য'ত সফল হয়ই না, বরং এই কুকর্ম্মের প্রতিফলে বিপন্ন বা বিধ্বস্ত হয় তাহারাই। অনুবাদে বিফল শব্দের "বি" বিপরীত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪৫ আল্লার কেতাবের পানে আহ্বান :—

কোর্‌আনের শিক্ষা অনুসারে দুন্‌য়ার সকল কেন্দ্রেই আল্লার কেতাব বা তাঁহার বাণী সমাগত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে ও বিভিন্ন অবস্থাগতিকে ঐ সব বাণী বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থানে যাহা আছে, তাহা হইতেছে মূলের একটা বিকৃত অংশ-বিশেষ বা অপভ্রংশ। পক্ষান্তরে, স্বার্থ বা অবহেলা-জনিত প্রক্ষেপের ফলে ও পণ্ডিত-পুরোহিত-দিগের নানা অত্যাচারে, তাহাও এখন অজ্ঞেয় ও অব্যবহার্য্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত 'শাস্ত্র' ও ব্যবস্থা আসিয়া এখন সেই স্বর্গীয় বাণীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলে, এই সব সম্প্রদায়ের জন-সাধারণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে—"কতকগুলি কাল্পনিক খেয়াল ব্যতীত (নিজেদের) কেতাবের কিছুই তাহারা অবগত নহে, তাহারা কেবল অনুমানই করিয়া থাকে" (বকরা ২৭)। তাহার পর, এই কেতাবগুলি আসিয়াছিল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত যুগের বিভিন্ন জাতির নিকট, তাহাদের সাময়িক ও স্থানীয় (Local) অভাব পূরণ করার জন্য—অতএব বিশ্বমানবের সাধারণ ও চিরন্তন কেতাব হওয়ার যোগ্যতা সেগুলির কোনটীরই নাই।

এই সমস্ত কারণ একত্র হইয়া বিশ্বমানবের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া মহাবিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া গেল। তাহারা শুধু অন্য ধর্ম্মের ও 'পরজাতির' সহিত কলহ বাধাইয়াই ক্ষান্ত হইল না। বরং এই বিসম্বাদ ও সংঘর্ষে তাহাদের নিজেদের শাখা-প্রাশাখাগুলিও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নামকরণে বিশ্বমানবের এই সংঘাত-সংঘর্ষ যখন চরম শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইল, আল্লার মঙ্গলবিধানে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব হইল ঠিক সেই সময়। তখন তিনি বিবদমান বিশ্বমানবের নিকট আল্লার কালাম—কোর্‌আন মজিদ—লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—ইহাই হইতেছে তোমাদের সব মতভেদের স্বর্গীয় সমন্বয়, সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান। এই সমন্বয় ও সমাধানই কোর্‌আনের একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই আল্লাহ তাআলা কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়তে বলিয়াছেন :—

و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ ، و ھدی و رحمۃ لقوم یؤمنون -

—"এবং (হে মোহাম্মদ !) আমরা তোমার প্রতি কোর্‌আন নাজেল করিয়াছি—একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, গ্রন্থধারীরা যে সব বিষয় লইয়া পরস্পর বিসম্বাদ করিয়াছে, তুমি যেন তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে (প্রকৃত সত্যগুলি) স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও এবং (এই কোর্‌আন যেন) বিশ্বাসবান সমাজের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত-স্বরূপ হয় (নহল ৬৪)।

বস্তুতঃ কোর্‌আন সব বিবাদেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হইতেছে খৃষ্টান পুরোহিতদিগের সঙ্গে। হজরত ঈছা ও হজরত এহ্‌য়া (যীশু ও যোহন ভাববাদী)কে লইয়া তাহারা এহুদীদিগের সঙ্গে যে বিসম্বাদ উপস্থিত করিয়াছে, একটু পরেই তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এহুদীরা বলিতেছে—মর্‌য়ম কুলটা আর

তাহার পুত্র যীশু জারজ, তাওরাৎ-বিদ্রোহী ভণ্ড ও কাফের। পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা বলিতেছে—যীশু ঈশ্বরের একজাত পুত্র ও স্বয়ং ঈশ্বর। এহুদীরা বলিতেছে—শাস্ত্রদ্রোহের ফলে ক্রুশে নিহত হইয়া তাওরাত অনুসারে যীশু 'অভিশপ্ত' হইয়াছেন। আবার খৃষ্টানেরা বলিতেছে—সদাপ্রভু জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, তাঁহার এই একজাত পুত্রকে পাপীদিগের উদ্ধারের জন্য কোরবানী করিলেন। এখন যীশুর শোণিতে বিশ্বাস করিলেই পাপীর মুক্তি। এই বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া কোর্‌আন বলিতেছে—হজরত ঈছা ভণ্ড নহেন, জারজ নহেন এবং তাওরাতদ্রোহীও নহেন। পক্ষান্তরে তিনি ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের পুত্র বা অবতারও নহেন। তিনি ছিলেন অন্যান্য মানুষের মত এই দুনয়ারই একজন মানুষ এবং অন্য রছুলগণের ন্যায় একজন মহামহিম রছুল। ক্রুশে তিনি নিহতই হন নাই, সুতরাং সে উপলক্ষে তাঁহার অভিশপ্ত হওয়ার বা কোরবানী হওয়ার ঝগড়াগুলি সমস্তই মূলতঃ ভিত্তিহীন—ইত্যাদি।

কিন্তু এই বিবদমান-বিশ্বমানবের মধ্যে সত্য-বিমুখ যাহারা, কোর্‌আনের এই সব মীমাংসাকে তাহারা গ্রহণ করিতেছে না। কারণ, সত্যকে লাভ করাই হয় যেখানে বিসম্বাদের প্রকৃত লক্ষ্য, এবং—ভ্রান্তভাবে হইলেও—যেখানে মূলতঃ মমতা হয় এই সত্যেরই জন্য, মীমাংসা সম্ভবপর হয় কেবল সেইখানে। তাই কোর্‌আনের এই মীমাংসাকে অমান্য করিয়া তখন একদল লোক ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সত্যের এমনই মহিমা, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, দীর্ঘ তের শত বৎসর পরে খৃষ্টান-ইউরোপের মনীষী ব্যক্তিরা সকলেই আজ কোর্‌আনের এই সব মীমাংসাকেই একমাত্র সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ সমাধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই আয়তের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তফছিরের কোন কোন কেতাবে একটী ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, খায়বারের এহুদীদিগের মধ্যে খুব উচ্চঘরের একটী যুবক ও একটী যুবতী ব্যভিচারের অপরাধে ধরা পড়ে। এহুদী-পুরোহিতদের সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে তাওরাতের দণ্ডবিধির কঠোর ব্যবস্থাগুলি ভদ্রঘরের অপরাধীদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে তাহারা সহজে প্রস্তুত হইত না। যাহা হউক, এই ব্যাপার লইয়া তাহাদের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, কতিপয় এহুদী—সম্ভবতঃ কোর্‌আনে বর্ণিত সহজতর ব্যবস্থালাভের আশায়—হজরতের নিকট উপস্থিত হইল। হজরত বলিলেন—তোমরা তাওরাৎ মান্য করিয়া থাক। হজরত মুছার ব্যবস্থা অনুসারে এই শ্রেণীর ব্যভিচারী নরনারীকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিতে হইবে। এহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতরা তখন বলিতে থাকে—মুছার ব্যবস্থায় কোথায়ও এরূপ দণ্ড লেখা নাই। অতঃপর হজরতের আদেশ অনুসারে তাওরাৎ আনা হইল এবং এহুদী-পণ্ডিতরা ঐ স্থানটী পড়িয়া যাইতে লাগিল। ঐ দণ্ডাদেশটা কিন্তু তাহারা বাদ দিয়া গেল। মদিনার এহুদীদিগের প্রধান পণ্ডিত আবদুল্লাহ-এবনে-ছালাম পূর্ব্বেই মুছলমান হইয়াছিলেন। তিনি এই চুরির ব্যাপারটা ধরাইয়া দিলেন।

এই রেওয়ায়তটী উদ্ধৃত করার পরার পর সেল সাহেব বলিতেছেন —

It is very remarkable that this law of Moses concerning the stoning of adulterers is mentioned in the New Testament (though I know some dispute the authenticity of that whole passage), but it is not now to be found, 'either in the Hebrew or Samaritan pentateuch or in the Septuagint; it being only said that *such shall be put to death.'* (৫ ও ৬ টীকায় তিনি যথাক্রমে যোহন ৮-৫ এবং লেবীয় ২০-১০ পদের বরাত দিয়াছেন)।

সেল সাহেবের এই মন্তব্যের সার মর্ম্ম এই যে, নূতন নিয়মে বা খৃষ্টানদিগের বাইবেলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, মোশির ব্যবস্থায় ব্যভিচারী নরনারীদিগকে 'রজম' করার অর্থাৎ পাথর মারিয়া নিহত করার আদেশ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান তাওরাতের কোন পাঠে বা তাহার কোন পুস্তকে (Pentateuch বা Septuagintএর কুত্রাপি) এখন আর ঐ পাথর মারিয়া নিহত করার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে পাওয়া যায় শুধু "Such shall be put to death" বা "তাহাদিগকে নিহত করা হইবে"-এই আদেশ। যথা :—লেবীয় পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, "সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড হইবে।" সেল সাহেব বন্ধনীর মধ্যে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, নূতন নিয়মের যে পদটীতে পাথর মারার উল্লেখ আছে, একদল খৃষ্টান-পণ্ডিত তাহাকে বাইবেলের বচন বলিয়া স্বীকার করিতে চান না।

কি করিয়া সেল সাহেব এরূপ দাবী করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, আমরা দেখিতেছি, Pentateuch বা মোশির পঞ্চ পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণে খুবই স্পষ্ট কথায় লেখা আছে :—"যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া **প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে।**" (২২—২৪)। এই অধ্যায়ের ২১ পদেও নষ্টচরিত্র কুমারী কন্যাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার আদেশ বিদ্যমান আছে। হজরত ঈছার সময় এহুদী-পণ্ডিতেরা যখন তাঁহারই সম্মুখে প্রকাশ করিতেছে যে, মোশির ব্যবস্থায় ব্যভিচারীদের জন্য ঐ দণ্ডাদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং হজরত ঈছা তাহা অস্বীকারও করিতেছেন না, তাহাতেই'ত রাবীদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান বাইবেলে যাহা নাই, ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ছিল না, এরূপ দাবী করা বাইবেল সম্বন্ধে আদৌ সঙ্গত হইবে না। বাইবেলের ন্যায় সদাপরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মপুস্তক জগতে আর একটিও নাই। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে খৃষ্টানেরা নিজেদের বাইবেলের যে সব রদ-বদল করিয়া লইয়াছেন, এক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট হইবে।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক মুছলমান টীকাকারগণ এবং তাঁহাদের নকল-নবীসেরা সেলের পাদটীকা পর্য্যন্ত নিজেদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর জনৈক নকল-নবীস তফছিরকায় আলোচ্য আয়তের টীকায় বলিতেছেন—"ব্যভিচারীর অপরাধ যদি শরীয়তের

নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করাই পবিত্র কোর্‌আনের ব্যবস্থা।" ইহা কোর্‌আন সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ কোর্‌আনের কোন স্থানেই এরূপ দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় নাই।

২৪৬ **কর্ম্মফলে অবিশ্বাস :—**

এহুদীরা বলিত—আমরা যতই মহাপাতকে লিপ্ত হই না কেন, গণিত কএকটা দিন ব্যতীত আমাদিগকে তাহার দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। (৮২ টীকা দ্রষ্টব্য)। বহু আম্বিয়ার স্বজাতীয় বলিয়া, নবীদিগের বংশধর বলিয়া এবং তাওরাতের বাহকজাতি বলিয়া তাহাদের মধ্যে এই কৌলিন্যের অভিমান বদ্ধমূল হইয়াছিল। ফলতঃ তাহারা নিজদিগকে কর্ম্মফলের অতীত বলিয়া মনে করিত, এবং বিশ্বাস করিত যে, এই কৌলিন্যই তাহাদিগকে সকল পাপফল হইতে রক্ষা করিবে। খৃষ্টানেরা আরও উন্নতি করিয়া বলেন—তাঁহারা যীশুর বলিদানে বিশ্বাস করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের সব কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ এই বিশ্বাসের পর তাঁহারা যে কোন মহাপাতকে লিপ্ত হউন না কেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। বিশ্বমানবের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে এই যে কৌলিন্যের অন্যায় অভিমান, এবং এই অভিমানের কারণে কর্ম্মফল সম্বন্ধে এই যে তাহাদের অসঙ্গত উপেক্ষা, ইহারই জন্য তাহারা সত্য-বিমুখ হইয়াছে এবং এইজন্যই তাহারা কোর্‌আনের সমন্বয় ও মীমাংসাগুলিকে গ্রহণ করিতেছে না।

এই শ্রেণীর স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা রচনাগুলিই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে—অর্থাৎ এই আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যই তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পরবর্ত্তী আয়তে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বকীয় কর্ম্মফল পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইবে এবং তাহারা এই কর্ম্মফল ভোগে কোনরূপ অত্যাচারিত হইবে না। অর্থাৎ, নবীর আত্মীয় বা মুনিঋষির বংশধর বলিয়া কাহারও দণ্ডের লাঘব হইবে না এবং দীনদরিদ্র, পরজাতি, অনার্য্য, শূদ্র, পঞ্চম প্রভৃতি বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করা হইতেছে, সৎকর্ম্মের সুফল হইতে তাহারাও বঞ্চিত হইবে না। ফলতঃ আল্লার সমীপে গ্রাহ্য হয় সত্যবিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম, খেয়াল বা বংশের হিসাবে কোন তারতম্য সেখানে নাই। দুঃখের বিষয়, মুছলমান-সমাজের মধ্যেও এই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রাদুর্ভাব ক্রমশই শোচনীয়তর আকার ধারণ করিয়া চলিয়াছে। আজ তাহাদের মধ্যকার বহুলোকই বিশ্বাস করিতেছে যে, এছলামের নির্দ্দিষ্ট আদেশ নিষেধগুলি পালন করি বা না করি, তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। জীবনে দুই একবার 'মৌলুদ শরীফের' মজলিস বসাইয়া দিলেই আমাদের উর্দ্ধতন সাত পুরুষ বিনা বাধায় তরিয়া যাইবে। 'বস্তুতঃ তাহাদের মিথ্যা-রচনাগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে'—এই আয়তটী এই শ্রেণীর মুছলমানদিগের সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অবান্তর হইলেও নিজের জীবনের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কলিকাতার কোন মুছলমান-প্রধান পল্লীতে একদা এক ওয়াজের মজলিসের আয়োজন হয়। স্থানীয় মুছলমানদিগের, বিশেষতঃ তাহাদের কতিপয় প্রধানব্যক্তির মধ্যে, মদ তাড়ি ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য অভিশাপগুলির যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং ইহার প্রতিকার চেষ্টা করাই ছিল উদ্যোক্তাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ওয়াজের ভার আমারই উপর পড়িয়াছিল এবং আমি সেখানে নিজের শক্তি অনুসারে, কোর্‌আন ও হাদিছ আবৃত্তি করিয়া ঐ সব পাপের কঠোর দণ্ডের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। পল্লীর সেই প্রধান ব্যক্তিগণ আমার ওয়াজে অসন্তুষ্ট হইয়া, বাঙ্গলার কোন একজন বিখ্যাত পীর ছাহেবকে আনিয়া সেই সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে আর এক ওয়াজের ব্যবস্থা করিলেন। পীর ছাহেব নানা প্রকার বাজে আড়ম্বরের পর, হজরতের শাফাআতের কথা পাড়িলেন এবং সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, কিয়ামতের দিন "উম্মতি! উম্মতি!" করিয়া হজরত তাঁহার উম্মতের সমস্ত গোনাহগারকে তরাইয়া লইবেন, তাহারা বেহেছাব জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে। শ্রোতারা কাঁদিলেন, হো-হা করিলেন, আমার ওয়াজের Counter act সম্পূর্ণভাবে হইয়া গেল

এই সমস্ত আত্মপ্রবঞ্চনায় মুছলমানের মন ও মস্তিষ্ককে সত্যবিমুখ ও কর্ম্মবিমুখ করিয়া ফেলিতেছে। বিবি ফাতেমাকে হজরত বলিতেছেন—ফাতেমা! মনে করিও না যে, মোহাম্মদের কন্যা বলিয়া তরিয়া যাইবে। না, না, প্রত্যেককেই তাহার কর্ম্মফল পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইবে। এই শ্রেণীর হাদিছ আমাদের ওয়াজের মজলিসগুলিতে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না!

২৪৭ রাজ্য ও সম্মান এবং জীবন ও আলোক :—

২৫ ও ২৬ আয়তে একটা বিশেষ প্রার্থনার উল্লেখ হইয়াছে। প্রার্থনার প্রারম্ভে আল্লাহকে 'মালেকুল-মুল্ক' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। মালেক অর্থে—স্বামী, অধীশ্বর। মুল্ক অর্থে—রাজ্য, উহার প্রথমে 'লাম' সাকুল্যবাচক। অর্থাৎ সকল প্রকারের সমস্ত রাজ্যের একমাত্র অধিপতি হইতেছেন আল্লাহ। রাজ্য বলিতে দুনয়ার সাধারণ রাজ্য-রাজত্বকে যেমন বুঝায়, সেইরূপ জ্ঞান-রাজ্য, অধ্যাত্ম-রাজ্য প্রভৃতিও উহার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাই সকল প্রকারের সমস্ত রাজ্যের একমাত্র মালেক বা অধীশ্বর, অর্থাৎ এই সব রাজ্যদান বা প্রতিগ্রহণে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র শক্তি বা অধিকার অন্য কাহারও নাই।

প্রার্থনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে দুইটী কথা বলা হইয়াছে :—

তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর
এবং
তুমি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজ্যহরণ কর।

তুমি যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর
এবং
যাহাকে ইচ্ছা অবমানিত কর।

অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, রাজ্যের অধিকারী হওয়া আর সম্মানিত হওয়া, এবং রাজ্যহারা

হওয়া ও অবমানিত হওয়া—একই কথা। বস্তুতঃ দ্বিতীয়টা কার্য্য এবং প্রথমটা তাহার কারণ। আল্লার দণ্ডরূপেই জাতি সম্মান-সম্পদ খোওয়াইয়া পরাধীন হইয়া থাকে।

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা রাজ্যদান করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজ্যহরণ করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত বা অবমানিত করেন—প্রার্থনায় এইরূপ বলা হইয়াছে। এখানে হয়'ত কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে—শক্তিমান বলিয়া তবে কি তিনি অহেতুকী স্বেচ্ছাচারেরও প্রশ্রয় প্রদান করেন? এই সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—সকল কল্যাণ তাঁহারই হাতে বা অধিকারে। অর্থাৎ তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান, তেমনই তিনি আবার সর্ব্বমঙ্গলময়। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানত্বের প্রকাশ ও প্রয়োজন হয় এই সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বেরই মধ্য দিয়া। যাহাকে রাজ্যদান করিলে বা যাহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইলে তাঁহার সৃষ্টির কল্যাণ হয়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাদ্বারা তাহাই সাধিত হইয়া থাকে।

২৬ আয়তের প্রথমে, জাতিগণের জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতের কথা বলা হইতেছে। মঙ্গলময় আল্লার ইচ্ছায় মৃতজাতি হইতে কিরূপে একটা জীবন্তজাতির অভ্যুদয় হয়, আবার জীবন্তজাতি কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পরবর্ত্তী পদে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আর তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণিত 'রেজ্‌ক' দান কর"—পদে, রেজ্‌ক শব্দ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। রুজী বা উপজীবিকা বলিয়া উহার অর্থ করিলে শব্দটাকে অন্যায়ভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া লওয়া হইবে। "জ্ঞান, সম্পদ, সম্মান, ইহ-পরকালের যাবতীয় ঐশিক দান ও নে'মত, সকল প্রকারের সমস্ত উপকারজনক বস্তু"কেই রেজ্‌ক বলা হয় (রাগেব, জওহারী প্রভৃতি)। و ما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها * —আয়তে, মেঘকে রেজ্‌ক্ বলা হইয়াছে (জওহারী)।

পূর্ব্ব রুকু'র ৯ হইতে ১২ আয়ত পর্য্যন্ত এবং এই রুকু'র ২১ আয়তে, সত্যবিমুখ এছলাম-বৈরীদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইবে, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া তাহারাই বরং পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ফেরআওনের ধ্বংস-বিবরণের উল্লেখ করিয়া এবং বদর-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ নজির দিয়া, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করা হইয়াছে—এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা প্রতিপক্ষ যাহাতে নিজদিগকে ধ্বংস করিয়া না ফেলে, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চেতনা হইতেছে না। দুন্‌য়ার বাহ্য উপলক্ষ-উপকরণ সমস্ত তাহাদেরই হস্তগত। সমগ্র আরব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা'র প্রাণের বৈরী, রোম ও পারস্যের অগণিত বীর-সৈন্য এছলামের মূলোৎপাটনের জন্য প্রস্তুত। পক্ষান্তরে মুছলমানের সংখ্যা তখন একেবারে নগণ্য, অর্থ ও রণ-সম্ভারের দিক দিয়াও তাহারা অতি দীন। এ অবস্থায় কোর্‌আনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আস্থা স্থাপন করার কোন কারণই তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

---

* অনুবাদ—এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে রেজ্‌ক্ অবতীর্ণ করিয়া তাহাদ্বারা মৃত জমিনকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

প্রতিপক্ষের মানসিকতার অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় আল্লাহ, হজরতকে এই প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে আদেশ দিতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে হজরতকে প্রার্থনা করার আদেশ দেওয়া হইলেও এবং প্রথমতঃ খৃষ্টান-পুরোহিতদের মোকাবেলায় প্রচারিত হইলেও, উহা হইতেছে সকল মুছলমানের শাশ্বত প্রার্থনা, সকল জাতির সম্মুখে কোর্‌আনের চিরন্তন ঘোষণা। প্রার্থীর বুকের গভীর অটুট বিশ্বাসের উপরই এ প্রার্থনার ভিত্তি স্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটী আয়তে মোছলেম-অন্তরের সেই অটুট বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি করা হইয়াছে মাত্র। শক্তির অভিমানে, রাজ্য-রাজত্বের অহমিকায় এবং সম্মান-সম্পদের প্রপঞ্চে আত্মহারা হইয়া আছে যাহারা, তাহাদের জানা উচিত যে, ঐ সমস্তের একমাত্র কর্ত্তা ও একমাত্র মালেক হইতেছেন সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় আল্লাহ। ঐগুলির দান ও হরণ সেই সর্ব্বশক্তিমানের মঙ্গল ইচ্ছায় উপর নির্ভর করিতেছে। সেই ইচ্ছার প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারও নাই। যে জাতি তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছার অনুরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, রাজ্য, সম্মান ও স্বর্গীয় আলোকের অধিকারী তাহারাই হইবে, নবজীবনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারাই অসাধ্য-সাধন করিতে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে, তাঁহার সেই মঙ্গল-ইচ্ছার বিপরীত আচরণ হইবে যাহাদের, সে জাতির জীবন-সন্ধ্যা শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিবে। এখানে মুছলমানকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লার সর্ব্বব্যাপী চিরন্তন বিধান, এবং মুছলমানের অনুকূলে ও প্রতিকূলেও, এই বিধানটী সমানভাবে প্রযোজ্য।

২৪৮ **কাফেরদিগের সহিত সহযোগ :—**

কাফেরদিগের সমস্ত জনশক্তি ও ধনশক্তিকে পরাভূত করিয়া সত্যের সেবক-মুছলমান অচিরে সর্ব্ববিজয়ী হইয়া উঠিবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্বে পুনঃপুন করা হইয়াছে। এজন্য যে বিশ্বাস ও যে সাধনা মুছলমানের অর্জ্জনীয় হইবে, পূর্ব্ব আয়তে তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে, জাতি-সাধনায় লিপ্ত মুছলমানের একটা বিশিষ্ট গুণের কথা এই আয়তে বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

কোর্‌আন সংখ্যাশক্তি অপেক্ষা গুরুত্ব দিয়াছে সঙ্ঘশক্তিকে। অটুট সঙ্ঘশক্তির অধিকারী হইতে পারিলে অল্পসংখ্যক হইয়াও, সংখ্যাগুরু প্রতিপক্ষের মোকাবেলাতেও তাহারা প্রবল ও অজেয় হইয়া থাকিতে পারিবে, মুছলমানকে এ শিক্ষা পুনঃপুন দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জনের জন্য বিশেষ দরকার হয়, জাতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য solidarity বা সমষ্টার। এই সমষ্টার সামান্য একটু ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে যে কাজে, তাহাকে বিষবৎ বর্জ্জন করা মোছলেম-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। তাই এই সমষ্টা রক্ষার জন্যই মুছলমানকে বলা হইতেছে— তোমরা যেন, মুছলমানকে বাদ দিয়া, অমুছলমানকে অলি-রূপে গ্রহণ করিও না। কারণ, ইহাতে তোমাদের সেই সঙ্ঘশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই আয়তের তফছির প্রসঙ্গে বহু ভিত্তিহীন গল্পের এবং নানা প্রকার অপসিদ্ধান্তের অবতারণা করা হইয়া থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আয়তটীর অর্থ খুবই সরল। এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমে আয়তের "অলি" ও "দূনা" শব্দের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

অলি-শব্দ আমাদের সকলেরই পরিচিত। "নাবালেগের অলি-অছি" আমরা সকলেই বলিয়া থাকি। ইহারই ধাতু হইতে মোতাওয়াল্লী-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ—কার্য্য-নির্ব্বাহক, বন্ধু, সাহায্যকারী, প্রতিনিধিরূপে স্থলাভিষিক্ত, নিকটবন্ধু ও অভিভাবক ইত্যাদি (রাগেব, জওহারী)। 'দূনা'-শব্দ বহু ও পরস্পর বিপরীত অর্থবাচক। যথা—উর্দ্ধে, নিম্নে; অগ্রে, পশ্চাতে; ব্যতীত প্রভৃতি। কোন বিষয়ে ত্রুটি করে যাহারা, তাহাদের সম্বন্ধেও বলা হয় —'দূনা'। ফলতঃ এই দুইটী শব্দের অর্থ ব্যাপকভাব গ্রহণ করিলে, আয়তের তাৎপর্য্য এইরূপ দাঁড়ায় যে—মুছলমানের প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় বা মোছলেম-জাতির স্বার্থহানি ঘটে - এই ভাবে, কোন অমুছলমানের সহিত সহযোগ-সাহচার্য্য করা মুছলমানদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। State of war বা যুদ্ধের অবস্থা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, অমুছলমানের সহিত যে বন্ধুত্বে বা সহযোগে, জাতির বা ধর্ম্মের কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে, তাহা সকল অবস্থায় অবশ্য-বর্জ্জনীয়। এই উপদেশের প্রতি অবহেলা দেখাইলে জাতির সঙ্ঘশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং এই দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া বিনাশকামী শত্রুরা মুছলমানের জাতীয় মেরুদণ্ডকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে।

কোন্ শ্রেণীর অমুছলমানদিগের সহিত সহযোগ করা বৈধ আর কোন্ শ্রেণীর সহিত অবৈধ, কোর্‌আন তাহাও খুব পরিষ্কার ভাষায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। ছুরা মোম্‌তাহেনার ৮ম ও ৯ম আয়তে বলা হইয়াছে ঃ—

"যাহারা ধর্ম্ম লইয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং যাহারা তোমাদিগকে তোমাদের স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দেয় নাই, তোমরা যে তাহাদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিবে বা তাহাদের সঙ্গে ন্যায়-ব্যবহার করিবে, ইহাতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন না। (বরং) নিশ্চয় ন্যায়বানদিগকেই আল্লাহ প্রেম করেন।"

"তিনি'ত তোমাদিগকে কেবলমাত্র সেই সব অমুছলমানের সঙ্গে সহযোগ করিতে নিষেধ করিতেছেন—যাহারা ধর্ম্ম লইয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, আর যাহারা তোমাদিগকে তোমাদের স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, এবং যাহারা তোমাদের (এই) বহিষ্কারের সহায়তা করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের সহিত সহযোগ করিবে যাহারা—অত্যাচারী'ত তাহারাই।"

এই আয়ত দুইটী হইতে খুব স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, যে সব অমুছলমান এছলাম-ধর্ম্মের প্রতি হিংসাবশতঃ মুছলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অথবা যাহারা দেশের সঙ্গত রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে মুছলমানকে বঞ্চিত করিতে চায়, তাহাদের সহিত সহযোগ করা মুছলমানের পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ। ইহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত অমুছলমানের সহিত সহযোগ করা, তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে

অবস্থান করা এবং তাহাদের প্রতি উদার ব্যবহার করাই এছলামের অভিপ্রেত। "আল্লাহ ন্যায়বান ব্যক্তিদিগকে প্রেম করেন"-পদাংশে এই ইঙ্গিতই করা হইয়াছে।

কাতাদা নামক তফছিরের জনৈক রাবী বলিয়াছেন—ছুরা মোম্‌তাহেনার এই আয়তটী, জেহাদের আয়তদ্বারা রহিত হইয়াছে *। কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা খুবই অসঙ্গত কথা। কারণ, জেহাদের অনুমতিমূলক আয়তগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—হেজরতের অল্পকাল মাত্র পরে এবং বদর-যুদ্ধের পূর্ব্বে। অথচ ছুরা মোম্‌তাহেনা অবতীর্ণ হইয়াছে হোদায়বিয়া-সন্ধির পর ও মক্কা-বিজয়ের পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, জেহাদের আয়তটী ২য় হিজরীর মধ্যে বা পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে, আর ছুরা মোম্‌তাহেনা অবতীর্ণ হইয়াছে ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম হিজরির মধ্যকার সময়ে। ফলতঃ জেহাদের আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘকাল পরে ছুরা মোম্‌তাহেনার এই আয়তটী অবতীর্ণ হওয়ায়, জেহাদের আয়তদ্বারা ইহার রহিত হওয়া অসম্ভব।

এছলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, হজরত রছুলে-করিম বা তাঁহার খলিফাগণ, ক্ষেত্র বিশেষে অমুছলমান পৌত্তলিক ও খৃষ্টানদিগের সহিত সখ্য বা সহযোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রথম-হেজরতের সময় প্রবাসী মুছলমানগণ আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। হজরত নিজে বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্রের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন--তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আবশ্যক মত তাহাদিগকে সাহায্যও করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পৌত্তলিক বনি-খোজাআ গোত্রকে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করার মূল উদ্দেশ্যই মক্কা-বিজয়ের অভূতপূর্ব্ব অভিযানের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। হোনেন-অভিযানে কএকটা মিত্রগোত্রের পৌত্তলিক সৈন্য হজরতের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। খলিফাগণের সময়, বহু খৃষ্টান সৈন্য মুছলমানদিগের সহিত একত্রে পারস্য অভিযানে যোগদান করিয়াছিল এবং পার্সিকদের বিরুদ্ধে দস্তুর মত যুদ্ধও করিয়াছিল।

ফলতঃ কোর্‌আন ও হাদিছের শিক্ষা অনুসারে, যেখানে অমুছলমানদের সহিত সহযোগ দ্বারা মুছলমানের কোন প্রকার হিত ও মঙ্গল সাধিত হইবার আশা থাকে, সেখানে সহযোগ বৈধ ও আবশ্যক। যেখানে হিত বা অহিতের আশা আশঙ্কা কিছুই নাই, সেখানে মুছলমান নিরপেক্ষ থাকিবে, উদারতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাধারণ নিয়মানুসারে পরিচালিত হইবে। পক্ষান্তরে, যে সব অমুছলমান সম্বন্ধে আশঙ্কা হয় যে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তাহারা মুছলমানের ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রগত অধিকার খর্ব্ব করার চেষ্টা পাইবে, তাহাদিগের সহিত কোন সখ্য বা সহযোগই চলিতে পারিবে না।

---

* অর্থাৎ অমুছলমানদিগের সহিত সহযোগ বা সদ্ব্যবহারের যে উপদেশ এই আয়তে দেওয়া হইয়াছে, জেহাদের আয়ৎ অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বলবৎ ছিল। কিন্তু জেহাদের আয়ৎ অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐ সমস্ত সহযোগ ও সদ্ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর অতিভ্রান্ত অভিমত ও বর্ণনাগুলিকে অবলম্বন করিয়াই খৃষ্টান লেখকরা হজরৎ রছুলে করিমের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া বলেন—মোহাম্মদ যতদিন শক্তিহীন ছিলেন, ততদিন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই উদারতা ও সদ্ব্যবহারকে তিনি অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর অমুছলমানদিগের সহিত কোন প্রকার সহযোগ চলিতে পারিবে না। ইহার পরেই বলা হইতেছে—"তবে তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদের যে প্রচেষ্টা (তাহাতে দোষ বর্ত্তাইবে না)।" অনেকে মনে করেন যে, আয়তের এই অংশে বিপন্ন ও অসমর্থ মুছলমানদিগকে প্রাণ রক্ষা করার জন্য আত্মগোপন করিতে, এবং বাহ্যতঃ কাফেরদিগের মতামতের সমর্থন করিয়া মৌখিকভাবে তাহাদের প্রতি সখ্য ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে, অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইলেও, ইহাদ্বারা দুর্ব্বল হৃদয়ের বিপন্ন লোকদের জন্য কেবল অনুমতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আদর্শের হিসাবে উহার স্থান যে এছলামী শিক্ষার কুত্রাপি নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

আমার মতে এই তাৎপর্য্যটী অনাবশ্যক ও অসঙ্গত উভয়ই। ঈমান ও তাওহীদের বিশ্বাস সম্বন্ধে আত্মগোপন করার শিক্ষা কোর্‌আনে নাই, হাদিছে নাই, এছলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে নাই। বরং সেখানে বলা হইতেছে যে, মুছলমান পার্থিব বিপদকে ভয় করিবে না। অত্যাচারী রাজার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে সত্যপ্রকাশ করিয়া দেওয়াকে অন্যতম জেহাদ বলা হইতেছে। তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মিভুত করিয়া ফেলা হউক, অথবা অন্য কোন প্রকারে নিহত করা হউক, সাবধান, কোন প্রকারে সত্যপ্রচারে কুণ্ঠিত হইবে না—ইহা ওমরের প্রতি হজরতের আদেশ। শত সহস্র ছাহাবা, এমাম ও মোহাদ্দেছগণের অগ্নি-পরীক্ষায় ও আত্ম-বলিদানে উপরোক্ত তাৎপর্য্যের যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। শেখ ছাদী ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

موحد چه بر پاے ریزی زرش　　چه شمشیر هندی نهی بر سرش
أمید و هراسش نباشد ز کس　　برین ست بنیاد توحید و بس

এই ছুরার ১০৯ আয়তের তফছিরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৪ রুকু'

٣٠ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩০ (হে মোহাম্মদ !) তুমি বলিয়া দাও ঃ—(বস্তুতই) আল্লাহকে তোমরা যদি প্রেম করিয়া থাক, তবে আমাকে অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রেম করিবেন, আর তোমাদের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদের পাপগুলি ক্ষমা করিয়া দিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ হইতেছেন—ক্ষমাশীল, করুণা-নিধান।

٣١ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩১ বল ঃ— তোমরা আল্লার আজ্ঞাবহ হও এবং এই রছুলের, অতঃপর তাহারা যদি পরাঙ্মুখ হয়, তবে (তাহাদের জানা উচিত যে) নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদিগকে প্রেম করেন না।

٣٢ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৩২ নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং এব্রাহিমের স্বজনগণকে ও এম্‌রানের স্বজনগণকে নিখিল বিশ্বের উপর (শ্রেষ্ঠরূপে) নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—

৩৩ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ط وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৩৩ বংশের হিসাবে এক অন্য হইতে সমুদ্গত ইহারা ; আর আল্লাহ হইতেছেন—সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।

৩৪ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৪ এম্‌রানের স্ত্রী যখন বলিয়াছিল ঃ— হে আমার প্রভু ! আমার গর্ভস্থ (সন্তান) কে আমি তোমার জন্য 'মানৎ' করিলাম—মুক্ত অবস্থায়, অতএব আমার নিবেদিত এই 'মানৎ'কে তুমি কবুল কর, নিশ্চয় তুমিই'ত হইতেছ সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা।

৩৫ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ○

৩৫ অতঃপর, এম্‌রানের স্ত্রী যখন ঐ সন্তানকে প্রসব করিল, সে বলিল ঃ— হে আমার প্রভু ! আমি'ত প্রসব করিয়াছি কন্যা-সন্তান—বস্তুতঃ সে যে কি প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তাহা সমধিক অবগত—আর পুরুষ'ত নারীর ন্যায় নহে—এবং আমি তাহার নাম রাখিয়াছি—মরয়ম, আর আমি তাহাকে ও তাহার সন্ততিবর্গকে অভিশপ্ত-শয়তান (-এর প্রভাব) হইতে তোমার শরণে সমর্পন করিতেছি।

৩৬ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

৩৬ সে মতে, তাহার প্রভু মরয়মকে কবুল করিলেন উত্তমরূপে আর

وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

তাহাকে বর্দ্ধিত করিলেন উত্তম-রূপে,[২২৩] এবং তাহার তত্ত্বাবধায়ক করিয়া দিলেন জাকারিয়াকে ; —যখনই জাকারিয়া মর্‌য়ম-সাক্ষাতে মেহরাবে প্রবেশ করিত, সে তাহার সমীপে (দেখিতে) পাইত—'রেজ্‌ক'। সে বলিল—হে মর্‌য়ম! তুমি এ সমস্তের অধিকারী হইতেছ কোথা হইতে? মর্‌য়ম বলিল —উহা আল্লার নিকট হইতে (সমাগত); নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিনা-হিসাবে রেজ্‌ক দান করিয়া থাকেন[২২৪]।

৩৭ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞

৩৭ সেই সময় জাকারিয়া তাহার প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করিল, সে বলিল ঃ—হে আমার প্রভু! আমাকে নিজ সন্নিধান হইতে একটী সু-সন্তান দান কর, নিশ্চয় একমাত্র তুমিই'ত হইতেছ প্রার্থনা-মন্‌জুরকারী।

৩৮ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ

৩৮ অনন্তর জাকারিয়া মেহরাবে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতেছে—এমন সময়, ফেরেশতারা তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল যে ঃ— "আল্লাহ তোমাকে য়াহ্‌য়া সম্বন্ধে খোশ্‌খবর দিতে-

يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

ছেন, (সে হইবে) আল্লার পক্ষ হইতে (প্রকাশিত) এক বাক্যের সত্যতার সমর্থনকারী ও সমাজ-পতি এবং কামচর্য্যা হইতে আত্মসম্বরণকারী আর সজ্জন-গণের মধ্যকার (একজন) নবী।"

٣٩ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

৩৯ (জাকারিয়া) বলিল :— "হে আমার প্রভু ! আমার (আর) সন্তান হইবে কবে ?—অবস্থা এই যে, আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছি, আর আমার স্ত্রী হইতেছেন বন্ধ্যা !" আল্লাহ বলিলেন :— "এইরূপই হইবে, আল্লাই'ত যাহা ইচ্ছা (সম্পন্ন) করিয়া থাকেন।"

٤٠ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৪০ (জাকারিয়া) বলিল :— "হে আমার প্রভু ! আমার জন্য একটা নিদর্শন (স্থির) করিয়া দাও !" বলিলেন :—"তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবা (-রাত্রি), লোকদিগের সহিত ইঙ্গিত ব্যতীত (মুখে) কথা কহিবে না ;" এবং তুমি স্বীয় প্রভুকে বহুলভাবে স্মরণ কর আর সন্ধ্যায় ও সকালে (তাঁহার) মহিমা (কীর্ত্তন) করিতে থাক !

টীকা :—

২৫০ আল্লার প্রেম :—

এই আয়তগুলিতে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৩১ ও ৩২ আয়তে নজরান-ডেপুটেশনের খৃষ্টান-প্রধানদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে যীশুখৃষ্টের চরম উপদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। এহুদীদিগের হাতে গ্রেফতার হওয়ার অল্পক্ষণমাত্র পূর্ব্বে, তিনি ভীত ও শোকার্ত্ত শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।" আর এখানে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা কোর্‌আনের ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন—"তোমরা যদি আল্লাহকে প্রেম কর, তবে আমার অনুসরণ করিয়া চল।" দুই শিক্ষার মধ্যে কত প্রভেদ! প্রথমটা পয়গম্বরকে আল্লার আসনে বসাইয়া দিয়া শিক্ষা দিতেছে যে, প্রেম-সাধনার মূল সাধ্য এবং আজ্ঞাদানের মূল কর্ত্তা যেন যীশু নিজেই। আর হজরত কোর্‌আনের ভাষায় প্রচার করিতেছেন—মানবের প্রেম-সাধনার মূল সাধ্য এবং আজ্ঞাদানের প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন আল্লাহ। আমি এই পথে তোমাদের অগ্রগামী পথের সাথী মাত্র। তাঁরই দেওয়া আলোকে পথ দেখিয়া আমি আগে আগে চলিতেছি, তোমরা আমাকে অনুসরণ করিয়া সেই পরম প্রেমাস্পদের পানে অগ্রসর হও!

এই প্রসঙ্গে যীশু আরও বলিতেছেন—"আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব এবং তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিকর্ত্তা প্রদান করিবেন, যেন তিনি চিরকালের জন্য তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করেন।" "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি ...... যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সকল সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিলেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ...... ইত্যাদি।" হজরত ঈছার এই সব ভবিষ্যদ্বাণীতে খুবই স্পষ্ট করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকেই এই চরম শান্তিকর্ত্তা ও শেষনবী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। * খৃষ্টানদিগকে সম্বোধন করিয়া হজরত এখানে বলিতেছেন—সেই শান্তিকর্ত্তা আমি, সেই শেষনবী আমি এবং যীশুকে সকল অপবাদ ও অন্ধবিশ্বাস হইতে মুক্ত করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছি আমি। অতএব তোমরা যদি সত্যকার যীশু-প্রেমিক হও, তবে আমার অনুসরণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

কোর্‌আনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, এই আয়তগুলি খৃষ্টানদিগের সংশ্রবে প্রচারিত হইলেও, উহার শিক্ষা ও আদেশ সকলের জন্য সমানভাবে ব্যাপক। হজরতের সময় এহুদী ও খৃষ্টানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিত— نحن ابناء الله و احباؤه "আমরা আল্লার পুত্র ও তাঁহার বন্ধু।"

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছুরা صف -এর তফছিরে দ্রষ্টব্য।

এখানে বলা হইতেছে যে, এই সব মৌখিক দাবীর মূল্য কিছুই নাই। কর্ম্মে বা আমলে ইহার প্রমাণ থাকা চাই। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা এই কর্ম্মের নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই আদর্শের অনুসরণ করিলেই আল্লার প্রেম-সাধনার প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মানুষের শক্তি সামান্য ও সীমাবদ্ধ। সুতরাং নিজের সাধন-শক্তি মাত্রের দ্বারা প্রেমাস্পদ-আল্লাহকে 'প্রাপ্ত হওয়া' তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই সাধনা যখন নিখুঁৎ হয়, সাত্তিক হয়, আল্লাই তখন মানুষকে প্রেম করেন, এবং তাঁহারই প্রেমের আকর্ষণে সে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। কিন্তু যাহারা আল্লার আজ্ঞাগুলি পালন করে না এবং রছুলের অনুসরণ করে না, তাহারা অপাত্র। সুতরাং আল্লার প্রেম-লাভের অধিকার হইতে তাহারা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াই রাখে। এই জন্য তাহাদের মৌখিক দাবীগুলি কস্মিনকালেও সার্থকতালাভ করিতে পারে না। ৩১ আয়তে এই কথাটীই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৫১ **এম্‌রান :—**

এই আয়তে এম্‌রানের 'আল' বা স্বজনগণের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী (৩৪) আয়তে এম্‌রানের স্ত্রীর নজর মানার ও বিবি মর্‌য়মকে প্রসব করার কথা বলা হইয়াছে। এই দুই স্থানে বর্ণিত 'এম্‌রান' একই ব্যক্তি কি না, তফছিরের রাবীগণ ইহা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। তাঁহাদের একদল বলিতেছেন—দুই এম্‌রান দুইজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এই আয়তে উল্লিখিত এম্‌রান-অর্থে হজরত মূছার পিতা এম্‌রানকে বুঝাইতেছে। ৩৪ আয়তের এম্‌রান হইতেছেন হজরত ঈছার মাতামহ ও বিবি মর্‌য়মের পিতা—একজন স্বতন্ত্র এম্‌রান। কিন্তু আর-একদল রাবীর মতে উভয় আয়তে বর্ণিত এম্‌রান একই ব্যক্তি, অর্থাৎ উভয় স্থলেই বিবি মর্‌য়মের পিতা-এম্‌রানকে বুঝাইতেছে। শেষোক্ত দলের সমর্থকগণ বলেন—হজরত মূছার পিতার ও বিবি মর্‌য়মের পিতার মধ্যে কমবেশি ১৮ শত বৎসরের ব্যবধান। প্রথম আয়তে ১৮ শত বৎসর পূর্ব্বকার কথা বলা হইল এবং কএকটা শব্দের পরই পরবর্ত্তী আর এক এম্‌রানের কথা বলা হইল, অথচ এই দুই এম্‌রানের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিতও করা হইল না,—ইহা খুবই অসঙ্গত কল্পনা। এবনে-কছির প্রভৃতি তফছিরকারগণ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

খৃষ্টান-অনুবাদকগণের প্রায় সকলেই এই আয়তের ব্যাখ্যা করার সময় যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে প্রচার করিতেছেন যে, ইহা কোর্‌আনের একটা গুরুতর ঐতিহাসিক বিভ্রাট। কারণ, কোর্‌আন-রচয়িতা মর্‌য়মের পিতা ও মূছার পিতাকে একই লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জন্য অন্যত্র মর্‌য়মকে أخت هارون "হারূণের ভগ্নী" এবং ابنت عمران "এম্‌রানের কন্যা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে মর্‌য়মের মাতাকে "এম্‌রানের স্ত্রী" বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কোর্‌আন নিশ্চয়ই মূছা ও হারূণের জনককেই, যীশু-জননী মর্‌য়মের পিতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যকার

কেহ কেহ এ কথাও বলিয়াছেন যে, মূছা ও হারূণের এক ভগ্নীর নামও মর্‌য়ম ছিল (গণনা পুস্তক ২৬—৫৯ প্রভৃতি)। A confusion seems to have existed in the mind of Mohammed between Miriam 'the virgin Mary' and Miriam the sister of Moses. অর্থাৎ কোর্‌আন রচনার সময় 'যীশু-জননী মর্‌য়ম' ও মূছার ভগ্নী মর্‌য়ম সম্বন্ধে মোহাম্মদ গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। (পামার, ৫০ পৃষ্ঠা ১নং টীকা)। সেল সাহেব এখানে আসিয়া কোর্‌আনের এই Intolarable anachronismকে, তাহার ঐশিক বাণী হওয়ার দাবীর বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রমাণরূপে প্রয়োগ করিতে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া আমতা আমতা করিয়া সারিয়া দিয়া শেষে এই সংশয়টার গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

খৃষ্টানদিগের এই আক্রমণের উত্তরে মুছলমান-লেখকগণ বলিতেছেন—'ইহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। হজরত মূছার পিতার নাম যেমন এম্‌রান ছিল, যীশুর মাতামহের নামও সেইরূপ এম্‌রান ছিল। মূছা-জনক এম্‌রানের পুত্র-কন্যার ন্যায় যীশুর মাতামহ এম্‌রানেরও হারূণ নামে এক পুত্র এবং মর্‌য়ম নামে এক কন্যা ছিল। এরূপ সচরাচরই হইয়া থাকে। স্বজাতির ও স্বদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গের নাম অনুসারে নাম রাখার নিয়ম দুন্‌য়ার সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।' বস্তুতঃ এদিক দিয়া এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি অস্বীকার করার কোনই কারণ নাই। হজরত মূছার পিতার সমনাম বিশিষ্ট অন্য লোকের সন্ধান বাইবেলেই পাওয়া যাইতেছে। (Ezra ১০—৩৪)। নবম শতাব্দীতেও এহুদীদিগের মধ্যে এই নামের প্রচলন দেখা যায়। ঐ সময় এই নামের একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ও গোত্র-পতির আবির্ভাবও তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল (Bri.—Amram)। এক জাকারিয়া নামের দশজন লোকের সন্ধান শুধু বাইবেলের বর্ণনায় পাওয়া যায় (Biblica)। হজরত ঈছার সময় পর্য্যন্তও এহুদীদিগের মধ্যে মর্‌য়ম নামের যে বহুল প্রচলন ছিল, বাইবেল নূতন-নিয়মই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

মওলানা মোহাম্মদ আলী এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন—উভয় স্থলে এম্‌রান বলিতে হজরত মূছার পিতা-এম্‌রানকেই বুঝাইতেছে। ৩৪ আয়তে মর্‌য়মের মাতাকে যে إمرأة عمران বলা হইয়াছে, এখানে 'এম্‌রাআৎ' অর্থে 'স্ত্রী' নহে—স্ত্রীলোক। ঐ শব্দের অর্থ "নারী বা স্ত্রীলোক" এবং "ভার্য্যা বা স্ত্রী" উভয়ই হইতে পারে। আর এম্‌রান-অর্থে এম্‌রানীয় গোত্র। বাইবেলে এইরূপে 'এস্রাইল' ও 'কিদার' প্রভৃতি শব্দ এস্রাইল-গোত্রের ও এছমাইল-গোত্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। হাদিছেও এইরূপ ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। যেমন, হজরত বলিতেছেন—"আমার পিতা এবরাহিম।" হজরতের সহধর্ম্মিনী বিবি ছফিয়াকে তিনি বলিতে শিখাইয়া দেন— ان ابی هارون و عمی موسی و زوجی محمد "আমার পিতা হারূণ, পিতৃব্য মূছা ও স্বামী মোহাম্মদ।" ফলতঃ এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর

করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, শেষোক্ত আয়তে إمرأة عمران অর্থে—এম্‌রান-গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোক—'এম্‌রানের স্ত্রী' নহে।

মওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেবের এ যুক্তিবাদের সমর্থনও আমরা করিতে পারিতেছি না। ইম্‌রাআৎ (إمرأة) শব্দ স্ত্রী ও স্ত্রীলোক—এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কোর্‌আনেও এই ব্যবহারের অনেক নজির আছে, ইহা সত্য। কিন্তু, এই শব্দটীকে যখন কোন ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের প্রতি اضافه করা হয়, তখন উহার একমাত্র অর্থ হয় ভার্য্যা ও স্ত্রী। 'স্ত্রীলোক' অর্থ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে কোর্‌আনের সর্ব্বত্রই إمرأة শব্দ 'স্ত্রী'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—(১) إمرأة العزيـــز (২) إمرأة فرعـــون (৩) إمرأة نـــوح (৪) إمرأة لوط (৫) و امرأته حمالة الحطب (৬) الذى اشتريه من مصر لامرأته (৭) و امرأتى عاقر ইত্যাদি। এখানেও إمرأة عمران বলা হইয়াছে, সুতরাং উহার অর্থ "এম্‌রানের স্ত্রী" হওয়া সুনিশ্চিত। হাদিছের যে সব নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। রূপকভাবে কন্যাকে বা কন্যা-শ্রেণীর লোকদিগকে 'মা' বলা, অথবা খালা-ফুফু শ্রেণীর লোকদিগকে 'মা' বলা যাইতে পারে। পুত্র বা পুত্র-শ্রেণীর লোকদিগকে 'বাবা' বলাও যাইতে পারে। কিন্তু, এই ভাবে কেহ কাহাকে স্বামী বা স্ত্রী কখনই বলিতে পারে না। উদ্ধৃত হাদিছটীর কথাই ধরা যাউক। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা এছমাইল-বংশ হইতে উদ্ভূত, এই হিসাবে বিবি ছফিয়া زوجى إسمعيل 'আমার স্বামী এছমাইল' কখনই বলিতে পারেন না। ফলতঃ এখানে إمرأة অর্থে 'স্ত্রীলোক' গ্রহণ করা আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

আমার মতে, দুইটী স্বতন্ত্র ব্যবহারকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে গিয়াই এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। মর্‌য়ম-জননীর স্বামীর নাম যে এম্‌রান, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, যেখানে এহুদীদিগের প্রমুখাৎ বিবি মর্‌য়মকে أخت هارون বা হারূণের ভগ্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ হইবে—হারূণীয় বা Aaronite গোত্রের কন্যা বা ভগ্নী। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোর্‌আনের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। সকলেই জানেন, হারূণ হইতেছেন হজরত মূছার ভ্রাতা। ইস্রাইলীও ইতিবৃত্তে মূছা হইতেছেন সকল হিসাবে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, স্বপরিবারের মধ্যেও তিনিই সর্ব্বতঃভাবে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মর্‌য়মকে বস্তুতঃ হারূণ ও মূছার ভগ্নী বলিয়া ধরা হইয়া থাকিলে, তাঁহাকে হারূণের ভগ্নী না বলিয়া 'মূছার ভগ্নী' বলিয়াই উল্লেখ করা হইত।

যীশু-জননী বিবি মর্‌য়মকে হারূণের ভগ্নী বলার আর একটী রহস্য আছে। ছুরা মর্‌য়ম পাঠ করিলে জানা যাইবে, যীশুর জন্মের জন্য মর্‌য়মকে ভৎসনা করার সময় তাঁহার স্বগোত্রের লোকেরা বলিয়াছিল—

يا أخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء و ما كانت أمك بغيا

শাব্দিক অনুবাদ :—"হে হারূণের ভগ্নি! তোমার পিতা'ত মন্দ লোক ছিলেন না আর তোমার

মাতাও ভ্রষ্টা ছিলেন না (২৮ আয়ত)।" যীশুর জন্মের সময় এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে হারূণ শব্দ, এহুদীদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই, হজরত হারূণকে না বুঝাইয়া একটা Collective term হিসাবে ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমভাগে এবরানীভাষায় যে তাওরাত প্রচলিত ছিল, তাহাতে (১ বংশাবলি, ২৭—১৭ পদে) "হারূণ"-শব্দ "হারূণীয় গোত্র বা হারূণের কুল" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাইবেলের ইংরাজী Authorised verssion-এ, এই হারূণ বা Aaron শব্দকে Aaronites বা হারূণ-বংশীয়গণ বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে (Biblica, Aaron, Note 1, দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলে দেখা যাইতেছে—

There was, in the days of Herod the King of Judia, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia ; and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth. (Luke 1—5).

লুকের এই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, জাকরিয়া নামক যাজকের স্ত্রীর নাম ছিল ইলীশাবেৎ এবং এই ইলীশাবেৎ ছিলেন হারূণের কন্যাদিগের মধ্যকার একজন। লুকের এই (প্রথম) অধ্যায়ের ৩৬ পদে এই ইলীশাবেৎকে মরয়মের "জ্ঞাতি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং মরয়মও যে হারূণ-বংশীয়া, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। উদ্ধৃত পদ হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, বাইবেলের নূতন নিয়মেও "হারূণ"কে, "হারূণ-বংশের" প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সেই জন্যই এখানে জাকারিয়ার স্ত্রী ইলীশাবেৎকে "Of the daughters of Aaron, من بنات هارون বা হারূণের কন্যাদিগের একজন" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং এই জন্য আজকালকার বাঙ্গলা বাইবেলে এই পদাংশের অনুবাদ করা হইয়াছে, "হারোণ বংশীয়া" বলিয়া। সকলেই জানেন, হজরত ঈছার মাতা বিবি মরয়ম ও হজরত য়াহ্য়ার মাতা এলিসাবেৎ একই সময়ের লোক—হজরত ঈছা হজরত য়াহ্য়ার মাত্র ছয় মাসের বড় (লুক ১—৩৬)। সুতরাং হারূণের সহিত উভয় মরয়ম ও এলিসাবেতের কালব্যবধান একেবারেই অভিন্ন। এখানে খৃষ্টান-লেখকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই এলিসাবেৎকে "হারূণের কন্যা" বলিয়া বর্ণনা করাতে কোন গুরুতর বিভ্রাট ও anachronism ঘটিয়াছে কি ? যদি না ঘটিয়া থাকে, তবে মরয়মকে "হারূণের ভগ্নী" বলাতেও কোন বিভ্রাট নিশ্চয় ঘটে নাই। বাইবেলের সাক্ষ্য হইতেই জানা যাইতেছে যে, হারূণ-শব্দকে এরূপস্থলে হারূণ-বংশ অর্থে গ্রহণ করাই তখনকার প্রচলিত সাধারণ পরিভাষা ছিল। এই পরিভাষা অনুসারে বিবি মরয়মকে হারূণের ভগ্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যীশু-জননীকে ভৎর্সনা করার সময়, তাঁহার গোত্র-গৌরবের উল্লেখ করিয়া, এই ভৎর্সনাকে তীব্রতর করার জন্য হারূণের নাম উল্লেখ করাই এহুদীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ছুরা মরয়মের উপরোক্ত আয়তটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে যে, মরয়মের পিতামাতা এহুদীদিগের বিশেষ বিদিত ও তাহাদিগের মধ্যকার একজন ছিলেন, এবং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র তাহারা বিশেষভাবে অবগত ছিল। তাই তাহারা বলিতেছে—

"তোমার পিতা'ত অসৎলোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ভ্রষ্টা ছিলেন না।" এই উক্তি দ্বারাও অকাট্যভাবে জানা যাইতেছে যে, কোর্‌আনে বিবি মর্‌য়মকে হারূণের পিতার ঔরষজাত কন্যা বলিয়া কখনই নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। বরং মর্‌য়মের পিতামাতা যে, ভৎর্সনাকারী-এহুদ-প্রধানদের অনেকের সমসাময়িক ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন—আলোচ্য আয়তটাই এ দাবীর অকাট্য প্রমাণ।

এখানে আর একটী প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতে পারিতেছি না। পাঠক দেখিতেছেন, খৃষ্টান-লেখকগণ সকলেই ধরিয়া লইতেছেন যে, হজরত মূছা ও হারূণের পিতার নাম "এম্‌রান" ছিল, ইহা যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অধিকন্তু, কোর্‌আনে ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার উক্তিতেও যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন হইতেছে এবং মুছলমানগণ যে ধর্ম্মের হিসাবে এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য, ইহাও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাহার পর, এই সিদ্ধান্ত ও কল্পনাকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা এই অন্যায় বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা একটা অপসিদ্ধান্ত ও অসত্য কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাইবেলে হজরত মূছার পিতার নাম দেওয়া হইয়াছে— عمرم, Amram বা অম্রম বলিয়া (দেখ, যাত্রা পুস্তক ৬ অঃ ১৮—২০ পদ, গণনা ৩—১৯ পদ, ১ বংশাবলি ৬—৩ পদ)। কোর্‌আনে মর্‌য়মের পিতার নাম করা হইয়াছে 'এম্‌রান' বলিয়া। আম্রম ও এম্‌রান এক শব্দ কখনই নহে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য খৃষ্টান-লেখকগণ যে সব কলমের কারচুপি করিয়াছেন, তাহা অতিশয় শোচনীয়। সেল সাহেব অনুবাদের সময় "Imran" ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্তু টীকা করিতেছেন "Or Amran" যোগ করিয়া দিয়া। পামার সাহেব আরও অগ্রসর হইয়া কোর্‌আনের এম্‌রানকে একেবারে "Amram" বা আম্রমে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

হজরত মূছার পিতার নাম কি ছিল, কোর্‌আনে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। বাইবেলের বর্ণনা মতে তাঁহার নাম ছিল অ'ম্রম। আর কোর্‌আনের বর্ণনা মতে বিবি মর্‌য়মের পিতার নাম এম্‌রান। *বাইবেলের সাক্ষ্যকে নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, অম্রম ও এম্‌রানকে এক করিয়া লওয়া সঙ্গত হইতে পারে না!* অধিকন্তু বাইবেলের এই বর্ণনাই যে ঠিক, তাহা স্বীকার করিতে মুছলমানগণ কোন মতেই বাধ্য নহেন। এই হজরত মূছার বিবরণেও, বাইবেলে এমন অনেক কথাই বর্ণিত হইয়াছে, যুক্তির হিসাবে যাহাকে কোন মতে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

খৃষ্টানদিগের দ্বারা প্রচারিত তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মূছার পিতা "অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ করিলেন এবং ইনি তাঁহার জন্য হারূণকে ও মোশি (মূছা)-কে প্রসব করিলেন" (যাত্রাপুস্তক ৬—২০)। কিন্তু "According to the Septuagint and the Jewish traditions, Jochebed was *cousin*, not *aunt* to Amram"

অর্থাৎ এহুদীদিগের তাওরাতে ও তাহাদের রেওয়ায়তগুলিতে যোকেবদকে অম্রমের জ্ঞাতি-ভগ্নী (পিসী নহে) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (Scott কৃত বাইবেলের টীকা)।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কোর্‌আনের কুত্রাপি হজরত মূছার পিতার নামের উল্লেখ নাই। আমরা যতদূর জানি, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার কোন বিশ্বাস্য হাদিছেও হজরত মূছাকে ابن عمران বা 'এম্‌রানের পুত্র' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য, মেশ্‌কাতের একটী রেওয়ায়তে দেখা যায় :—আবু-হোরায়রা বলিতেছেন, হজরত রছুলে করিম বলিয়াছেন,— جاء ملك الموت الى موسى بن عمران الخ "মালেকুল-মওৎ মূছা-এবনে-এম্‌রানের জান কবজ করিতে আসিলে, তিনি ফেরেশ্‌তার গালে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারেন যে, তাহাতে তাঁহার (মালেকুল-মওৎ ফেরেশ্‌তার) চোখের ঢেলা গলিয়া যায়—ইত্যাদি। মেশ্‌কাৎ-সঙ্কলক বোখারী ও মোছলেমের বরাৎ দিয়া এই "হাদিছটী" উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা বোখারী ও মোছলেম তন্ন তন্ন করিয়া এই হাদিছের বিভিন্ন রেওয়ায়তের কোথায়ও ابن عمران বা "এম্‌রানের পুত্র" এই অংশ খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রত্যেক রেওয়ায়তেই শুধু موسى عليه السلام আছে। সম্ভবতঃ মেশ্‌কাতের পরবর্ত্তী কোন লিপিকার সংস্কারের প্রভাবে অসাধবান হইয়া এই অংশটী হাদিছের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আবু-হোরায়রার (রাঃ) বর্ণিত এই শ্রেণীর হাদিছগুলি সম্বন্ধে আদৌ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ২৫২ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫২ মরয়ম-জননীর প্রার্থনা :—

এম্‌রানের স্ত্রী গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লার নামে নজর মানিয়াছিলেন। এই সন্তান সংসার হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-মন্দিরের সেবা করিবে, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তাঁহার আশা ছিল পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্তু, আশার বিপরীত যখন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল, তখন তিনি যেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কারণ, কন্যাকে আজীবন মুক্ত রাখিয়া মন্দিরের সেবায় সমর্পণ করার অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। নারীকে এহুদীরা অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর শুচি-অশুচি লইয়াও অনেক আপত্তির কারণ ছিল। তাই মরয়ম-জননী বিমর্ষ ও ব্যাকুলভাবে বলিতেছেন—প্রভুহে! আমার'ত কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। পুত্র হইলে তাহাকে সব কাজে লাগাইতে পারা যাইত, কিন্তু এই কন্যাকে দিয়া'ত সে সমস্ত সুসম্ভবপর হইবে না। কারণ, পুরুষ'ত নারীর সমান নহে, অর্থাৎ পুরুষ'ত নারীর ন্যায় নানাবিধ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় বাধা বিঘ্নের অধীন নহে। কিন্তু, নজর যখন মানা হইয়াছে, তখন এই কন্যাকে তাহার যোগ্যরূপে সেবার কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে। অতএব, হে করুণানিধান প্রভু! এই কন্যাকেই তুমি গ্রহণ কর, এবং তাহাকে ও তাহার সন্ততি-বর্গকে অভিশপ্ত শয়তানের প্রভাব হইতে রক্ষা কর!

বিবি মর্‌য়ম কৌমার-জীবন যাপন করিবেন, এরূপ কোন ধারণাই যে তাঁহার মাতার মনে স্থান পায় নাই, আয়তের শেষাংশ হইতে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। অন্যথায়, প্রার্থনায় "তাহার সন্ততিবর্গকে" বলা তাঁহার পক্ষে কখনই সঙ্গত হইত না। বরং পক্ষান্তরে এই অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপভাবে বিবাহ করে এবং স্বভাবের যে নিয়মে তাহারা সন্তানের জননী হয়, বিবি মর্‌য়মও যে সেই ভাবে বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইবেন, এরূপ বিশ্বাসই তাঁহার মাতা পোষণ করিতেছিলেন। বিবি মর্‌য়ম যে-ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাহাতে চিরকুমারী থাকার ব্যবস্থা যে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ছিল না, আয়তের এই অংশ হইতে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

"আর সে কি প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তাহা সমধিক পরিজ্ঞাত" — এই অংশটী parenthical বা অনন্বিতভাবে আল্লার উক্তি। অর্থাৎ সে যে কন্যা প্রসব করিয়াছে, এ কথা উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল না, আল্লাহ'ত তাহা সকলের অপেক্ষা উত্তমরূপে — কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব হইতে — অবগত আছেন।

শয়তানের স্পর্শ বা খোঁচা :—

বিবি মর্‌য়মের মাতার এই প্রার্থনা-প্রসঙ্গে হাদিছ ও তফছিরের কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আদম-বংশে যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্পর্শ করে বা খোঁচা মারে। ইহারই ফলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু, মর্‌য়ম-জননীর এই প্রার্থনার ফলে আল্লাহ মর্‌য়মকে ও তাঁহার পুত্র ঈছাকে ইহা হইতে রক্ষা করেন, তাই শয়তানের কোন অধিকার তাঁহাদের উপর চলিতে পারে নাই। শয়তান যে চেষ্টার ক্রটী করিয়াছিল, তাহা নহে। বরং খোঁচা মারার জন্য সে ইঁহাদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু, মর্‌য়ম-জননীর এই দোওয়ার বরকতে আল্লাহ একটা পর্দ্দা সৃষ্টি করিয়া দিলেন, শয়তান সেই পর্দ্দায় খোঁচা মারিয়া ফিরিয়া গেল। বোখারী, মোছলেম, এবনে-জরির, এবনে-কছির প্রভৃতি কেতাবের এই রেওয়ায়তগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে যে :—

(১) মর্‌য়ম-জননী দোওয়া করিয়াছিলেন—মর্‌য়ম ও তাঁহার সন্ততিবর্গ যেন শয়তানের প্রভাব হইতে রক্ষা পায়, আল্লাহ যেন তাহাদিগকে শরণ (পানাহ) দান করেন। এই দোওয়ার বরকতেই বিবি মর্‌য়ম ও তাঁহার পুত্র হজরত ঈছা, শয়তানের খোঁচা ও স্পর্শ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

(২) একমাত্র হজরত ঈছা ও বিবি মর্‌য়ম ব্যতীত, আদম-বংশের অন্য সমস্ত শিশুকে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শয়তানের হাতে খোঁচা খাইতে হইয়া থাকে।

(৩) শয়তান খোঁচা মারে বলিয়াই শিশুরা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র কাঁদিয়া উঠে।

(৪) এই খোঁচা মারার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسلط

অর্থাৎ, শয়তানের এই যে খোঁচা, ইহাই হইতেছে মানবের উপর তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত (ফৎহুলবারী ৬—৩০০)।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই হাদিছটী বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইলে আমরা ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে—জনসাধারণ'ত দূরের কথা, দুনয়ার সমস্ত নবী ও রছুলকে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র শয়তানের হাতে উৎপীড়িত হইতে এবং তাহার অধিকার ও প্রভাবের অধীনে আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং হজরত ঈছা অন্য সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদ্বারা অন্য সমস্ত নবী-রছুলের গুরুত্ব ও মর্য্যাদার যথেষ্ট লাঘব হইতেছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাও বাদ যাইতেছেন না। এই হাদিছের বিবরণ যথার্থই হজরতের উক্তি হইলে, তাহা হইতে নিঃসন্দেহ-রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকেও (তাঁহার নিজেরই স্বীকারোক্তি মতে) শয়তানের খোঁচা খাইতে এবং তাহার প্রভাব ও অধিকারের অধীনে আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং তুলনায় যীশুর মর্য্যাদা বহুগুণে বাড়িয়া এবং হজরতের মর্য্যাদা বহুগুণে কমিয়া যাইতেছে। শুধু ইহাই নহে। এই হাদিছটীকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যীশু-জননী বিবি মরয়মও সমস্ত নবী-রছুলের, এমন কি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ তফছির লেখক ও হাদিছের টীকাকারগণ এই সমস্যার জন্য বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মতে ইহাই এখানকার একমাত্র সমস্যা নহে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, খৃষ্টানরা যীশুর দুইটী স্বরূপ বা Aspect কল্পনা করিয়া থাকেন। একটী Human বা মানবীয়, এবং অন্যটী Divine বা স্বর্গীয়। এই Divine aspect বা স্বর্গীয় স্বরূপের দিক দিয়াই তাঁহারা যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন। যীশুর এই ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রচলিত বাইবেলগুলিতে যীশুকে কতকগুলি অতিমানবীয় শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যীশুর এই তথাকথিত অতিমানবীয় গুণ ও শক্তির কঠোর প্রতিবাদ করাই কোরআনের এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রেওয়ায়ত-পূজার শোচনীয় মোহান্ধতার ফলে মুছলমানরাই আজ কোরআনের ও হাদিছের দোহাই দিয়া যীশুর সেই ঐশিক গুণ ও শক্তির জয়নিনাদ করিতেছে, কার্য্যতঃ তাঁহাকে একটা অতিমানবীয় সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে—স্বীকার করাকেই তাওহীদের প্রধান উপকরণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে! উপরের বর্ণিত হাদিছটী এই অধঃপতনের একটা নিদর্শন। কারণ, তাহার মর্ম্মানুসারে, দুনয়ার প্রত্যেক মানব-শিশুকেই শয়তানের খোঁচা খাইতে ও তাহার প্রভাবের অধীন হইতে হয়, কিন্তু মেরি ও তাঁহার তনয় যীশু ইহা হইতে বর্জ্জিত। সুতরাং তাঁহারা যে অতিমানব, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ইহাতে খৃষ্টানদের শেরকী কল্পনার সমর্থনই হইতেছে।

এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, যেহেতু রেওয়ায়তটী বোখারী, মোছলেম প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা প্রামাণ্য হাদিছ, অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে হজরতের উক্তি। তাই এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা প্রকার অন্যায় ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা

হইয়াছে। মুফ্‌তি আবদুহু বলিতেছেন—"হাদিছটী ছহি হইলে, উহাকে রূপক বলিয়াই ধরিতে হইবে" (৩—২৯০)। এমাম নববী মোছলেমের টীকায় বলিতেছেন—"হাদিছ হইতে প্রত্যক্ষতঃ ঈছা ও তাঁহার মাতার বৈশিষ্ট্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কাজী আয়াজ বলেন যে, অন্য সমস্ত নবী সম্বন্ধেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য" (২—২৬৫)। কাজী আবদুল জব্বার বলিয়াছেন, এই হাদিছটী خبر واحد খবরে ওয়াহেদ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ উভয়ই। সুতরাং فرجب رد উহাকে অস্বীকার করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—(১) শয়তান প্রভাব বিস্তার করে মন্দের দিকে প্ররোচিত করার জন্য। এই প্ররোচনা সার্থক হইতে পারে কেবল তাহাদের সম্বন্ধে—সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ও অনুভূতি যাহাদের আছে। সুতরাং সদ্যজাত শিশুর উপর প্রভাব বিস্তারের সার্থকতা কিছুই নাই। (২) মানব-দেহের উপর অত্যাচার করার শক্তি যদি শয়তানের থাকিত, তাহা হইলে সে কেবল শিশুকে খোঁচা মারিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া আরও অনেক অঘটন ঘটাইতে পারিত—সৎলোকদের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিত, তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। (৩) এই হাদিছে কেবল ঈছা ও তাঁহার মাতার কথা বলা হইয়াছে, অন্য সমস্ত নবীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহার কোনই হেতু নাই—ইত্যাদি (কবির)। এমাম রাজী এই সব যুক্তি উদ্ধার করার পর, তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া শুধু বলিতেছেন—"এ সব যুক্তির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ যুক্তির দ্বারা হাদিছকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।" আল্লামা জমখ্‌শরীও যুক্তির হিসাবে ইহাকে রূপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি কোর্‌আনের আয়ত হইতে দেখাইয়াছেন যে, আল্লার সৎ-বান্দাদের উপর শয়তানের কোন অধিকারই নাই। এমাম আবুহাইয়ান সেগুলি উদ্ধৃত করার পর, ইহাকে "মো'তাজেলাদের যুক্তিধারা" বলিয়াই সব ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিয়াছেন।

আমরা যতদূর বিচার করিয়া দেখিয়াছি, এই রেওয়ায়তটীর কোন সঙ্গত তাৎপর্য্য বা সার্থকতা নাই। সুতরাং উহাকে হজরত রছুলে করিমের উক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এই মতের কএকটা কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) এই রেওয়ায়ত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, মর্য়্যম-জননীর দোওয়ার বরকতেই আল্লাহ তাআলা মর্য়্যমকে (এবং পরে তৎপুত্র যীশুকে) শয়তানের স্পর্শ বা খোঁচা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই রক্ষা-কার্য্যটী নিশ্চয় দোওয়ার পরেই সমাধিত হইয়া-ছিল। কিন্তু, আয়ত হইতে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যাইতেছে যে, বিবি মর্য়্যম পয়দা হওয়ার এবং তাঁহার নামকরণ হইয়া যওয়ার পর, তাঁহার মাতা ঐ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মর্য়্যমের জন্ম ও তাঁহার নামকরণ প্রার্থনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিয়া ঐ দুইটী ঘটনা সম্বন্ধে فعل ماضى অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—"আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি", "আমি উহার নাম মর্য়্যম রাখিয়াছি।" কিন্তু এই দুইটী অতীত ঘটনা উল্লেখ করার পর, প্রার্থনা করার সময় তিনি বরাবরই فعل مضارع ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। যথা—"আমি তাহাকে……

তোমার শরণে সমর্পণ করিতেছি।" সুতরাং মর্য়মের জন্ম যে তাঁহার মাতার প্রার্থনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব, এই দোওয়ার বরকতে মর্য়ম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহা কোর্‌আনের ও স্পষ্টযুক্তির বিপরীত উদ্ভট কল্পনা মাত্র। এইরূপ কল্পনা হজরতের উক্তিতে কখনই স্থানলাভ করিতে পারে না। সুতরাং উহা 'হাদিছ' কখনই নহে।

(২) এই রেওয়ায়তটীর দ্বারা অন্য সমস্ত নবীদিগের মর্য্যাদা লাঘব করা হইয়াছে এবং যীশু ও তাঁহার মাতার অতিমানবীয় স্বরূপ স্বীকার করা হইতেছে। ইহা এছলামের মৌলিক নীতির বিপরীত কথা। সুতরাং উহা হজরতের হাদিছ কখনই হইতে পারে না।

(৩) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতিতে এই হাদিছ সম্বন্ধে যে সব রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে ভাষাগত সামঞ্জস্যের খুবই অভাব। এমন কি, বোখারীর এক রেওয়ায়তে শুধু হজরত ঈছার কথা বলা হইয়াছে, মর্য়মের নামও তাহাতে নাই। এই রেওয়ায়ত অনুসারে জানা যাইতেছে যে, বিবি মর্য়মও শয়তানের খোঁচা, স্পর্শ বা প্রভাব হইতে রক্ষা পান নাই। অথচ তাঁহার মাতা দোওয়া করিয়াছিলেন প্রত্যক্ষতঃ তাঁহারই জন্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মর্য়ম জননীর প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন নাই। ইহা অসঙ্গত কথা।

(৪) এই রেওয়ায়ত অনুসারে জানা যাইতেছে যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রত্যেক শিশুকেই শয়তানে খোঁচা মারে এবং এই খোঁচার জন্যই তাহারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন করে, আর যদি কেহ ক্রন্দন না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শয়তানের খোঁচা নিশ্চয়ই তাহার গায়ে লাগে নাই। এখন, পাঠকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অথবা একটু সন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, অধিকাংশ শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন করিলেও, বহু শিশু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করে না, এরূপও অনেক সময় দেখিতে পওয়া যায়। অতএব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে যীশু ও তাঁহার জননীর বিশেষত্ব কিছুই নাই। অথচ এই বিশেষত্ব প্রতিপাদন করার জন্যই রেওয়ায়তটীর অবতারণা।

(৫) এম্‌রানের স্ত্রী প্রার্থনা করিয়াছিলেন মর্য়মের এবং তাঁহার ذرية বা বংশধরদিগের সকলের জন্য সাধারণভাবে। এই দোওয়ার বরকতে মর্য়মের একপুত্র (যীশু) শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকিলে, তাঁহার অন্য পুত্র কন্যাদের সকলেরই শয়তানের খোঁচা হইতে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার কথা। তাহা হইলে যীশু ও মর্য়মের আর কোনই বিশেষত্ব থাকে না। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন তফছিরকার বলিয়াছেন যে, এক যীশু ব্যতীত মর্য়মের অন্য কোন সন্তান হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বাইবেলে যীশু-ভ্রাতাদিগের কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে (মার্ক ৩ অঃ ৩১—৩৩, মথি ১২ অঃ ৪৬—৪৮ পদ)। মথি ১৩শ অধ্যায়ের ৫৪—৫৭ পদে যীশুর চারি ভ্রাতার নাম ও তাঁহার ভগ্নীদিগের

উল্লেখ আছে। এখন, এম্‌রানের স্ত্রীর দোওয়ার বরকতে যীশু ও মরয়মের ন্যায় মরয়মের অন্য পুত্রকন্যাদেরও শয়তানের খোঁচা হইতে সমানভাবে সুরক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং এই রেওয়ায়তের "যীশু ও তস্যমাতা ব্যতীত"-এই কথাটার কোনই সার্থকতা থাকিতেছে না।

(৬) এ সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহা হইতেছে আবুহোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছ। হাদিছের কেতাবগুলি খুলিলে, বিশেষতঃ তাহার সৃষ্টিতত্ত্ব, পুরা-কাহিনী, পরলোক সংক্রান্ত বিবরণ, ভবিষ্যতের ঘটনা ইত্যাদি সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি দেখিলে জানা যাইবে —আবুহোরায়রা এ সব সম্বন্ধে অজস্র হাদিছ বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। হাদিছ সংক্রান্ত যেখানে যে সমস্যা উপস্থিত হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে যানা যাইবে, তাহার অধিংকাশই আবুহোরায়রার রেওয়ায়ত হইতে উদ্ভূত। ইহার তুলনায় অন্যান্য ছাহাবিগণের রেওয়ায়ত খুবই কম। অথচ আবুহোরায়রা এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন খায়বর-বিজয়ের পর—অর্থাৎ কমবেশি তিন বৎসর মাত্র তিনি হজরতের সাহচার্য্যলাভ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোক গমনের পর আবুহোরায়রা যখন এইরূপে অজস্র হাদিছ বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন হজরত ওমর কঠোর ভাবে তাঁহাকে নিষেধ করেন। হজরত আলি ও বিবি আয়েশা তাঁহার অনেক রেওয়ায়তের কঠোর প্রতিবাদ করিতেন। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হজরত আবুহোরায়রার নাম-করণে প্রচারিত অনেক হাদিছে সতর্কতার যথেষ্ট অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা ইহার দুইএকটা নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(ক) মোছলেমের একটা রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, "আবুহোরায়রা বলিতেছেন, হজরত রছুলে করিম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—আল্লাহ শনিবারে মাটি পয়দা করিলেন, রবিবারে তাহার উপর পাহাড়গুলি সৃষ্টি করিলেন, সোমবারে বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন, মঙ্গলবারে অসৎ বা মকরূহকে সৃষ্টি করিলেন, বুধবারে আলোক সৃষ্টি করিলেন, বৃহস্পতিবারে জীবজন্তু সৃষ্টি করিলেন এবং শুক্রবারের বৈকালে আদমকে সৃষ্টি করিলেন।" এই হাদিছটী রেওয়ায়ত পরম্পরার হিসাবে বাহ্যতঃ নির্দ্দোষ এবং এই হিসাবে ইহার বিবরণটী হজরতের উক্তি বলিয়াই ধর্ত্তব্য। কিন্তু তত্রাচ—

قد تكلم عليه على بن المدينى و البخارى و غير واحد من الحفاظ و جعلوه من كلام كعب ، و ان ابى هريرة انما سمعه من كلام كعب الاحبار و انما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا - (ابن كثير - طبع جديد ج ١ ص ١٢٥)

এমাম বোখারী ও তাঁহার গুরু আলী-এবনে-মদিনী প্রভৃতি বহু হাদিছ বিশারদ পণ্ডিত এই এই হাদিছের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাকে পাদ্রী কা'বের* উক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, আবুহোরায়রা এই বিবরণটী কা'বের মুখ হইতেই শ্রবণ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কোন রাবী গোলমালে পড়িয়া উহাকে হজরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা

* ইনি হজরত ওমরের সময় এছলাম গ্রহণ করেন। —একমাল।

করিয়াছেন (এবনে কছির)। এমাম বায়হাকিও كتاب الاسماء و الصفات নামক পুস্তকে এই রেওয়ায়তের দোষ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যরা বলিয়াছেন, এই রেওয়ায়তটী কোর্‌আনের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত। কারণ, ইহাতে দেখা যায় যে, সপ্তাহের সাত দিনেই সৃষ্টি হইয়াছিল, অথচ কোর্‌আনে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি হইয়াছিল في ستة ايام বা "ছয় দিনে"। * সে যাহা হউক, ছহি মোছলেমের ন্যায় কেতাবে এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাতে তাবেয়ী কা'ব আহবারের উক্তিটী হজরতের উক্তি বলিয়া স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) রোজার সময় মানুষ যদি অশুচি অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে, তাহার পর স্নান করার পূর্ব্বে যদি প্রভাত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সেদিনকার রোজা আর হইবে না— আবুহোরায়রা ইহাকে হজরতের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করেন। এই রেওয়ায়তের কথা শুনিয়া আমির মার্‌ওয়ান, বিবি আয়েশা ও বিবি হাফ্‌ছার নিকট লোক পাঠাইয়া এই উক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তাঁহারা উভয়ই উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, হজরত উহার বিপরীত ব্যবহার করিতেন। মার্‌ওয়ান তখন লোক পাঠাইয়া আবুহোরায়রার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। আবুহোরায়রা তখন বলেন যে, ঐ বিবরণটী তিনি ফজল-এবনে-আব্বাছের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। অথচ তাহার পূর্ব্বেই ফজলের মৃত্যু হইয়াছে।

(গ) আবুহোরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন, নামাজ পড়ার সময়, স্ত্রীলোক সম্মুখে থাকিলে বা আসিলে নামাজ নষ্ট হইয়া যায় (মোছলেম)। হজরত আয়েশা আবু-হোরায়রার এই রেওয়ায়তের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—হজরত রাত্রে নামাজ পড়িতেন, আর আমি তাঁহার সম্মুখে শুইয়া থাকিতাম (বোখারী, মোছলেম)

(ঘ) আবুহোরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম তিন সময় মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন। এই হাদিছে আরও দেখা যায়, হজরত এবরাহিম তাঁহার স্ত্রী বিবি ছারাকে বলিতেছেন—সমগ্র পৃথিবীতে আমি ও তুমি ব্যতীত আর একজনও মোমেন বিদ্যমান নাই। অথচ সে সময় হজরত লূৎ নবী বিদ্যমান, অন্য মোমেনদিগের কথা নাই বলিলাম।

(ঙ) আবুহোরায়রা বলিতেছেন,—

ان النبي صلعم قال كل ابن آدم يلقي الله بذنب يعذبه عليه ان شاء او يرحمه الا يحيى بن زكريا -

"হজরত বলিয়াছেন, জাকারিয়ার পুত্র য়াহ্‌য়া ব্যতীত আর যে সব ব্যক্তি আদম-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকই পাপী অবস্থায় আল্লার নিকটে উপস্থিত হইবে। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সেই পাপের জন্য তাহাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাহার প্রতি দয়া করিবেন (এবনে-কছির ২—২২৩)।" এই রেওয়ায়ত সত্য হইলে এক হজরত য়াহ্‌য়া ব্যতীত মাছুম বা নিষ্পাপ আর

* আমার মতে—ছয় ঋতুতে বা ছয় মওছমে।

কেহই নহে। আল্লার আর কোন নবী ও রছুল মাছুম নহেন, "পাপী" অবস্থায় তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন আল্লার হুজুরে উপস্থিত হইতে হইবে। এখানে কিন্তু হজরত ঈছাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই।

(চ) আবুহোরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন— لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة অর্থাৎ তিনজন ব্যতীত আর কেহই মাতৃক্রোড়ে কথোপকথন করেন নাই (বোখারী ১—৪৮৯)। কিন্তু মোছলেম, আহমদ, হাকেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে আরও কতিপয় শিশুর ঐ অবস্থায় কথা বলার সংবাদ পাওয়া যায়, এবং সেগুলিও "হজরতের উক্তি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। টীকাকারগণ হাদিছ হইতে ঐরূপ দশজন শিশুর মাতৃক্রোড়ে কথা বলার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আবুহোরায়রার এই রেওয়ায়তটী হজরতের উক্তি বলিয়া কখনই গৃহীত হইতে পারে না।

(ছ) হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ওছমান ও বিবি আয়েশা প্রমুখ হজরতের মহামান্য ছাহাবাগণ, অনেক সময় হজরত আবুহোরায়রার রেওয়ায়তকে প্রকাশ্যভাবে অবিশ্বাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ তুলিয়া কোন একজন পণ্ডিত আবুহোরায়রার উপর আক্রমণ করিলে, এমাম এবনে-কোতায়বা (ابن قتيبة) তাঁহার পক্ষ হইতে ছাফাই বা কৈফিয়ত দিতে গিয়া বলিতেছেন :—

و اما طعنه على ابى هريرة بتكذيب عمر و عثمان و على و عايشة له ، فان ابا هريرة صحب رسول الله صلعم نحواً من ثلاث سنين و اكثر الرواية عنه ، و عمر بعده نحواً من خمسين سنة ، و كانت وفاته سنة تسع و خمسين ... و توفيت عايشة رض قبلها بسنة ۔ فلما اتى من الرواية عنه ما لم يأت بمثله من صحبه من جلة اصحابه و السابقين الاولين اليه ، اتهموه و انكروه عليه ، و قالوا كيف سمعت هذا وحدك ؟ و من سمعه معك ؟ و كانت عايشة رض اشد هم انكاراً عليه لتطاول الايام بها و به ۔ و كان عمر ايضا شديداً على من اكثر الرواية (الى قوله) و كان مع هذا يقول قال رسول الله صلعم كذا و انما سمعه من الثقة عنده فحكاه ۔ (٤٨—٥٠)

এই মন্তব্যের সার মর্ম্ম এই যে, ওমর, ওছমান, আলি ও বিবি আয়েশা যে আবুহোরায়রার রেওয়ায়তগুলিকে অবিশ্বাস করিতেন, তাহার কারণ এই যে, আবুহোরায়রা হজরতের সাহচার্য্য লাভ করিয়াছিলেন মোটামুটিভাবে তিন বৎসর মাত্র। হজরতের এন্তেকালের পর আবুহোরায়রা ৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন এবং হজরত হইতে অত্যধিক সংখ্যায় হাদিছ বর্ণনা করেন। বিবি আয়েশা তাঁহার এক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। তখন অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, আবুহোরায়রা হজরতের বরাত দিয়া যে সব হাদিছ বর্ণনা করেন, অথচ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী ও প্রধান প্রধান ছাহাবীগণের মধ্যকার আর কেহই ঐরূপ রেওয়ায়ত করিতেছেন না—এ অবস্থায় তাঁহারা আবুহোরায়রার প্রতি দোষারোপ করিতেন, তাঁহার প্রতিবাদ করিতেন এবং বলিতেন, "এই

হাদিছটা একমাত্র তুমিই কেবল শুনিলে, আর কেহই শুনিতে পাইল না, এ কিরূপ কথা!” “তোমার সঙ্গে আর কে এই হাদিছটা শ্রবণ করিয়াছে?” দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত একই সময় বাঁচিয়া থাকার ফলে, বিবি আয়শা আবুহোরায়রার সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন ...... (আবুহোরায়রা সংসারের কর্ম্ম-কোলাহল হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদাই হজরতের খেদ্‌মতে উপস্থিত থাকিতেন, আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেন—ইত্যাদি) তত্রাচ ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আবুহোরায়রা অনেক সময় বলিতেছেন—“রছুলুল্লাহ্ এইরূপ বলিয়াছেন”, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ উক্তিটী, হজরতের মুখে নহে, বরং নিজের বিশ্বাসভাজন অন্য কোন লোকের মুখে শুনিয়াছেন। *

হজরত আবুহোরায়রাকে আমরা মহাবিরাগী মহাপ্রেমিক ও মহামান্য ছাহাবী বলিয়া সমস্ত অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করি। তাঁহার অধিকাংশ রেওয়ায়ত সম্বন্ধে যে অবস্থার কথা উপরে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণভাবে অসতর্কতার ফল, কিন্তু অসাধুতার লেশমাত্রও তাহাতে নাই। পক্ষান্তরে এই অসতর্কতার জন্যও তাঁহাকে আমরা অপেক্ষাকৃত কম দায়ী বলিয়াই মনে করি। হজরত আবুহোরায়রার মত একজন ছাহাবীর পদধূলি মাথায় লইতে পারিলেও, আমাদের মত লোকের জীবন কৃত-কৃতার্থ হইয়া যায়, ইহাও আমাদের অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু, এ সব সত্ত্বেও ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এছলামের, কোর্‌আনের ও তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার শিক্ষা ও সম্ভ্রমের মূল্য এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যের গুরুত্ব, আমাদের এই ভাবপ্রবণতা হইতে লক্ষ কোটি গুণে অধিক। এই জন্যই অগত্যা প্রসঙ্গক্রমে, হজরত আবু-হোরায়রার—বা তাঁহার নামকরণে বর্ণিত—রেওয়ায়তগুলি সম্বন্ধে এখানে এই আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

পাঠকগণ দেখিতেছেন—“যীশু ও তাঁহার জননী ব্যতীত, আর সমস্ত আদম-সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তানের খোঁচা খাইতে বা তাহার প্রভাবাধীন আসিতে হয়”—এই মর্ম্মের রেওয়ায়তটী হজরত রছুলে করিমের হাদিছ বলিয়া কোন হিসাবেই গৃহীত হইতে পারে না।

যে সব খৃষ্টান-লেখক এই প্রসঙ্গ তুলিয়া যীশুকে নিষ্পাপ ও অতিমানব প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে ও দুনয়ার অন্য সমস্ত আম্বিয়াকে পাপী ও শয়তানের প্রভাবাধীন বলিয়া সপ্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার নিজেদের ঘরের খবর লইতে অনুরোধ করিতেছি। যীশু কিরূপে শয়তানের আজ্ঞাবহ হইয়া পবিত্র নগরে যাইতেছেন, ধর্ম্মধামের চূড়ার উপর উঠিতেছেন, এবলিসের † আদেশে

* এমাম এবনে-কোতায়বা, মৃত্যু ২৭৬ হিজরী। تأويل مختلف الحديث নামক পুস্তকের ৪৮ ও ৫০ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

† ইংরাজীতে Devil ও আরবীতে ইব্লিছ আছে, কিন্তু বাইবেলের বাংলা অনুবাদে উহার প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে “দিয়াবল” বলিয়া। সাধারণ লোকে আসল ব্যাপারটা না বুঝিতে পারে, ইহাই বোধ হয় অনুবাদকগণের উদ্দেশ্য।

তিনি কিরূপে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতেছেন, মথি ৫ম অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২৫৩ মর্‌য়মের ব্রতগ্রহণ :—

মর্‌য়ম-জননীর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করিলেন এবং ফলে তাঁহার কন্যাকে তিনি উত্তমরূপে "বর্দ্ধিত করিলেন।" কোর্‌আনে انبت শব্দ আছে, উহার মূল অর্থ—কোন উদ্ভিদকে উদ্গত করা ও তাহাকে শাখায়-পল্লবে ফুলে-ফলে বর্দ্ধিত ও পরিণত করিয়া তোলা। যে কোন বস্তুর বিকাশলাভ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তিকে ভাষায় انبت বলা হয়। বিবি মর্‌য়মকে আল্লাহ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে বর্দ্ধিত এবং সাধনার সিদ্ধিতে পুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিলেন, ইহাই আয়তের মর্ম্ম। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি'ত সকলেরই হইয়া থাকে, মর্‌য়ম সম্বন্ধে তাহা বিশেষ করিয়া বলার কোন সার্থকতা নাই। তফছিরের কোন কোন রাবী এই সার্থকতা প্রমাণ করার জন্য বলিয়াছেন—অন্য শিশুরা এক বৎসরে যতটা বর্দ্ধিত হয়, বিবি মর্‌য়ম এক মাসেই ততটা বর্দ্ধিত হইতেন। কিন্তু এ সব তাঁহাদের প্রমাণহীন খোশ্‌খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিবি মর্‌য়ম হইতেছেন ভবিষ্যতের এক মহা-নবুঅতের আধার। এই আধারকে মন, মস্তিষ্ক ও আত্মার দিক দিয়া হজরত ঈছার জননী হওয়ার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে য়ারুশালেমের সাধন-মন্দিরে, সাধু জাকারিয়ার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এইটাই হইতেছে আলোচ্য আয়তগুলির সার কথা। জাতি যদি নিজের মঙ্গলভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আদর্শ মানবের প্রাদুর্ভাব হউক—যথার্থই ইহা যদি তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে আদর্শ-জননী গড়িয়া তোলার চেষ্টাই হইবে তাহার বর্ত্তমানের প্রধান সাধনা—এ ইঙ্গিতও এই আয়তে পরোক্ষভাবে পাওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আদর্শ-জননী গঠন করিতে হইলে বর্ত্তমানের শিশু-কন্যাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। স্ত্রী-শিক্ষার যে পদ্ধতি অধুনা আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, মোটের উপর তাহাদ্বারা কতকটা উপকার সাধিত হইলেও, তাহাকে আদর্শ-শিক্ষা কখনই বলা যাইতে পারে না। শুধু বই পড়ার নামই শিক্ষা নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-সমাজের মধ্যে যে মানসিকতা কাজ করিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতের আদর্শ-জননী গঠন করা তাহার উদ্দেশ্য আদৌ নহে। বরং আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, তাঁহাদের মনের মত স্ত্রী প্রস্তুত করিয়া লওয়া। এই দুই আদর্শের ও তাহার ফলাফলের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

*

২৫৪ রেজ্‌ক :—

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, একমাত্র মোজাহেদ ব্যতীত, তফছিরের অন্য সমস্ত রাবীই এখানে "রেজ্‌ক"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন খাদ্য বলিয়া। "জাকারিয়া যখনই মর্‌য়মের নিকট উপস্থিত হন, তখন সেখানে খাদ্য দেখিতে পান"—তাঁহাদের গৃহীত অর্থ অনুসারে ইহাই

হইতেছে আয়তের অনুবাদ। কিন্তু, খাদ্য'ত জীবন্ত মানুষ মাত্রেরই দরকার হয়, আর মন্দিরের সাধক-সাধিকারা সকলেই'ত খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অনাহারে তাঁহারা কেহই জীবনধারণ করেন না। অতএব কোর্‌আনের এই বিবরণের কোন বৈশিষ্ট্য অথবা মর্‌য়মজীবনের কোন বৈচিত্র্য ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে না! এই অভাবটা পূর্ণ করিয়া দেওয়ার জন্য রাবীরা ঐ খাদ্যের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রেজ্‌ক অর্থে খাদ্য হইলেও এখানে উহার অর্থ হইতেছে মেওয়া। আর সে মেওয়াও যে সে মেওয়া নহে—গ্রীষ্মকালে শীতের ও শীতকালে গ্রীষ্মের মেওয়া। এইটাই হইল বৈচিত্র্য এবং এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াই জাকারিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মর্‌য়ম! এগুলি তুমি কোথা হইতে পাইতেছ?" রাবীলোকদের অঘটন-সংঘটন-পটীয়সী-প্রতিভা ইহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের একদল এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছেন যে, বিবি মর্‌য়মকে হজরত জাকারিয়া মন্দিরের যে কক্ষে রাখিয়াছিলেন, পরপর সাতটী দরজা মাড়াইয়া তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারা যাইত। হজরত জাকারিয়া বাহির হওয়ার সময় সেই সাত দরজার প্রত্যেকটী তালা দিয়া বন্ধ করিয়া যাইতেন। অতএব সে কক্ষে জনমানবের প্রবেশ করার কোনই সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা, ঐ অসময়ের মেওয়া সেই সপ্ত-দ্বাররুদ্ধ কক্ষের মধ্যে নিয়মিতভাবে সরবরাহ হইয়া আসিত। ইহাতেই জাকারিয়ার আশ্চার্য্যের আর অবধি রহিল না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মর্‌য়ম! এ সব তুমি কোথা হইতে পাইতেছ? সমস্ত তফছিরেই এই সব রেওয়ায়তের উল্লেখ আছে। মুফতী আবদুহু এই সব রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:—

و الله لم يقل ذلك و لا قاله رسوله صلعم ' و لا هو مما يعرف بالراے
و لم يثبـــته تاريخ يعتــد به -

"আল্লাহ উহা বলেন নাই, তাঁহার রছুলও বলেন নাই, যুক্তির দিক দিয়া উহা বুঝিতে পারা যায় না, কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে উহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না" (৩—২৯৩)। কিন্তু তবুও তফছির-সঙ্কলনকারী সকলেই উহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং মুছলমান-সমাজ সাধারণতঃ উহাকে সত্য বলিয়া—এবং কোর্‌আনের তাৎপর্য্যের আবশ্যকীয় অংশ বলিয়া—বিশ্বাস করিয়া যাইতেছে! একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে আধুনিক লেখকরা ইহাকে একদম একটা মামুলি ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের মতে, মন্দিরের অন্যান্য সেবকদিগকে বাহিরের লোকে যেরূপভাবে খাদ্য পৌছাইয়া দিতে অভ্যস্ত ছিল, মর্‌য়মকেও তাহারা সেইভাবে খাওয়ার পাঠাইয়া দিত। কে দিত, জাকারিয়ার তাহা জানা ছিল না। তাই তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমাদের মতে এই উভয় ধারণাই অসঙ্গত।

প্রথমতঃ, রাবীদিগের মুখে আমরা শুনিয়াছি, বিবি মর্‌য়মকে গ্রীষ্মকালে শীতের ও শীতকালে গ্রীষ্মের মেওয়া সরবরাহ করা হইত। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে একটা শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল, অথবা মোটামুটি হিসাবে দীর্ঘ একটা বৎসর ব্যাপিয়া যে, বিবি মর্‌য়মের রুদ্ধদ্বার হুজরার মধ্যে এইরূপে

মেওয়া সরবরাহ হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়াও হজরত জাকারিয়া এই (অন্ততঃ) এক বৎসর চুপ করিয়া রহিলেন কেন ? এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া আশ্চার্য্য বোধ করিয়া থাকিলে প্রথমাবস্থায় প্রশ্ন করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাহার পর, রেজ্‌ক-অর্থে 'খাদ্য' গ্রহণ করিলেও, বিশেষ প্রকারের খাদ্যে বা মেওয়ায় উহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লওয়ার কি হেতু আছে ? পক্ষান্তরে, ইহা একটা নিতান্ত মামুলী ব্যাপার হইলে হজরত জাকারিয়ার তাহা নিশ্চয়ই জানা থাকিত, সে সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করার কোন কারণই তাঁহার ছিল না। অধিকন্তু কোর্‌আনের বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হজরত জাকারিয়া এই ব্যাপারের মধ্যে এমন একটা প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি নিজের উত্তরাধিকারীর জন্য সেইখানেই (পরবর্ত্তী টীকা দেখুন) আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মামুলী ও সর্ব্ববিদিত ঘটনার ফলে এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না, আর তাহা হইলে কোর্‌আনে তাহার বর্ণনা করার সার্থকতাও কিছু থাকে না।

কোর্‌আনে বলা হইতেছে :—

(ক) যখনই জাকারিয়া মর্‌য়মের কাছে, উপস্থিত হইতেন, তাহার নিকট "রেজ্‌ক" দেখিতে পাইতেন।

(খ) "মর্‌য়ম এ সব তুমি প্রাপ্ত হও কোথা হইতে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বিবি মর্‌য়ম বলিতেছেন—"আল্লার নিকট হইতে।"

অতএব রেজ্‌ক-শব্দের এবং "আল্লার নিকট হইতে" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই এখানে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রেজ্‌ক শব্দের অর্থ স্থান বিশেষে 'খাদ্য' হইলেও, খাদ্য উহার একমাত্র অর্থ নহে। তাহার পর, আল্লার নিকট হইতে সমাগত কোন জিনিষের পক্ষে, স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ-পরম্পরা বর্জ্জিত একটা অলৌকিক ব্যাপার হওয়া আবশ্যক নহে। মানুষ দুন্‌য়ায় যে দিক দিয়া যাহা কিছু লাভ করে, কোর্‌আনের পরিভাষা অনুসারে সে সমস্তই "আল্লার নিকট হইতে" সমাগত।

কোর্‌আনের অভিধানকার রাগেব বলিতেছেন :—

الرزق يقال للعطاء الجاری تارة ، دنيويا كان او اخرويا - و للنصيب تارة -
و لما يصل الى الجوف و يتغذى به تارة -

"রেজ্‌ক বলা হয় কখন চিরন্তন দানকে, সে দান পার্থিব হউক আর পারলৌকিক হউক ; নির্দ্দিষ্ট অংশ বা প্রাপ্যকেও কখনও রেজ্‌ক বলা হয়, এবং যাহা উদরস্থ করিয়া তাহাদ্বারা শরীর ধারণ করা হয়, তাহাকেও কখন কখন রেজ্‌ক বলা হয়।" রাগেব কোর্‌আন হইতে এই তিন তাৎপর্য্যেরই নজির উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা, انفقوا مما رزقنكم আমরা তোমাদিগকে যে রেজ্‌ক দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাক—আয়তে "রেজ্‌ক হইতে"-পদের অর্থ من المال و الجاه و العلم সম্পদ হইতে, সম্মান-সম্ভ্রম হইতে ও জ্ঞান হইতে।

বিখ্যাত অভিধান-লেখক জওহারী বলিতেছেন :—

الرزق كل ما ينتفع به ... و قد سمى المطر رزقاً و ذلك فى قوله و ما انزل الله
من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها ۔

অর্থাৎ—যাহা কিছুর দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, তাহার প্রত্যেকটাকে রেজ্‌ক বলা হইয়া থাকে। ...... বৃষ্টিকেও কখন কখন রেজ্‌ক বলা হয়। যেমন কোর্‌আনে আছে—এবং আল্লাহ আছমান হইতে যে রেজ্‌ক নাজেল করিয়াছেন ও তাহাদ্বারা মৃত জমিনকে আবার জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ছুরা আন্‌কাবুতে মানবসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে— فابتغوا عند الله الرزق "তোমরা আল্লার নিকটে রেজ্‌কের সন্ধান (বা প্রার্থনা) করিও!" সুতরাং সমস্ত রেজ্‌কই যে "আল্লার নিকট" হইতেই সমাগত হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

আমাদের মতে, রেজ্‌ক-শব্দের অর্থ এখানে অধ্যাত্ম সংক্রান্ত জ্ঞান, ধর্ম্ম সংক্রান্ত শিক্ষা ও আল্লার প্রদত্ত আলোক। নারীদিগের মধ্যে জ্ঞানে ও চরিত্রে যাঁহারা পূর্ণপরিণত হইয়াছেন, বিবি মর্‌য়ম তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যতম—ইহা হজরতের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইতেছে (বোখারী)। এই জন্য হাদিছের টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে আল্লার অহি-প্রাপ্ত নবী বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন (ফৎহুল্‌বারী)। মানুষ আত্মার হিসাবে এই পূর্ণতালাভ করিতে পারে যে-রেজ্‌কের দ্বারা, তাহা ডা'ল-রুটি বা আঙ্গুর-বেদানা কখনই নহে। তাহা হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান, সত্যপ্রাপ্তি এবং মা'রেফাতে এলাহীর নিগূঢ় রহস্যবোধ। তাই কোন কোন তফছিরকারও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এ সব আয়োজন হইতেছিল— التاسيس نبوة ابنها عيسى তাঁহার পুত্র ঈছার নবুয়তের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করার জন্য (হাইয়ান)।

বিবি মর্‌য়ম ব্রতগ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মন্দিরে অবস্থান করেন। আল্লার ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত থাকাই ছিল তাঁহার এ জীবনের প্রধানতম ব্রত। তিনি ক্রমে ক্রমে এই সাধনায় উৎকর্ষলাভ করিতে লাগিলেন। হজরত জাকারিয়া সাধনার প্রথম অবস্থায় এই বিষয়টীকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। কিন্তু সে সাধনা যখন চরম উৎকর্ষলাভ করিল এবং বিবি মর্‌য়ম যখন তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণতালাভ করিলেন। তখন একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মর্‌য়ম! এ সব মহামূল্য তত্ত্বজ্ঞান তুমি প্রাপ্ত হইলে কোথা হইতে?" বিবি মর্‌য়ম সরল-সহজ ভাষায় উত্তর দিলেন—"আল্লার নিকট হইতে!"

২৫৫ জাকারিয়ার প্রার্থনা :—

আয়তের প্রথমে هنالك শব্দ আছে। উহার অর্থ 'সেই স্থানে' ও 'সেই সময়ে' উভয়ই হইতে পারে—অভিধানকারগণের সমস্ত মতভেদের ইহাই হইতেছে সার কথা। শাহ অলিউল্লা ছাহেবের অনুকরণে আমি শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ছুরা মরয়মের প্রথমভাগে হজরত জাকারিয়ার এই প্রার্থনার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ছুরাটী মক্কায় অবতীর্ণ, আর আলে-এম্রান ছুরা তাহার বহু পরে মদিনায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই আয়তটীর মর্ম্ম স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য আমরা ছুরা মরয়মের প্রাসঙ্গিক আয়তগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সেখানে বলা হইতেছে :—

.. ... ذكر رحمت ربك عبده زكريا - اذ نادى ربه نداء خفيا - قال انى وهن العظم منى و اشتعل الرأس شيبا و لم اكن بدعائك رب شقيا - و انى خفت الموالى من ورائى و كانت امرأتي عاقرا فهب لى من لدنك وليا ، يرثنى و يرث من آل يعقوب ، و اجعله رب رضيا -

শাব্দিক অনুবাদ :—"ইহা হইতেছে তোমার প্রভুর অনুগ্রহের বিবরণ—তাঁহার বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। যখন সে নিভৃতে আপন প্রভুকে ডাকিয়াছিল, বলিয়াছিল :—হে আমার প্রভু! আমার অস্থি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে আর বার্দ্ধক্যের ফলে আমার মস্তক উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর তোমার কাছে যাচ্ঞা করিয়া, প্রভুহে, আমি কখনই বঞ্চিত হই নাই। অবস্থা এই যে, আমার পরে আমার জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগের সম্বন্ধে আমি ভীত হইয়াছি, অথচ আমার স্ত্রী হইতেছেন বন্ধ্যা—অতএব, আমাকে একজন ওয়ারিস দান কর—যে আমার ও সমগ্র য়াকুব-গোত্রের উত্তরাধিকারী হইতে পারে, আর প্রভুহে, তাহাকে মনের মত করিয়া দাও!"

এই আয়ত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে—

(১) হজরত জাকারিয়া নিশ্চয়ই বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর দোওয়া করিয়াছিলেন।

(২) তাঁহার পূর্ব্বকার প্রার্থনাগুলি সমস্তই আল্লাহ মন্জুর করিয়াছিলেন, জাকারিয়া ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন।

(৩) তাঁহার পরলোক গমনের পর জ্ঞাতী-কুটুম্বদের কোন গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কায় তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৪) তিনি বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা—এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঔরসজাত সন্তানলাভ করার কোন আশাই সে সময় হজরত জাকারিয়া পোষণ করিতে-ছিলেন না।

(৫) সেই জন্য তিনি পুত্র বা সন্তান না চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছেন একজন অলি, ওয়ারেস বা তত্ত্বাবধানকারী। আমি বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, অতএব আমাকে একজন ওয়ারেস দান কর - পদ হইতে এই ভাবটা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে।

(৬) নিজের ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদের উত্তরাধিকারী পাওয়ার জন্য জাকারিয়া ব্যস্ত হন নাই। তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন এমন একজন উত্তরাধিকারীর জন্য, "যে তাঁহার ও সমগ্র য়াকুব-গোত্রের ওয়ারেস হইতে পারে।" সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে, তিনি চাহিতেছিলেন বানি-এছরাইলের খান্দানে-নবুয়তের জন্য একজন ওয়ারেস। নবীদের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্ত্তায় না, ইহা হজরতের হাদিছ।

ফলতঃ নিজের সন্তান হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই হজরত জাকারিয়া এছরাইলীয় নবী-বংশের জন্য একজন উত্তরাধিকারী চাহিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তের প্রার্থনার মর্ম্মও ইহাই। ছুরা-মর্‌য়মের আয়ত হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, হজরত জাকারিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের অবস্থা দেখিয়া বানি-এছরাইল জাতির শোচনীয় ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আয়তের সঙ্গে বিবি মর্‌য়মের উপাখ্যানটী মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় যে, হজরত জাকারিয়া স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আবার যে সাধু-সজ্জনের বা নবী-রছুলের আবির্ভাব হইতে পারে, অবস্থা দেখিয়া তিনি সে আশা আর পোষণ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই নিরাশা ও দুর্ভাবনার অন্ধকারের মধ্যে তিনি আশার আলোক দেখিতে পাইলেন, বিবি মর্‌য়মের অসাধারণ-সাধনা ও অনুপম সিদ্ধির মধ্যে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ও উত্তর শুনিয়া আশা ও উদ্যমের নবপ্রেরণা তাঁহার বুকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাই তিনি অবিলম্বে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন, য়াকুব-গোত্রের নবুয়তের মিশনকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এমন একজন উত্তরাধিকারী পাইবার জন্য।

তফছিরের রাবীরা বলিতেছেন—মর্‌য়মের রুদ্ধদ্বার হুজরার মধ্যে শীতকালে গ্রীষ্মের ও গ্রীষ্মকালে শীতের মেওয়া দেখিয়া এবং উহা "আল্লার নিকট হইতে সমাগত"-মর্‌য়মের মুখে এই উত্তর শুনিয়া, জাকারিয়ার মনে আল্লার অপার কুদরতের অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আল্লাহ যখন এমন অসময়ের মেওয়া সরবরাহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার পক্ষে বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা-আমাদের সন্তান দেওয়া কোনই বিচিত্র নহে। এই ধারণার ফলে তিনি তখনই সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই যে, এই মেওয়া বা অসময়ের মেওয়ার কাহিনীটা রাবীদের নিজস্ব কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোর্‌আনের কোন আয়ত সম্বন্ধে একটা তাৎপর্য্য গড়িয়া লওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। তাহার পর, এই থিউরীদ্বারা হজরত জাকারিয়ার জ্ঞান ও ঈমানকে বহুপরিমাণে হীনভাবেই কল্পনা করা হইতেছে। বৃদ্ধ ও বন্ধ্যাকে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, অসময়ের মেওয়া না দেখিয়াও, হজরত জাকারিয়ার মত একজন নবীর মনে ইহার দৃঢ় প্রতীতি থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

২৫৬ য়াহ্‌য়া সম্বন্ধে খোশ্‌খবর :—

উপরোক্ত প্রার্থনার পরে, সম্ভবতঃ অব্যবহিত পরেই, হজরত জাকারিয়া মেহরাবে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছেন—উপাসনা করিতেছেন, এই সময় ফেরেশ্‌তারা তাঁহাকে আল্লার অনুগ্রহের

খোশ্‌খবর জানাইলেন, তাঁহার ঔরসে য়াহ্‌য়া-নবীর জন্মলাভ করার সংবাদ দিলেন। ছুরা মর্‌য়মে বলা হইতেছে— يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى
"হে জাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটী পুত্র-সন্তানলাভের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম হইবে য়াহ্‌য়া।" ইহাতে হজরত জাকারিয়ার কৌতূহলের আর অবধি রহিল না। তিনি বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা, ফলতঃ তাঁহার আর সন্তানলাভের আশা নাই—এই মনে করিয়া তিনি একজন উপযুক্ত ওয়ারেসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ প্রার্থনার উত্তর আসিল যে, এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত দম্পতিকেই আল্লাহ সন্তান দিবেন। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যই তিনি বলিলেন—"এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যার সন্তান হইবে কবে বা কিরূপে?" ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ইচ্ছায় এইরূপই হইবে। ছুরা মর্‌য়মে জাকারিয়ার কৌতূহলের উত্তরে বলা হইয়াছে—"বলিলেন এইরূপই হইবে, তোমার প্রভু বলিতেছেন উহা আমার পক্ষে সহজ।" ফলতঃ হজরত জাকারিয়া আল্লার দেওয়া খোশ্‌খবরে সন্দেহ করেন নাই, তাঁহার অসীম কুদরৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহও তাঁহার মনে স্থানলাভ করে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যে কৌতূহল বা আগ্রহাতিশয্য মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আশাতীত খোশ্‌খবর পাইয়া হজরত জাকারিয়ার মনও তাহারই প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল, এবং সেই কৌতূহল ও আগ্রহাতিশয্যের ফলেই তিনি প্রশ্নচ্ছলে নিজের সেই আগ্রহটাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র।

রাবীরা কিন্তু ইহার অন্য প্রকার কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—জাকারিয়া নিজের জন্য স্বয়ং পুত্র-সন্তান-প্রার্থনা করিলেন, সেই প্রার্থনা অনুসারে আল্লাহ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি পুত্র-সন্তানলাভ করিবেন। অথচ নিজেদের বার্দ্ধক্যে ও বন্ধ্যাত্বের অজুহাতে জাকারিয়া ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বড়ই সমস্যার কথা! তাই সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁহারা এক্ষেত্রেও কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, জাকারিয়া দোওয়া করিয়াছিলেন ৬০ বৎসর পূর্ব্বে। তদনন্তর দীর্ঘ ৬০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে পুত্রলাভের খোশ্‌খবর দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে নিজের প্রার্থনার কথা হজরত জাকারিয়া একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর, আল্লার পক্ষ হইতে যখন তাঁহাকে পুত্রলাভের খোশ্‌খবর দেওয়া হইল, তখন শয়তান তাঁহাকে অছঅছা দিয়া বলিল—"জাকারিয়া! দেখিতেছ কি? ইহা আল্লার অহি নহে—শয়তানের শব্দ। শয়তান এইরূপে তোমার সহিত ঠাট্টা-তামাশা করিতেছে মাত্র।" এই সব কারণে জাকারিয়ার মনে সন্দেহ জন্মে, এবং সেই জন্যই তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বায়জাবীর ন্যায় বিখ্যাত তফছিরকার আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, পুত্রলাভের খোশ্‌খবর পাওয়ার সময় জাকারিয়ার বয়স হইয়াছিল ১২০ বৎসর (জরির, কবির, বায়জাভী)।

এ সব কল্পনা সম্বন্ধে স্থায়ী প্রশ্ন এই যে, বহু শত বৎসর পূর্ব্বকার এই সব ঘটনা রাবীরা অবগত হইলেন কিরূপে, কোন্ সূত্রে? হজরত জাকারিয়ার প্রার্থনার সময় মছজেদের মেহরাবে তাঁহারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না, শয়তান কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জাকারিয়াকে

গোম্‌রাহ করিতে যায় নাই। কোন্ সময় জাকারিয়ার বয়স কত ছিল, তাহা অবগত হওয়ার কোন সুযোগও তাঁহাদের ঘটিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, হজরত জিব্রাইল আসিয়া তাঁহাদিগকে এ সব তত্ত্ব জানাইয়া যান নাই, হজরতের মুখ হইতেও কেহ ঐ প্রকারের কোন বৃত্তান্তই অবগত হন নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে, বিশেষতঃ কোর্‌আনের তফছির সম্বন্ধে, ঐ বিবরণগুলিকে পেশ করার আদৌ কোন অধিকার তাঁহাদের নাই।

তাহার পর, কোর্‌আনের আয়তগুলির প্রতি একটু মনোযোগ দিয়া বিচার করিলে সহজে দেখা যাইবে যে, এই বিবরণগুলি তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশেরও বিপরীত। হজরত জাকারিয়া ছিলেন আল্লার নবী, তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তাঁহাকে পুত্রলাভের খোশ্‌খবর দিতেছেন। এই অবস্থায় শয়তান আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল—আর তিনিও বুঝিলেন—যে, উহা আল্লার বাণী নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা হইতেছে শয়তানের চীৎকার! আল্লার নবী, আল্লার কালাম এবং শয়তানের সামর্থ্য সম্বন্ধে ঐরূপ বিশ্বাস করা'ত দূরে থাকুক, ঐ ভাবের কল্পনাও মুছলমানের মনে স্থানলাভ করা উচিত নহে। তাহার পর, রাবীদের দেওয়া অঙ্ক অনুসারে হজরত জাকারিয়ার বয়সের হিসাব কষিলে দেখা যাইবে যে, তিনি সন্তান-প্রার্থনা করিয়াছিলেন মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে (৯৯ — ৬০ = ৩৯)। অথচ ছুরা মর্‌য়মে ও আলে-এম্‌রানে দেখা যাইতেছে যে, দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বরং সন্তান-প্রার্থনা করার পূর্ব্বে, জাকারিয়া নিজের চরম বার্দ্ধক্যের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত, আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সকল ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে হজরত ঈছা ও হজরত য়াহ্‌য়া সমবয়স্ক। বাইবেল অনুসারে হজরত য়াহ্‌য়া মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। অতএব, য়াহ্‌য়া ও ঈছা উভয়ের মাতা যে প্রায় একই সময় গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত। অধিকন্তু আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, হজরত জাকারিয়া সন্তান-প্রার্থনা করিয়াছিলেন মর্‌য়মের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করার পর, তাঁহার উত্তরে উদ্বুদ্ধ হইয়া। ইহাও নিশ্চিত যে, য়াহ্‌য়া-জননীর গর্ভধারণের পূর্ব্বেই তাঁহার স্বামী জাকারিয়া পুত্রলাভের খোশ্‌খবর পাইয়াছিলেন। বিবি মর্‌য়ম যখন যীশুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধমাত্র হইয়াছে। ধরুন, ২০ বৎসর বয়সে বিবি মর্‌য়ম গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, মর্‌য়ম কমবেশি ১৫ বৎসর মাত্র জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে মছজিদে অবস্থান করিতেছেন। জাকারিয়ার প্রার্থনা ও তাঁহার খোশ্‌খবর লাভ নিশ্চয় এই ১৫ বৎসরের মধ্যকার ব্যাপার হইবে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রার্থনা হইয়া থাকিলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মর্‌য়মের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্ব্বে জাকারিয়া সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অথচ কোর্‌আন অনুসারে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন মর্‌য়মকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া এবং তাঁহা হইতে প্রেরণালাভ করিয়া। পাঠক, অন্য দিক দিয়া দেখুন—যদি ধরা যায় যে, বস্তুতই খোশ্‌খবর আসিয়াছিল প্রার্থনার ৬০ বৎসর পরে। আর আনুমানিক হিসাবে যদি ধরা যায় যে, বিবি মর্‌য়মের সঙ্গে জাকারিয়ার ঐ সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, য়াহ্‌য়ার

জন্ম হইয়াছিল যীশুর জন্মের অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, অর্থাৎ যীশুর পরলোক গমনেরও কতিপয় বৎসর পরে। ইহাও সত্যবিরোধী ধারণা। ফলতঃ রাবীদিগের ঐ বিষয়গুলি সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য।

এই সব বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেও আমরা দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। কিন্তু এ পথের প্রথম-যাত্রীদিগের পক্ষে এখন আর ঐগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়ারও কোন উপায় নাই। একদিকে খৃষ্টান-লেখকরা বাছিয়া বাছিয়া ঐ শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলি উদ্ধৃত করিয়া কোর্‌আনের প্রতি বিশ্বমানবকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলার চেষ্টা পাইতেছেন, অন্যদিকে আমাদের আ'লেম-ছাহেবরা একরামা ছুদি প্রমুখ নিতান্ত জঈফ ও অবিশ্বাস্য রাবীদিগের এই শ্রেণীর অপ্রামাণ্য বাজে কথাগুলিকেই "ছুন্নৎ-জমাতের" একমাত্র রক্ষাকবচ ও কোর্‌আনের বিশ্বাসযোগ্য খাঁটি তফছির বলিয়া, সহস্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। কাজেই আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে যে, ঐ শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলির সহিত কোর্‌আনের বর্ণনার কোনই সম্বন্ধ নাই।

২৫৭ জাকারিয়ার "নিদর্শন" :—

তাওরাতে হজরত য়াহ্‌য়া ও হজরত ঈছার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। তাঁহারা আসিয়া জাতিকে সকল কলুষ হইতে মুক্ত করিবেন, ইহাও জাকারিয়ার বিদিত ছিল। জাকারিয়াকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, সেই বহু অপেক্ষিত য়াহ্‌য়া বা John তাঁহারই গৃহে জন্মলাভ করিবেন। বোধ হয়, বিবি মরয়মের অসাধারণ জীবনধারা দর্শন করিয়া হজরত জাকারিয়ার মনে আশা হইয়াছিল যে, আল্লার সেই সত্যবাণী-স্বরূপ হজরত ঈছা এই মহীয়সী মহিলার মধ্যবর্ত্তিতায়ই আবির্ভূত হইবেন। সে যাহা হউক, য়াহ্‌য়ার খোশ্‌খবরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি স্বয়ং নবী হইবেন এবং হজরত ঈছার সত্যতার সমর্থন করিবেন। সাধু জাকারিয়ার আজীবনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। কাজেই তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। কবে সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে, সেই অপেক্ষিত অনাগতদিগের আবির্ভাবকাল কিরূপে জানা যাইবে, এই প্রশ্নে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। তাই তিনি আবার বলিলেন—তোমার এই মঙ্গলইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইতে যাইবে যখন, তখনই যেন তাহা জানিতে পারি, এমন একটা নিদর্শনের কথা আমায় বলিয়া দাও। উত্তরে বলা হইল—

آيتك ان لا تكلم (اى) تصير ماموراً بان لا تكلم ثلثة ايام بلياليها مع الخلق ان تكون مشتغلاً بالذكر و التسبيح و التهليل معرضاً عن الخلق و الدنيا شاكراً لله تعالى على اعطاء مثل هذه الموهبة فان كان لك حاجة دل عليها بالرمز - فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم انه قد حصل المطلوب - (ابو مسلم - كبير)

"তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিবারাত্র তুমি লোকদিগের সহিত কথা কহিবে না—অর্থাৎ কথা না কহিতে এবং কথা না কহিয়া, দুনয়া ও দুনয়ার মানুষ হইতে সরিয়া গিয়া, তাঁহার গুণকীর্তনে

ও মহিমা-ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করিবে, (তোমার ও তোমার জাতির প্রতি) আল্লার এই মহাদানের জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানধারণায় তন্ময় হইয়া থাকিবে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে ইঙ্গিতের দ্বারা কাজ সারিয়া লইবে মাত্র।” হে জাকারিয়া! আমার পক্ষ হইতে এই প্রকার মৌনব্রত ধারণের আদেশ যখন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখনই বুঝিয়া লইও, সেই অনাগত সমাগত হইয়াছেন—মাতৃগর্ভে য়াহ্‌য়ার সমাগম হইয়াছে।” কোর্‌আনের বিজ্ঞতম তফছিরকার এমাম আবু-মোছলেম আলোচ্য আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমাম রাজী এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন—

و هذا القول عندی حسن معقول۔ و ابو مسلم حسن الكلام فی
التفسير كثير الغوض على الدقايق و اللطائف

“আমার মতে ইহা খুব-সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ তফছির সম্বন্ধে আবু-মোছলেমের কথাগুলি অতি সুন্দর, কোর্‌আনের কঠিন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন” (২—৬৬৮)। আমাদের মতে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বকার ভ্রান্তিগুলির বশবর্ত্তী হইয়া রাবীরা এই আয়তের ব্যাখ্যায় নানা প্রকার অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, আল্লার দেওয়া খোশ্‌খবরের পরেও জাকারিয়া আবার ‘নিদর্শন’ চাহিলেন। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দণ্ড স্বরূপে তাঁহার প্রতি তিন দিবারাত্রি মূক হইয়া থাকার আদেশ দেওয়া হইল। আয়তের অন্য অংশের সহিত সামঞ্জস্য রাখার জন্য অন্যরা বলিতেছেন যে, জাকারিয়া দুনয়ার কোন ব্যাপার সম্বন্ধে লোকদিগের সহিত কথা বলিতে পারিতেন না, সে সময় তিনি মূক হইয়া যাইতেন। কিন্তু আল্লার ভজন ও গুণকীর্ত্তনের সময় তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে সমর্থ হইতেন, ইত্যাদি। অবিশ্বাসের দণ্ড স্বরূপ জাকারিয়ার মূকত্বপ্রাপ্তির কথা বাইবেলের ভ্রান্ত উক্তির অন্যায় প্রতিধ্বনি মাত্র। বাইবেলকার বলিতেছেন—“আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথা সময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিলে না” (লূক ১—২০)।

হজরত জাকারিয়া ও হজরত য়াহ্‌য়া সংক্রান্ত অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছুরা মর্‌য়মের তফছিরে আলোচনা করাই সঙ্গত হইবে।

৫ রুকু

৪১ আর ফেরেশ্‌তাগণ যখন বলিয়াছিল— "হে মরয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং (সমসাময়িক) জগতের নারিগণের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়াছেন তোমাকে।"

٤١ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪২ "হে মরয়ম ! নিজ প্রভুর সমীপে বিনত-অনুগত হও এবং (তাঁহার হুজুরে) ছেজ্‌দা করিতে থাক ও নামাজী-লোকদিগের সঙ্গে (মিশিয়া) নামাজ সম্পাদন করিয়া যাও !"

٤٢ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৩ (হে মোহাম্মদ!) অজ্ঞাত সংবাদ সমূহের মধ্যকার এইগুলি আমরা তোমার প্রতি অহি (-দ্বারা প্রকাশ) করিতেছি; তাহাদিগের কে মরয়মের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিবে - এসম্বন্ধে যখন তাহারা নিজেদের 'কলমগুলি' নিক্ষেপ করিতেছিল, তুমি'ত তখন তাহাদের কাছে

٤٣ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ

(উপস্থিত) ছিলে না—আর তখনও তুমি তাহাদের কাছে (উপস্থিত) ছিলে না - যখন তাহারা পরস্পর বিসম্বাদ করিতেছিল[২৬১]।

يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

৪৪ আর ফেরেশ্‌তারা যখন বলিয়াছিল—"হে মর্‌য়ম! আল্লাহ তোমাকে নিজ সন্নিধানের একটী ফর্‌মান সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতেছেন[২৬২]ঃ—তাহার নাম 'আল্‌-মছিহ্ ঈছা-এবনে-মর্‌য়ম', (সে হইবে) ইহজগতে ও পরজগতে সম্ভ্রমশালী ও (আল্লার) সান্নিধ্য-প্রাপ্তদিগের মধ্যকার একজন[২৬৪];—

٤٤ إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪৫ "আর সে লোকদিগের সহিত কথা কহিবে মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ়-অবস্থায়[২৬৫] এবং (সে হইবে) সাধুসজ্জনগণের মধ্যকার এক-জন।"

٤٥ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৪৬ মর্‌য়ম (উত্তরে) বলিল—"হে আমার প্রভু! আমার সন্তান হইবে কিরূপে, অথচ কোনও মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই"[২৬৬]; আল্লাহ্ বলিলেন—ইহার ন্যায় আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; তিনি যখন কোন

٤٦ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط

বিষয় সমাধা করার ইচ্ছা করেন, সে সম্বন্ধে শুধু বলেন — "হউক !" অমনি তাহা হইয়া যায়।

اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ۝

৪৭ আর (হে মর্‌য়ম !) আল্লাহ্ তাহাকে কেতাব ও জ্ঞান এবং তাওরাৎ ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন—

٤٧ ويعلمه الكتب والحكمة والتورية والانجيل ۝

৪৮ আর রছুলরূপে (প্রেরণ করিবেন তাহাকে) বানি-এছরাইলের পানে, (তখন সে তাহাদিগকে বলিবে) যে, তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে (-প্রাপ্ত) নিদর্শন আমি তোমাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়াছি—এই যে, তোমাদিগের জন্য আমি মাটি হইতে পাখীর আকার-সদৃশ্য প্রস্তুত করিব, অতঃপর তাহাতে ফুৎকার করিব, ফলে তাহা পাখী হইয়া যাইবে—আল্লার অনুমতিক্রমে; এবং অন্ধ ও কুষ্ঠীদিগকে নিরাময় করিব ও মৃতদিগকে জীবনদান করিব— আল্লার অনুমতিক্রমে; আর তোমরা যাহা ভোগ করিবে ও নিজেদের গৃহে যাহা সঞ্চয়

٤٨ ورسولا الى بني اسراءيل ۝ اني قد جئتكم باية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ج وابرئ الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله ج وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في

বُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

করিবে - তাহাও আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব ; নিশ্চয় ইহাতে তোমাদিগের জন্য নিদর্শন আছে - যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ;—[২৬৯]

٤٩ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾

৪৯ এবং (আমি প্রেরিত হইয়াছি) তাওরাতের যে অংশ আমার সম্মুখে (বিদ্যমান) আছে তাহার তছদিককারীরূপে, আরও এই জন্য (প্রেরিত হইয়াছি) যে, তোমাদিগের প্রতি যাহা অবৈধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে - তাহার কতকগুলিকে তোমাদিগের জন্য বৈধ করিয়া দিব,[২৭০] বস্তুতঃ তোমাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে আমি এক নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, অতএব তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সতর্ক হও এবং আমার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে থাক !

٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫০ নিশ্চয় আল্লাই হইতেছেন আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা সকলে পূজা করিবে তাঁহাকেই ; ইহাই হইতেছে সুদৃঢ়-সরল-পন্থা।[২৭১]

৫১ অতঃপর ঈছা যখন তাহাদিগের মধ্য হইতে বিদ্রোহের (ভাব) অনুভব করিল, সে বলিল— "আল্লার পানে (এই যে আমার মহাযাত্রা, ইহাতে) আমার সহায় হইবে কে ?" শিষ্যগণ (এই আহ্বানে সাড়া দিয়া) বলিল—"আমরা আছি আল্লার (ধর্ম্মের) সহায়তাকারী, আমরা আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আর তুমি প্রত্যক্ষ কর যে, বস্তুতঃ আমরা হইতেছি আত্ম-সমর্পণকারী (মোছলেম) ।

٥١ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

৫২ হে আমাদের প্রভু ! যে বাণী তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও (তোমার) রছুলের অনুসরণ আমরা করিয়াছি — অতএব আমাদিগকে (সত্যের) সহায়ক-গণের সঙ্গে লিখিয়া লও ![২১২]

٥٢ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৫৩ আর এহুদীরা এক পরিকল্পনা করিল এবং (পক্ষান্তরে) আল্লাহ্ (অন্য) পরিকল্পনা করিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হইতেছেন শ্রেষ্ঠ-পরিকল্পনাকারী ।[২১৩]

٥٣ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ع

টীকা :—

২৫৮ **ফেরেশতাগণ—মালাএকা :—**

মূলে মালাএকা শব্দ আছে, ইহার শাব্দিক অনুবাদ 'ফেরেশ্‌তাগণ'। ছুরা মর্‌য়মের ১৭ আয়তে 'রূহ'-শব্দের অর্থ জিব্রাইল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কোর্‌আনের দুই স্থানের বর্ণনায় একটা গুরুতর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। এখানে বলা হইতেছে যে, মর্‌য়মকে আহ্বান করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন 'ফেরেশ্‌তাগণ'। আরবী ব্যাকরণ-অনুসারে ইহার অর্থ হইবে, অতন্তঃ তিনজন ফেরেশ্‌তা। আর ছুরা মর্‌য়মের ঐ আয়তের যে অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বিবি মর্‌য়মকে আহ্বান করিয়া ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন একমাত্র হজরত জিব্রাইল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, একই ঘটনা সম্বন্ধে কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরস্পর অসমঞ্জস !

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, "এখানে 'ফেরেশ্‌তাগণ'-অর্থে একজন ফেরেশ্‌তা, অর্থাৎ হজরত জিব্রাইল। আর যদিও ইহা স্পষ্ট অর্থের বিপরীত, তত্রাচ অগত্যা তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ছুরা মর্‌য়মে বলা হইয়াছে যে, আমি মর্‌য়মের নিকট নিজের রূহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলাম, আর রূহ্‌-শব্দের অর্থ হইতেছে—জিব্রাইল। সুতরাং ফেরেশ্‌তাগণ বলিতে 'একজন ফেরেশ্‌তা' গ্রহণ করিতেই হইবে" (কবির ২—৬৬৯ ও ৫—৭৭৯)। খৃষ্টান-লেখকগণ এই অসামঞ্জস্য ও তাহার অপরূপ সমাধানকে উপলক্ষ করিয়া কোর্‌আনের সত্যতার বিরুদ্ধে তীব্র ইঙ্গিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমাদের মতে এই সমস্যাটী স্বকপোল কল্পিত এবং তাহার এই সমাধানও একটা অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র। বস্তুতঃ উল্লিখিত আয়ত দুইটীর মধ্যে অসামঞ্জস্য একটুও নাই। ছুরা মর্‌য়মের যে আয়তকে উপলক্ষ করিয়া এই অসামঞ্জস্যটী কল্পিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানেই করা হইবে। এখানে পাঠকগণকে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, 'রূহ'-শব্দের অর্থ জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা কোন স্থানে হইতে পারে বলিয়া সর্ব্বত্রই যে উহার ঐ অর্থ হইবে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। কোর্‌আনের তফছির ও অভিধানকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, 'রূহ'-শব্দের অর্থে—আত্মা, অহি বা inspiration ও কোর্‌আন প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে এবং কোর্‌আনেই এই সব ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে (রাগেব)। ফলতঃ ছুরা মর্‌য়মে 'রূহ'-অর্থে যে "জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা" নিশ্চয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ এমাম আবুমোছলেমের ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি তফছিরকার উহার অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (কবির ৫—৭৭৯)। তাহার পর, ছুরা এম্‌রানে বর্ণিত ঘটনার স্থান ও কাল এবং ছুরা মর্‌য়মের বর্ণিত ঘটনার স্থান ও কাল যে অভিন্ন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরং

পাঠকগণ ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, বিবি মৰ্‌য়মের মন্দির ত্যাগ হইতে হজরত ঈছার যৌবন ও নবুয়ত পাওয়ার সময় পর্য্যন্তকার যে দীর্ঘ ব্যবধান, তাহার মধ্যকার বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ঘটনাকে আমাদের অসতর্ক রাবীরা একত্র মিশাইয়া দিয়াই এ ক্ষেত্রে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এখানে আরও বলিতে চাই যে, যদি ছুরা মৰ্‌য়মে বর্ণিত 'রূহ'-শব্দের অর্থ— 'জিব্রাইল' বলিয়া গ্রহণ করাও নিশ্চিত হয়, তাহা হইলেও খৃষ্টান-বন্ধুদের আনন্দের কোন কারণ নাই। সে অবস্থায়, আলোচ্য আয়তের 'মালাএকা'-শব্দের অর্থ—ফেরেশ্‌তাগণ না হইয়া 'এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা' - হইবে। সম্মান ও গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই প্রকার বহুবচন ব্যবহার করা সমস্ত উন্নত সাহিত্যের অলঙ্কারসম্মত। কোর্‌আনের বহু স্থানে আল্লাহ সম্বন্ধে যে বহুবচনার্থক ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনাম প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই। বিখ্যাত কবি এম্‌রাউল্‌কএছ বলিয়াছেন— ترائبها مصقولة كالسجنجل এখানে বক্ষের বিশালতা বুঝাইবার জন্যই ترائب বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া সাহিত্য-গুরুরা সকলেই একমত।

২৫৯ মৰ্‌য়মের নির্ব্বাচন :—

প্রথমে বিবি মৰ্‌য়ম নির্ব্বাচিত হইলেন প্রথম জীবনের সাধনা ও তপস্যার জন্য। এই দীর্ঘ তপস্যার পর যথাসময় তাঁহাকে আবার নির্ব্বাচন করা হইল ইছরাইল-জাতির মুক্তিদাতা পয়গাম্বর হজরত ঈছার গর্ভধারিণী হওয়ার জন্য। এই উদ্দেশ্যে দেহের ও আত্মার সকল প্রকার গ্লানি হইতে তাঁহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

হজরত মৰ্‌য়মকে ফেরেশ্‌তারা এই সংবাদ দিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার নবী হওয়া প্রতিপন্ন হয় কি না, এই প্রশ্ন লইয়া এখানে একটা অনর্থক বিতণ্ডার সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোর্‌আন ও হাদিছ হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা নবী বা রছুল নহেন—এরূপ সাধু ও সাধ্বী নর-নারী নিজেদের তপস্যার ফলে আল্লার নিকট হইতে বাণী ও প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হজরত মূছার জননীর প্রতি আল্লাহ 'অহি' করিয়াছিলেন, মৌমাছিদিগের প্রতিও তিনি অহি করিয়াছেন, এ সব প্রমাণ কোর্‌আনেই আছে। ফলতঃ অহি ও প্রেরণা পাইলেই নবুয়ত পাওয়া হয় না। নবীদিগকে হেদায়তের বিশেষ মিশন দিয়া প্রেরণ করা হয়।

২৬০ সাধনার স্বরূপ :—

উপরে বিবি মৰ্‌য়মকে নির্ব্বাচন করার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য অনতিবিলম্বে বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করিতে চলিয়াছে। তাই বিবি মৰ্‌য়মকে অধিকতর তাকিদ সহকারে উপাসনায় তন্ময়-তদ্গত থাকার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কারণ, এই উপাসনাই হইতেছে মানবের সকল প্রকার আত্মশুদ্ধি ও মানসিক বিকাশের প্রধানতম অবলম্বন। গর্ভধারিণীদের ক্রিয়াকর্ম্ম, চিন্তা ও মানসিক ভাব-ধারার যথেষ্ট প্রভাব গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর পড়িয়া থাকে, এ জন্য ঐ অবস্থায় তাঁহাদের আরও সাবধান হওয়া দরকার। তাই সাত্ত্বিকতার আব-হাওয়ার মধ্যে নিজকে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলার জন্য বিবি মৰ্‌য়মের প্রতি আবার এই

তাকিদ দেওয়া হইতেছে। আলোচ্য উপাখ্যানটী পাঠ করার সময় কোর্‌আনের এই পরোক্ষ শিক্ষার প্রতিও ভাবী-সন্তানের জনক-জননীদের বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত।

উপাসনার জন্য প্রথম আবশ্যক 'কনূতের।' বিনীতভাবে কাহারও অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়াকে 'কনূৎ' বলা হয়। এই কনূতের বা বিনীত-আত্মসমর্পণের পূর্ণ পরিণত অবস্থা হইতেছে সেজদা বা সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত। ইহা অপেক্ষা নিজকে অধিক অবনত করার সাধ্য মানুষের নাই। এই অবস্থায় মাটির উপর মাথা রাখিয়া সে সমস্ত দেহ ও মন দিয়া আল্লার হুজুরে নিজের বিনয় ও আত্মসমর্পণের একরার করিতে থাকে।

আয়তের শেষভাগে বিবি মরয়মকে "রুকু'কারী-লোকদিগের সহিত রুকু' করিতে" আদেশ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। রুকু' করা—ভাবার্থে নামাজ বা উপাসনা সম্পাদন করাকে বুঝাইতেছে। আমি অনুবাদে ঐ ভাবার্থই গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশে বিবি মরয়মকে পুরুষদিগের সহিত জামাতের নামাজে বা সঙ্ঘ-উপাসনায় যোগদান করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এছলাম নারীদিগকে সঙ্ঘ-উপাসনা হইতে বিরত থাকার আদেশ কোন যুগেই প্রদান করে নাই। এছলামের শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময় স্ত্রীলোকেরা অবাধে জুম্‌আ-জমাআতে উপস্থিত হইতেন। এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকে ঈদ্‌গাহে উপস্থিত করার জন্য হজরত বিশেষ তাকিদও করিয়াছেন। অবশ্য, উপাসনায় যোগদান আর উশৃঙ্খল নরনারীর বিলাস ভ্রমণ যে এক নহে, সর্ব্বদর্শী মোহাম্মদ মোস্তফা সে সম্বন্ধেও উম্মতকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

২৬১ 'কলম' নিক্ষেপ করা ... ইত্যাদি :—

'গএব' অর্থে যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (৫ টীকা দেখ)। আম্বা, নাবাউন শব্দের বহুবচন, উহার অর্থ কোন বিশেষ বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ইহার পূর্ব্বে হজরত ঈছা ও তাঁহার গর্ভধারিণী বিবি মরয়ম সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য কোর্‌আনে প্রকাশিত হইয়াছে, ৪৩ আয়তে তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। আয়তটী Parenthetical বা অনন্বিত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'লটারি' করিয়া সকল প্রকার বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করার এবং লটারীর ফলকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করার প্রথা এহুদীপণ্ডিত-পুরোহিতদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে প্রচলিত ছিল।* তিরের উপর বিভিন্ন নাম লিখিয়া সেগুলিকে একত্রে মিশাইয়া দেওয়া হইত, তাহার পর লটারীর মত তাহা হইতে একটী তির বাহির করিয়া লওয়া হইত। যাহার নাম বাহির হইত, সকলে তাহার অনুকূলে নিজ নিজ দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। হজরতের সমসাময়িক আরবদিগের মধ্যেও এই প্রকার তির দ্বারা লটারি করার প্রথা প্রচলিত ছিল—এবং এই লটারির তিরগুলিকে "আকলাম"ও বলা হইত।

---

* বাইবেলের পরিভাষায় ইহাকে গুলিবাট বলা হয়। দেখ লূক ১—৯ প্রভৃতি।

কিন্তু যেহেতু আকলাম কলমেরও বহুবচন এবং উহার অর্থ লেখনীও হইতে পারে, সুতরাং একদল রাবী এই সহজ স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক ব্যাপারটাকে পরিত্যাগ করিয়া, এই উপলক্ষে নানা প্রকার অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক গল্পগুজব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন এবং সেগুলিকে কোর্‌আনের তফছিরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—মর্‌য়মের তত্ত্বাবধান-ভার কে গ্রহণ করিবে—ইহা লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, পুরোহিতরা অবশেষে নিজেদের লেখনীগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। অন্য সমস্ত পুরোহিতের লেখনী নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু হজরত জাকারিয়ার কলম চলিল স্রোতের প্রতিকূল দিকে। এই অস্বাভাবিক প্রমাণবলেই সকলে অবশেষে তাঁহার দাবী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কোর্‌আনের তফছিরে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া লইতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না বলিয়াই এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন বাজে গল্পগুলির আবিষ্কার করা হইয়াছে। তবে তফছিরকারগণের মধ্যে সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সুখের বিষয়।

বিবি মর্‌য়ম ও হজরত ঈছার প্রকৃত ইতিহাস দুন্‌য়া হইতে লোপ পাইয়াছিল। হজরতের আবির্ভাবকালে একদল লোক, বিনা-পিতায় জন্ম বলিয়া ক্রমে ক্রমে হজরত ঈছাকে ঈশ্বরের পুত্র ও স্বয়ং পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া দাবী করিতেছিল। বিবি মর্‌য়ম পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেও তাহারা ঈশ্বররূপে পূজা করিতেছিল। ঠিক ইহার বিপরীত, অন্য দলের চরমপন্থীরা ঐ বিনা-পিতায় জন্মলাভের অজুহাতেই হজরত ঈছাকে জারজ ও তাঁহার মাতাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া অভিসম্পাৎ করিতেছিল। আল্লাহ্ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, অহিদ্বারা এই উভয় দলের অতিরঞ্জন ও অপবাদের ভিত্তিহীনতা প্রকাশ করিয়া, প্রকৃত অবস্থা অবগত করাইয়া দিতেছেন।

বিবি মর্‌য়মের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করার জন্য এই বাদ-বিসম্বাদ কখন ঘটিয়াছিল, তাহার সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কএক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। একদল বলিতেছেন—এই বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল বিবি মর্‌য়মের শৈশবকালে—সর্ব্বপ্রথমে মন্দিরে নিবেদিত হওয়ার সময়। অন্যদের মতে ইহা তাঁহার মন্দিরে অবস্থান করার সময়কার ঘটনা। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিবি মর্‌য়ম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁহার তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে এই প্রকার কলহ আরম্ভ হইয়াছিল।

আমি এই শেষোক্ত মতটাকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, বিবি মর্‌য়মের জন্ম, শৈশবে মন্দিরে নিবেদিত হওয়া, মন্দিরে অবস্থান করা প্রভৃতি ঘটনাগুলি কোর্‌আনে যথাক্রমে পরপর বর্ণিত হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করার সময় হইতে জাকারিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথাও আমরা যথাস্থানে (৩৬ আয়তে) অবগত হইয়াছি। সেই সময়কার ভারগ্রহণ সম্বন্ধে এই বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া থাকিলে, ঐ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ হওয়াই উচিত ছিল। তাহা না করিয়া এই বিসম্বাদের বর্ণনা করা হইতেছে ৪৩ আয়তে। অথচ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব-আয়তে বিবি মর্‌য়মের প্রতি উপাসনা ও নামাজের আদেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করা

হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ৪৩ আয়তে বর্ণিত বিসম্বাদের ঘটনার পূর্ব্বে বিবি মরয়ম বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। কারণ, এই প্রকার আদেশ নাবালেগার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধারণ বিবেক অনুসারে সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পূর্ব্ব আয়তে ইহাও জানা যাইতেছে যে, এই বিসম্বাদের ঘটনার পূর্ব্বে হজরত মরয়ম প্রত্যক্ষভাবে আল্লার নিকট হইতে অহিপ্রাপ্ত হইতেছেন। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী ৪৪ আয়তে তাঁহাকে গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এই আনুসঙ্গিক প্রমাণগুলি স্পষ্টতঃ বলিয়া দিতেছে যে, এই বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল বিবি মরয়মের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর।

মন্দিরে নিবেদিতা কুমারিগণ কস্মিনকালেও বিবাহিত হইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা তখনকার এহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। পল (Paul) স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতেছেন যে, ঐরূপ কোন ঐশিক নিষেধাজ্ঞার কথা তিনি অবগত নহেন (1 Cor. ৭ অধ্যায়)। মরয়ম-জননী কন্যাকে নিবেদন করার সময় মরয়মের সন্তান-সন্ততিবর্গের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং আল্লাহ তাঁহার সে প্রার্থনা মনজুরও করিতেছেন—এই ছুরার ৩৫ ও ৩৬ আয়তে আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। নিবেদিতা কুমারীদিগের বিবাহ এহুদী-শাস্ত্র-অনুসারে নিষিদ্ধ হইলে, মরয়ম-জননী কখনও তাঁহার (মরয়মের) সন্তান কল্পনাই করিতে পারিতেন না।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবি মরয়ম বিবাহিত হইয়াছিলেন এবং যীশু ব্যতীত তাঁহার আরও কতকগুলি পুত্র কন্যা ছিল। মথি ১—১৬ পদে যোসেফকে স্পষ্ট ভাষায় মেরীর স্বামী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। * লুক ৩—২৩ পদে বলা হইয়াছে :— And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph which was the son of Heli. বাইবেলের বিখ্যাত টীকাকার স্কট এই পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন :— ······ but as the names of men alone, or chiefly, stood in the public registers ; so the name of Joseph, not that of Mary, must have been inserted. It is therefore added that Jesus was *supposed* to be the son of Joseph, which may refer to the legal constitution, as well as to the common opinion of the Jews, as he was born of Mary after she was married to Joseph.

এই বৃত্তান্তগুলি একত্রে স্মরণ রাখার পর, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর, বিবি মরয়মের 'তত্ত্বাবধান'-ভার গ্রহণ করার তাৎপর্য্য কি হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে এহুদী-সমাজের মধ্যে কলহ ও বিসম্বাদের কি কারণ ঘটিতে পারে ? সকল দিক বিবেচনা করিয়া এবং আলোচ্য আয়তের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আয়তগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রশ্নের উত্তর

* Ency. Bibl. Art. Clopas প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, এই বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল কুমারী-মরয়মের বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া। কে মরয়মকে বিবাহ করিবে অথবা এই বিবাহে সম্প্রদানের ভার কে গ্রহণ করিবে, এই সব লইয়াই তখন মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে অবস্থানকালীন তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা সকলেই অবগত হইয়াছিলেন এবং হজরত জাকারিয়া ও অন্য সকলে আশা করিতেছিলেন যে, এছরাইল-জাতির মুক্তিদাতা বহু দিনের অপেক্ষিত সেই 'মছিহ্' বিবি মরয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই কারণে তাঁহার প্রতি সকলের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল বিসম্বাদের প্রকৃত হেতু।

২৬২ ক'লেমা :—

ক'লেমা শব্দের আভিধানিক অর্থ বাক্য। এখানে ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তফছিরকারগণ যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, এমাম এবনে জরির সে সমস্তের উল্লেখ করার পর অকাট্য সাহিত্যিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উহা আরবী-ভাষার একটী ইডিয়ম, উহার অর্থ সংবাদ বা সন্দেশ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ক'লেমা শব্দ মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে আভিধানিক অর্থ লক্ষ্য হইলে اسمه শব্দে সর্ব্বনাম 'হু' না আনিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'হা' ব্যবহার করা হইত (৩—১৮৫)। এমাম রাগেব বলিতেছেন :—

فكل قضية تسمى كلمة سواء كان ذلك مقالا او فعلا

অর্থাৎ—"ফর্ম্মান বা decree মাত্রকেই ক'লেমা বলা হয়—তা সে বাক্যতঃ হউক আর কার্য্যতঃ হউক।" হজরত ঈছার জন্ম সম্বন্ধে আল্লার যে ফরমান, ফয়সালা, নির্দ্দেশ বা decree পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত ছিল, আলোচ্য স্থলে বিবি মরয়মকে সেই ফরমানের সংবাদ দেওয়া হইতেছে। অনুবাদে এই দুইটী প্রমাণের অনুসরণ করা হইয়াছে।

খৃষ্টানপণ্ডিত-পুরোহিতরা নানা বিকার ও বিপ্লবের পর এই 'বাক্য'-শব্দকে যীশুর 'অনাদি স্বরূপ' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ক'লেমার প্রতিশব্দরূপে বাইবেলের গ্রিক-অনুবাদে Logos শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাইবেল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, গ্রিক-দার্শনিক Heraclitus ও Philo প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া যীশুর পরবর্ত্তী খৃষ্টানগণ, বিশেষতঃ যোহন, খৃষ্টান-ধর্ম্মে এই মতবাদটী ঢুকাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে Chritianising of the Logos conception বলিয়া উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাইবেলিকা-বিশ্বকোষের লেখক * এই Logos সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

Exept in the prologue to the Fourth Gospel, the biblical usage of * * shows no peculiarity ; it means a complex of words (* *), presented in the unity of a sentence or thought: The entire gospel can be called 'the logos of God', or even simply the logos. এই প্রবন্ধের

* J G. Adolf D. D Art. Logos.

উপসংহারে লেখক আরও বলিয়াছেন :—The church, unfortunately, even so early as in the second century, began to give greater attention to this philosophical element in the gospel of 'the divine' than to the historical features of the narrative, and the employment of the idea of the logos in this maner, occasioned by this author ...... became a source of danger to Christianity.

খৃষ্টান-পণ্ডিতগণ এইরূপে কলেমা বা বাক্য শব্দের যে বিকৃত অনুবাদ করিয়াছেন, এবং গ্রিক-দার্শনিকদিগের অনুকরণ করিয়া যোহন এই অনুবাদে যীশুর অবতারত্বকে যেরূপ অন্যায় ভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সব জানা সত্বেও আমাদের মিশনারী বন্ধুরা এই কলেমা শব্দকে অবলম্বন করিয়া বলিতে চান যে, কোরআনও যীশুর অনাদি ও অবতার হওয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য এই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। বস্তুতঃ এখানে 'কলেমা'-শব্দ ব্যবহার করিয়া যোহন প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত বিকারের মূল ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, দৃঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যীশু শাশ্বত ও স্বয়ম্প্রকাশ নহেন। সর্ব্বশক্তিমান আল্লার নির্দ্দেশ অনুসারে, অন্য মানবদিগের মত, তাঁহাকেও জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

২৬৩ মছিহ :—

মছিহ ম-ছ-হ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আরবী সাহিত্যে উহার অর্থ—স্পর্শ করা, গমন করা, সৎকথার দ্বারা কাহাকে প্রবঞ্চিত করা, দেশ পর্য্যটন করা, কোন বস্তু হইতে তাহার গুণকে দূরে করিয়া দেওয়া—ইত্যাদি। রোগী সম্বন্ধে প্রার্থনা করা হয় مسح الله ما بك من علة ইহার অর্থ হয় ازالها و عافاك 'আল্লা তোমার রোগ অপসারিত করিয়া দিন!' তেল ও পানির দ্বারা তাহাকে মছহ করিল—অর্থাৎ হাত দিয়া তাহার গায়ে তেল ও পানি মাখাইয়া দিল। —লেছান, রাগেব, কামুছ, জওহারি প্রভৃতি।

ইহার প্রত্যেক অর্থকে অবলম্বন করিয়া হজরত ঈছার 'মছিহ'-উপাধির একএকটা তাৎপর্য্য তফছিরের বিভিন্ন রাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন—যেহেতু হজরত ঈছা সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন, এই জন্য তাঁহাকে মছিহ বলা হইয়াছে। মছিহদাজ্জাল সম্বন্ধেও এই প্রকার তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে হজরত ঈছার বাম চোখ ও দাজ্জালের দক্ষিণ চোখ কাণা বলিয়া তাঁহাদের উভয়কে মছিহ উপাধি দেওয়া হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন—হজরত ঈছা অসৎকর্ম্ম সম্পাদনের এবং দাজ্জাল সৎকর্ম্ম সম্পাদনের শক্তি হইতে বঞ্চিত, এই জন্য তাঁহাদিগকে মছিহ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে

(রাগেব, মনছুর, কবির প্রভৃতি)। কাদিয়ানীরা বলিতেছেন—হজরত ঈছা অসাধারণভাবে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন—সিরিয়া হইতে কাশ্মিরে আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে মছিহ বলা হইয়াছে।

আমার মতে, কেবল আরবী-সাহিত্য লইয়া এই তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে না। হজরত ঈছা ও তাঁহার মাতা যে আরামীয় ভাষায় কথা বলিতেন, 'মছিহ' মূলতঃ সেই ভাষার শব্দ। অন্ততঃপক্ষে ইহাকে উভয় ভাষার একটা সাধারণ শব্দ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আরামীয় ও ইব্রিয় ভাষায় উহার অর্থ করা হইয়াছে the anointed বলিয়া। আরবী-সাহিত্যে কাহাকে তৈলসিক্ত করাকেও 'মছহ' বলা হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তফছিরের রাবীরা 'মছিহ' শব্দের যে সব তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহার একটীতে দেখা যাইতেছে যে

سمى مسيحا لانه كان ممسوحا بدهن طاهر مبارك يمسح به الانبياء -

অর্থাৎ, যে পবিত্র তৈলদ্বারা নবীগণকে সিক্ত করা হয়, হজরত ঈছা সেই তৈলসিক্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে মছিহ বলা হয় (কবির ২—৬৭৫)। ফলতঃ মছিহ-শব্দের অর্থ দাঁড়াইতেছে —তৈলসিক্ত বা anointed ব্যক্তি। ইহার অর্থ "তৈল মর্দ্দন করা, to consecrate, especially a king, priest or prophet by unction, or the use of oil;—"*Anoint* Hazel to be King of Syria." প্রতিষ্ঠাপিত করা, বিশেষতঃ রাজা, পুরোহিত অথবা কোন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে অভিমন্ত্রিত তৈল, অভ্যঞ্জন বা বিলেপন মর্দ্দনদ্বারা, অভিসংস্কৃত বা প্রতিষ্ঠাপিত করা।" ফলতঃ হজরত ঈছা আল্লাহ কর্ত্তৃক এছরাইল-বংশের মুক্তিদাতা নবী-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মছিহ-শব্দের ভাবার্থ ইহাই।

সমসাময়িক এহুদীরা হজরত ঈছাকে يوسف نجار বা সূত্রধর যোসেফের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত, তখনকার সরকারী কাগজ-পত্রেও যোসেফের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম রেজেষ্টি করা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ প্রথা অনুসারেও পিতার নামই এ সব ক্ষেত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত অবস্থা সত্ত্বেও এখানে হজরত ঈছার পিতার নাম না করিয়া বলা হইতেছে "ঈছা-এবনো-মর্‌য়ম" বা মর্‌য়মের পুত্র ঈছা। পক্ষান্তরে, আমি যতদূর অবগত আছি, কোর্‌আনে অন্য কোন নবীর নামের সঙ্গে তাঁহার পিতৃপরিচয়ও দেওয়া হয় নাই। অথচ এখানে হজরত ঈছার নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতৃপরিচয়ের উল্লেখ বিশেষরূপে করা হইতেছে।

হজরত ঈছা সম্বন্ধে এই সব ব্যতিক্রমের কারণ কি ?—এই প্রশ্নের মীমাংসাও এখানে হওয়া উচিত। আমাদের তফছিরকারগণ বলিতেছেন—'যেহেতু হজরত ঈছা বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার মাতার নামই এক্ষেত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।' সাধারণ-সংস্কারের সঙ্গে এই মতটী বেশ খাপ খাইয়া যায়। সুতরাং বাহ্যতঃ এই মতটী সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মবিচার-ক্ষেত্রে এই যুক্তির বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ 'হজরত

ঈছা বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'—কোর্‌আনের কুত্রাপি এই বৃত্তান্তটী (অন্ততঃ) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। আমরা যতদূর জানি, হজরত রছুলে করিমের একটী হাদিছেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মানুষের বিনা-পিতায় জন্মলাভ করা একটা আশ্চর্য্য ও অসাধারণ ব্যাপার। মুছলমানদের পক্ষে এই ব্যাপারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া ধর্ম্মের হিসাবে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইলে, কোর্‌আনে বা হাদিছে স্পষ্টভাষায় তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'হজরত ঈছা বিনা-পিতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'—এই দাবীটাই বিচার সাপেক্ষ। সুতরাং তাহার উপর অন্য যুক্তি বা সিদ্ধান্তের ভিত্তিস্থাপন কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

এহুদীরা যে-মছিহের অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি যে দাউদ-বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত হইত। এই দাউদ-বংশ প্রমাণ করার জন্য লূক যীশুকে যোষেফের পুত্র বলিয়া স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়াছেন :—আর যীশু ...... যেমন ধরা হইত, যোষেফের পুত্র (৩—২৩)। মথি যোষেফকে মরয়মের স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (১—৬)। সুতরাং যীশুর জীবনকালে, এমনকি মথি, লূক প্রভৃতি 'সুসংবাদ'-লেখকগণের সময় পর্য্যন্ত, মরয়ম যোষেফের স্ত্রী বলিয়া এবং যীশু যোষেফের পুত্র বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছেন। সরকারী দফতরেও যীশু যোষেফের পুত্র বলিয়া লিখিত হইতেন, স্কটের মন্তব্য হইতে একটু পূর্ব্বে (২৬১ টীকা) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ প্রাথমিক যুগে এ সম্বন্ধে কোন মতভেদই ছিল না। এ সম্বন্ধে বিবাদ বিতণ্ডার সূত্রপাত হয় যীশুর পরলোক গমনের কিছুকাল পরে, খৃষ্টানদিগের অতিরঞ্জন ও এহুদীদিগের অনুষ্ঠিত তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে। তখন যীশুর ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করার জন্য খৃষ্টানেরা বলিতে লাগিলেন—তিনি কুমারী মেরীর গর্ভে বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যদিকে এহুদীরা রটাইয়া দিতে লাগিল যে, জনৈক সৈনিকের সহিত ব্যভিচারের ফলে মেরীর গর্ভ হয় এবং যীশু সেই গর্ভের সন্তান। * হজরতের সমসাময়িক এহুদী ও খৃষ্টানরা সকলেই মোটের উপর এই দুই মত পোষণ করিত। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও বলিতেছেন :—'ইতিহাসের ছাত্রবর্গকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যীশুর পিতার নাম 'exteremely uncertain' বা চরমভাবে অনিশ্চিত। † কিন্তু মেরি যে দাউদ-বংশসম্ভূতা এবং তিনিই যে যীশুর গর্ভধারিণী, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তাই এই সব বিতণ্ডা ও বিসম্বাদের দিকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া, কোর্‌আন সকল দলের সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমতদ্বারাই হজরত ঈছার সত্যকার পরিচয়টা দুন্‌য়ার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যমান অভক্তি ও অতিভক্তির সমস্ত অসঙ্গত সংস্কারের প্রতিবাদ করিতেছে। এহুদীরা হজরত ঈছাকে জারজ-সন্তান বলিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, এবং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া

---

* 'According to the Talmud and according to the Celsus Jesus was the child of the adulterous intercourse of Mary with a soldier Stada or Pandera. Bib. Col 29683 Jesus Christus in Talmud প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। † ঐ।

বলিতে লাগিল যে, তিনি এই কারণে নবী হওয়ার অনধিকারী। অধিকন্তু, শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, বানি-এছরাইলের মুক্তিদাতা মছিহ দাউদ-বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কোরআন এই সব কারণে হজরত ঈছাকে এবনো-মরয়ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

২৬৪ নবী বা সাধুসজ্জনগণ :—

এই আয়তের ও ইহার পরবর্ত্তী আয়তের শেষভাগে হজরত ঈছাকে "আল্লার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত-দিগের" এবং "সাধুসজ্জনগণের" মধ্যকার একজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত ঈছা অতি-মানব নহেন, অন্য নবী রছুলগণের তুলনায় তাঁহাতে কোন অসাধারণ গুণ বা শক্তি ছিল না, এই সত্যটী এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। অধিকন্তু ধর্ম্মজগতে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন মানব-সমাজের মধ্যে যে সব সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল কারণটীর প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে। তাহারা সকলে নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে আল্লার একমাত্র বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের নবীকেই একমাত্র সত্য-নবী বলিয়া বিশ্বাস করে এবং দুন্‌য়ার অন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রতি মিথ্যার আরোপ করে। খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে এই রোগটী অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া আছে। তাই নজরাণের যাজকদিগের সম্মুখে পুনঃপুন বলা হইতেছে যে, হজরত ঈছার ন্যায় সাধুসজ্জন দুন্‌য়ায় আরও অনেক আছেন। তিনি একমাত্র নবী নহেন, বরং অন্যান্য বহু নবীগণের মধ্যে তিনিও একজন নবী।

২৬৫ "মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ় অবস্থায়"—কথা বলা :—

হজরত ঈছার জন্ম সম্বন্ধে বিবি মরয়মকে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে এবং এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, তিনি মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ়বয়সে লোকদিগের সহিত কথা কহিবেন। এই উক্তির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা কি, সে সম্বন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশ রাবীর মতে এই আয়তে হরজত ঈছার এক অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে সব শিশুই'ত কথা কহিয়া থাকে। তবে হজরত ঈছা তাহাদের মত দুইচারিটা বা আধআধ কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং তিনি ঐ শৈশবকালে এহুদীদিগের সহিত তর্ক করিয়া তাহাদের ভ্রমপ্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া আবার তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। একদল বলিতেছেন—হজরত ঈছা বিনা-পিতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এহুদীরা তাঁহার মাতার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিল। সদ্যজাত শিশু হজরত ঈছা তেজদীপ্ত ভাষায় এহুদীদিগের এই অন্যায় দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। হজরত ঈছা শৈশবে কথা বলিবেন বলিয়া এই ভাবী ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর একদল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—ইহা অসঙ্গত কথা। হজরত ঈছা এহুদীদিগের নিকট যাহা বলিয়াছেন, ছুরা মরয়মে ৩০—৩৩ আয়তে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

এই আয়ত অনুসারে হজরত ঈছা এহুদীদিগকে বলিয়াছেন—"আমি আল্লার বান্দা ; আল্লাহ আমাকে কেতাব প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী করিয়াছেন" ...... "আমাকে যাবজ্জীবন নামাজ পালনের ও জাকাতদানের আদেশ করিয়াছেন" ... ইত্যাদি। এই হইল শৈশবে কথা বলার তাৎপর্য্য। প্রৌঢ় বয়সে কথা বলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, একখানা বাঙ্গলা তফছির হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন :—"৪০ হইতে ৬০ বৎসর বয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে کہل প্রৌঢ় বলা হয়। হজরত ঈছা (আঃ) ৩৩ বৎসর বয়সে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন ... এবনো-জরির ... উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আখিরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবিত থাকিবেন।"

তফছিরকারগণের আর একদল এই আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তফছির কবির হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

ان المراد منه بيان كونه متقلباً فى الاحوال من الصبا الى الكهولة و التغير على الاله تعالى محال - و المراد منه الرد على وفد نجران فى قولهم ان عيسى كان الها -

অর্থাৎ—আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, হজরত ঈছা শৈশব হইতে প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবেন—অথচ ঈশ্বরে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সুতরাং এই সদাপরিবর্ত্তনশীল যীশু ঈশ্বর কখনই হইতে পারেন না। নাজরান ডেপুটেশনের যাজকগণ খৃষ্টের ঈশ্বর হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন। এই দাবীর প্রতিবাদ করাই আয়তের উদ্দেশ্য (কবির ২— ৬৭৭)। আমরা এই মতটাকে আয়তের একটা সঙ্গত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। অন্য মতের অসঙ্গতি সম্বন্ধে দুইএকটা যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) হজরত ঈছা শৈশবে তাঁহার মাতার প্রতি আরোপিত কলঙ্ক স্খালনের জন্য কথা কহিয়াছিলেন—ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, কোর্‌আন ও হাদিছের কুত্রাপি এই ধারণার অনুকূল কোন বর্ণনা নাই। সুতরাং এই প্রকার ভিত্তিহীন বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(খ) দ্বিতীয় মতটাও যুক্তিসহ নহে। তাঁহারা ছুরা মর্‌য়মের ৩০—৩৩ আয়তের বরাত দিয়া হজরত ঈছার যে উক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শৈশবকালীন উক্তি কখনই হইতে পারে না। কারণ, উহাতে হজরত ঈছা বলিতেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে নামাজ পড়ার ও জাকাত দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন'—সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরকার উক্তি। কারণ, দুগ্ধপোষ্য নাবালগদিগের প্রতি নামাজ বা জাকাত ফরজ হইতে পারে না। এখানে হজরত ঈছা আরও বলিতেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে কেতাব প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী করিয়াছেন।' সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই হজরত ঈছার ইঞ্জিল পাওয়ার ও নবী হওয়ার পরকার ঘটনা। মাতৃক্রোড়ে শায়িত সদ্যজাত শিশু নবীও হইতে পারে না, কেতাবও পাইতে পারে না। সুতরাং শৈশবের ঘটনা ইহা কখনই নহে।

(গ) প্রৌঢ় বয়সের সীমা নির্দ্ধারণ করা হইতেছে—৪০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে। হজরত ঈছা ৩৩ বৎসর বয়সে 'আসমানে সমুত্থান' করিয়াছেন, ইহাও এই মতবাদীরা স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং আছমানে সমুত্থিত হওয়ার সময় হজরত ঈছার প্রৌঢ়তার সীমান্তদেশে উপনীত হইতেও আর ৭ বৎসর বাকি ছিল। কাজেই তখন পর্য্যন্ত হজরত ঈছার 'প্রৌঢ় বয়সে কথা বলার' আর কোন সুযোগই থাকিতেছে না। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন যে, হজরত ঈছা "অচিরে" আবার দুনয়ায় অবতীর্ণ হইবেন ও লোকদিগের সহিত কথা কহিবেন। তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে কথা বলার এই ভবিষ্যদ্বাণী তখন সফল হইবে। কিন্তু, হজরত ঈছার 'আছমানে সমুত্থিত' হওয়ার পর, ১ হাজার ৯ শত ৩৪টী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান সনে তাঁহার বয়স (১৯৩৪+৩৩=) ১৯৬৭ বৎসর হইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁহাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে ৬০ বৎসর হইল, কহ্‌ল বা প্রৌঢ় বয়সের শেষ সীমা। অতএব ১৯৬৭ বৎসর বয়সের কোন মানুষকে প্রৌঢ় বলা যাইতে পারে না। ইহার পর তিনি আবার দুনয়ায় আসিয়া কথা কহিলেও তাহাকে তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের কথা বলিয়া কখনই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে না। তাহার পর, উদ্ধৃত রেওয়ায়তে দেখা যাইতেছে যে, 'আসমানে সমুত্থিত' হওয়ার পর, হজরত ঈছা আবার 'অচিরে দুনয়ায় আসিবেন'। কিন্তু, দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, অচিরের এই চিরাচরিত আশা আজও সফল হইল না!

আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে যতটুকু বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তফছির কবির হইতে উদ্ধৃত অভিমতটী সঙ্গত হইলেও, উহা আয়তের একমাত্র তাৎপর্য্য নহে। আয়তে গৌণভাবে নাজরাণের খৃষ্টান-যাজকদিগের প্রতিবাদ সন্নিবেশিত আছে—সত্য, কিন্তু এই উক্তি করা হইয়াছে যীশু-জননী বিবি মরয়মকে পুত্রের খোশ্‌খবর দেওয়ার সময়। সুতরাং পুত্রের সহিত মাতার আগ্রহ ঔৎসক্যের সম্বন্ধ এবং স্নেহ ও বাৎসল্যের আকর্ষণ প্রবলতর হইয়া উঠিবে যে বিপদের সময়, আয়তে জননী মরয়মকে সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়কার সান্ত্বনার সুসংবাদও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। বলা হইতেছে—শিশু যীশু যেমন শৈশবে আধআধ কথা কহিয়া মায়ের কাণে সুধা বর্ষণ করিবেন, যৌবনকালেও তাঁহার অমীয় বাণী শ্রবণ করিয়া দুঃখিনী জননীর হৃদয় তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিবে। আর এই সময় পুত্রের প্রতি যে বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন—যীশুকে হত্যা করার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পুত্র বাঁচিয়া থাকিবেন এবং প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত কথা কহিয়া মায়ের কলিজা ঠাণ্ডা করিবেন—এহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে না, এবং তিনি জননীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনও কখন হইবেন না। জননীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার যথেষ্ট আবশ্যকও এখানে ছিল। কারণ, বাইবেল পাঠে ইহার বিপরীত ধারণাই মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া-যায় *। সেই জন্য ছুরা মরয়মে (৩২ আয়তে) হজরত ঈছার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* মথি ১২—৪৮ পদ ও বাইব্লিকা বিশ্বকোষ Mary প্রভৃতি।

২৬৬ **কুমারীর সন্তান :—**

হজরত ঈছার বিনা-বাপে পয়দা হওয়া সম্বন্ধে এই আয়তটী প্রধান প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইয়া থাকে। বিবি মর্য়ম, সন্তান হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বলিতেছেন—'আমার সন্তান হইবে কিরূপে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই!' ছুরা মর্য়মের বর্ণনায় এই সময় তিনি বলিতেছেন—"আমার পুত্র হইবে কিরূপে?—অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই আর আমি ব্যভিচারিণীও নহি!" (২০)। ব্যভিচার ব্যতীত সন্তান হওয়া সম্ভবপর একমাত্র বিবাহিত অবস্থায়—স্বামীসঙ্গের দ্বারা। এই হিসাবে, 'আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই'-পদের অর্থ হইতেছে :—"আমার বিবাহ হয় নাই।" তফছিরকাররাও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন (কবির ৫—৭৮১ প্রভৃতি)।

আল্লাহ তাআলা সর্ব্বশক্তিমান। প্রকৃতির বিধি-ব্যবস্থা তাঁহারই রচিত, প্রকৃতির অধীন তিনি নহেন। সুতরাং ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির স্বভাবও তিনি বদলাইয়া দিতে পারেন, স্বরচিত প্রাকৃতিক বিধানের বিপর্য্যয়ও তিনি ঘটাইতে পারেন। এ সব কথা আমরা জানি ও মনে প্রাণে বিশ্বাসও করিয়া থাকি। ফলতঃ আল্লাহ হজরত ঈছাকে বিনা-বাপে পয়দা করিতে পারেন কি না, এখানকার প্রশ্ন তাহা একেবারেই নহে।

বিশ্বমানবের চিরাচরিত সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, মাতৃগর্ভে জীবের অভ্যুদয় পিতার সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হয় না। দুন্য়ার সমস্ত বিজ্ঞান একবাক্যে ইহার সমর্থন করিতেছে। মানব-সৃষ্টির এই সাধারণ ধারা সম্বন্ধে কোর্আনও স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিতেছে :—

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ـ

"আমরা সমগ্র মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি মিশ্র-বীর্য্য হইতে" (দহর ২)।

خلق الانسان من نطفة ـ

"সমগ্র মানবকে তিনি বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (নহল ৫)।

و بدأ خلق الانسان من طين ـ ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ـ

"আল্লাহ মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে। অতঃপর ঘনিত জলের (=বীর্য্যের) সারভাগ হইতে তাহার বংশ (রক্ষার ব্যবস্থা) করিয়াছেন" (ছজদা ৮)।

এই মর্ম্মের আরও অনেক আয়ত কোর্আন শরিফে বিদ্যমান আছে। এই সব আয়ত হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুন্য়ার সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে কোর্আন অস্বীকার করে নাই, বরং সম্পূর্ণভাবে তাহার সমর্থনই করিয়াছে। দুন্য়ার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সমস্ত বিজ্ঞানের সহিত একমত হইয়া কোর্আনও ঘোষণা করিতেছে যে, পিতার শুক্রকীট হইতে ও পিতামাতার শোনিত ও শুক্রের সংমিশ্রণেই মানবের জন্ম হইয়া থাকে, এবং ইহাই হইতেছে মানবসৃষ্টির চিরাচরিত ও সর্ব্বব্যাপী ঐতিহাসিক বিধান। সুতরাং হজরত ঈছাকেও এই বিধানের অধীন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা উচিত।

একশ্রেণীর লোক এখানে আল্লাহ তাআলার সর্ব্বশক্তিমানত্বের দোহাই দিয়া বলেন যে, ঐ আয়তগুলি হইতে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিপন্ন হইতেছে—সত্য, কিন্তু হজরত ঈছার সৃষ্টি একটা বিশেষ বিধান। ক্ষেত্রবিশেষে ঐরূপ বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহা খুবই সঙ্গত কথা। কিন্তু আইনের বর্জ্জিত বিধিটাও সেই আইনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। কোর্‌আন ব্যাপকভাবে বলিয়া দিতেছে যে, পিতৃশুক্রের সাহায্য দ্বারাই মাতৃগর্ভে মানবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। হজরত ঈছা এই নিয়মের বহির্ভূত হইলে, কোর্‌আনের অন্ততঃ একটী স্থানেও সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইত। ত্রিশপারা কোর্‌আন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও, "ঈছা বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন"-এরূপ কোনও উক্তি তাহার কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং হজরত ঈছাকে 'বিনা-বাপে জন্ম' বলিলে কোর্‌আনের বর্ণিত আল্লার স্পষ্ট, স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মকে অস্বীকার করা হইবে।

কোর্‌আনে এইরূপ কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকিলেও, আমাদের কতিপয় লেখক কোন কোন আয়তের কোন কোন শব্দ হইতে পরোক্ষভাবে এই দাবীটী সপ্রমাণ করার জন্য কতকগুলি অতি-ভ্রান্ত ও আনুমানিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত ঈছার জন্ম সংক্রান্ত সকলদিগের সম্পূর্ণ আলোচনা, ছুরা মর্য়্যমের তফছিরেই সঙ্গত হইবে। এখানকার আবশ্যক অনুসারে দুইএকটা কথার উল্লেখ করিয়া উপস্থিতের মত ক্ষান্ত হইব।

সন্তানের সুসংবাদলাভের পর বিবি মর্য়্যম বলিয়াছিলেন—আমার বিবাহ হয় নাই বা কোন পুরুষে আমাকে স্পর্শ করে নাই—এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবে কিরূপে? অন্যপক্ষের আলেমগণ বলিতেছেন, এই আয়ত হইতেই হজরত ঈছার বিনা-বাপে পয়দা হওয়ার স্পষ্টপ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কারণ, পুরুষের স্পর্শ ব্যতীতই যে বিবি মর্য়্যমের সন্তান হইবে, আয়ত হইতে তাহা বেশ সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। আমাদের মতে এই দাবীটী আদৌ যুক্তিসহ নহে। আরবী ব্যাকরণের একটা সর্ব্ববিদিত সূত্র এই যে "لم تقلب المضارع ماضيا منفيا" অর্থ—ল'ম্ আসিয়া মোজারে'কে মাজী মন্‌ফীতে পরিণত করিয়া দেয়। অতএব لم يمسسنى ক্রিয়ার স্পষ্ট অর্থ:—যখন এই সংবাদ দেওয়া হইতেছে, তাহার পূর্ব্বে কোন পুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই—এই কথাই বিবি মর্য়্যম বলিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে, অতীতকালে, কোন কাজ হয় নাই বলিলে, ভবিষ্যতে কোন কালেও তাহা হইতে পারিবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ফেরেশ্‌তার কথা শুনিয়া বিবি মর্য়্যমের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমানের এই অবিবাহিত অবস্থাতেই তিনি পুত্রবতী হইবেন। ছুরা মর্য়্যমে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরেশ্‌তা বিবি মর্য়্যমকে বলিতেছেন— إنما انا رسول ربك ، لا هب لك غلاما زكيا

"আমি তোমার প্রভুর সন্নিধান হইতে প্রেরিত হইয়াছি—তোমাকে একটী শুদ্ধ পুত্র প্রদান করিতে" (১৯ আয়ত)। ইহাতে বিবি মর্য়্যম মনে করিলেন, বর্ত্তমানের এই অবিবাহিত

অবস্থাতেই সন্তান হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইতেছে। তাই তিনি আল্লার হুজুরে প্রশ্ন করিয়া নিজের সংশয় মোচন করিয়া লইতেছেন। পাঠক দেখিয়াছেন, হজরত জাকারিয়াকে পুত্রলাভের সংবাদ দেওয়া হইলে তিনিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমার সন্তান হইবে কিরূপে ?—আমি'ত বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী হইতেছেন বন্ধ্যা !" পুত্রের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল আল্লার পক্ষ হইতে এবং হজরত জাকারিয়া নিজেও একজন নবী ছিলেন। সুতরাং আল্লার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়ার পর তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্তান হওয়া সুনিশ্চিত। তবুও তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, অথচ এই প্রশ্নের অজুহাতে এখানে কোন আজগয়বী কল্পনার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না! ঠিক এইরূপ বিবি মর্‌য়মও প্রশ্ন করিতেছেন এবং উভয় প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ একই ভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, পুত্রলাভের পক্ষে বর্ত্তমানের যে বাধা, আল্লাহ তাহা অপনোদিত করিয়া দিবেন।

ইহা ব্যতীত অন্যপক্ষের আর যে সব দলিল-প্রমাণ আছে, বাঙ্গলার জনৈক প্রধান তফছিরকারের ভাষায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন :—

(ক) বিবি মর্‌য়মের প্রশ্নের উত্তরে "হজরত জিব্রাইল বলিয়াছিলেন—খোদা বিনা-পুরুষ-সঙ্গমে নিজ 'কোন্' বাক্যদ্বারা তাহাকে সৃষ্ট কবিবেন।" কোন্ বাক্য সংক্রান্ত আলোচনা একটু পরেই করা হইবে। এখানে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, "বিনা পুরুষ সঙ্গমে"—এই কথাগুলি লেখক নিজের পক্ষ হইতে কোর্‌আনের অনুবাদে যোগ করিয়া দিয়াছেন, ঐরূপ কোন শব্দ বা পদ মূল আয়তে নাই।

(খ) "ছুরা মর্‌য়মে আছে, এহুদীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল ...... এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত ছাহেবের কথা ঠিক হইলে, হজরত জিবরাইলের উত্তরের কি অর্থ হইবে ? যদি হজরত মর্‌য়ম বিবাহিত হইতেন এবং স্বামী কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইতেন, তবে এহুদীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ করিয়াছিল কেন ?" এহুদীরা বিবি মর্‌য়মের প্রতি ব্যভিচারের দোষারোপ করিয়াছিল, ছুরা মর্‌য়মের কোন্ আয়ত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়, এখানে তাহার উল্লেখ করা লেখকের খুবই উচিত ছিল। তিনি দাবী করিয়াছেন, প্রমাণ দেন নাই। আমাদের মতে ছুরা মর্‌য়মে ঐরূপ মর্ম্মের কোন আয়ত নাই। ঐ ছুরার ২৭—২৮ আয়ত হইতে এইটুকু জানা যাইতেছে যে, বিবি মর্‌য়ম হজরত ঈছাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসার পর এহুদীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল :—

يا مريم لقد جئت شيأ فريا - يا أخت هارون ما كان ابوك امرا سوء و ما كانت أمك بغيا

শাব্দিক অনুবাদ :—"হে মর্‌য়ম তুমি এক গুরুতর বা আশ্চার্য্য বস্তু আনয়ন করিয়াছ। হে হারূনের ভগ্নি! তোমার পিতা দুর্জ্জন ছিলেন না, এবং তোমার মাতাও ভ্রষ্টা ছিলেন না।" এখানে বিবি মর্‌য়মের আনীত বস্তুকে প্রথম আয়তে فری বলা হইয়াছে মাত্র। অভিধানকারগণের মতে উহার অর্থ—(১) عجیب বা আশ্চার্য্যজনক কোন বস্তু, (২) عظیم বা কোন

গুরু বিষয়, (৩) الامر المختلق المصنوع। বা অভিনব ব্যাপার বিশেষ (জওহারী, রাগেব, কবির প্রভৃতি)। কাজেই ছুরা মরয়মের আয়ত অনুসারে, এহুদীরা বিবি মরয়মের প্রতি কোন একটা অভিনব গুরু ব্যাপার সঙ্গে করিয়া আনার অভিযোগ করিয়াছিল, ব্যভিচারের দোষারোপ করে নাই। বিবি মরয়মের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ হইলে এহুদীরা শাস্ত্রীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তাঁহাকে পাথর মারিয়া নিহত করিত, সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যভিচারী পুরুষকে ঐ প্রকার দণ্ড দেওয়ারও প্রয়াস পাইত। নবীর পুত্র নবী হজরত য়াহ্য়া (John the baptist)কে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হত্যা করিতে তাহারা একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইল না। স্বয়ং হজরত ঈছার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে, চোর ডাকাতের সঙ্গে তাঁহাকে ক্রুশে ঝুলাইয়া দিতে, তাহাদের একটুও বাধা হইল না। আর এত বড় একটা ব্যভিচারের অভিযোগে তাহারা বিবি মরয়মের দণ্ডদানের চেষ্টা একবারও করিল না, ইহার কারণ কি ? অন্যদিকে, হজরত ঈছার নবী ও মছিহ হওয়ার দাবীকে এহুদীরা অস্বীকার করিতেছে, অন্যরূপ অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে দণ্ডিত করিতেছে। কিন্তু কেহ একথা একবারও বলিতেছে না যে, 'তুমি জারজ, অতএব তাওরাতের ব্যবস্থা অনুসারে তুমি নবী হইতে পার না।' হজরত ঈছার নবুয়ত অস্বীকার করার এই সহজ উপায়টা তাহারা কেন অবলম্বন করে নাই? অথচ তাওরাতের স্পষ্ট বিধান এই যে, ব্যভিচারজাত পুত্র, এমন কি তাহার দশমপুরুষ পর্য্যন্ত নবী হইতে পারে না ( )।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, 'হজরত ঈছা বিনা-বাপে পয়দা হইয়াছেন'-কোরআনের কুত্রাপি এরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, হজরত রছুলে করিমের কোনও হাদিছ হইতেও ঐ দাবীর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না—অন্ততঃ আমি বহু চেষ্টা করিয়া এবং অন্য মতের আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ মর্ম্মের কোন হাদিছের সন্ধান পাই নাই। বরং যে নজরান-ডেপুটেশনের যাজকদিগের কথার প্রতিবাদ করার জন্য আলে-এমরান ছুরার আলোচ্য আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখা যায় যে, 'হজরত ঈছা বিনা-বাপে পয়দা হইয়াছেন—সুতরাং তিনি অতি-মানুষ', ডেপুটেশনের পাদ্রী-প্রধানগণই হজরতের সম্মুখে এই শ্রেণীর তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। সে সময় হজরত তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন—

الستم تعلمون ان عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبي ... قالوا بلى - قال فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟

অর্থাৎ—যেরূপ অন্য সব স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারণ করে, যীশুকেও একটী স্ত্রীলোক সেইরূপেই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; তাহার পর অন্য সব স্ত্রীলোকেরা যেমন করিয়া সন্তান প্রসব করে, যীশু-জননীও সেইরূপেই তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন ; অতঃপর অন্য সব শিশুরা যেমনভাবে খাদ্যগ্রহণ করিয়া থাকে, যীশুও সেই ভাবে খাদ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কি সত্য নহে ? যাজকেরা উত্তরে বলিল—হাঁ। তখন হজরত বলিলেন—তাহা হইলে এ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা

ঠিক হয় কি করিয়া ? (জরির ৩—১০৯)। হজরত রছুলে করিমের এই উক্তি হইতে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্যান্য লক্ষ কোটি নারীর যেরূপে গর্ভ হয়, বিবি মর্য়মের গর্ভও সেইরূপে এবং সেই স্বাভাবিক উপায়েই হইয়াছিল। অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভ হইলে বিবি মর্য়মকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না, প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে হইত না, দীর্ঘকাল ধরিয়া শিশুযীশুকে স্তন্য দিয়া বাঁচাইতে হইত না। সম্ভবতঃ বিবি মর্য়মের এই স্বাভাবিক গর্ভধারণ প্রমাণ করার জন্যই তাঁহার গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসব-বেদনার কথা ছুরা মরয়মে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

খৃষ্টান-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই Virgin birth বা মেরীর কুমারী অবস্থায় সন্তান প্রসবের অভিনব ধারণার উপর। কিন্তু এই ধারণাটী যে বাইবেলের সাক্ষ্য অনুসারেও কতদূর ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন, পাশ্চাত্য মনীষীদিগের আলোচনা পড়িলে তাহা নিঃসন্দেহরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। এই মনীষীরা সকলে সমবেত কণ্ঠে বলিতেছেন যে, Virgin birth বা কুমারীর সন্তান প্রসবের এই থিউরীটা প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানদের বিদিত ছিল না, বাইবেল হইতে তাহা সপ্রমাণও হয় না। তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর যে শব্দটাকে উপলক্ষ করিয়া শেষকালে এই থিউরীটার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা এক প্রমাদের উপর আরএক প্রমাদের ভিত্তি স্থাপন করার ন্যায় একটা হাস্যকর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, মূলে তাওরাতে যে Alma শব্দ আছে, তাহা "Speeks merely of a young woman, not of a virgin" তাহার অর্থ একটী তরুণী নারী, কুমারী-অর্থ তাহার কখনই হইতে পারে না। ছুরা মর্য়মের তফছিরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ বাইব্লিকা ও অন্যান্য বিশ্বকোষে, Joseph (husband of Mary), Son of man, Nativity, Clopas, Immanuel, Mary প্রভৃতি সন্দর্ভ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

২৬৭ "কুন্—হউক !" :—

হজরত ঈছা আল্লাহ তাআলার কুন্-বাক্য হইতে পয়দা হইয়াছেন—খুব ঠিক কথা। কিন্তু ইহা হজরত ঈছার কোন বিশেষ অধিকার নহে, আর তাঁহার বিনা-বাপে পয়দা হওয়াও ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হয় না। কারণ বিশ্বচরাচরের সমস্ত সৃষ্টিই এই 'কুন্'-হইতে সম্পন্ন। ছুরা বকরায় বলা হইয়াছে :— بديع السموت و الارض ، و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون —

"গগনমণ্ডল ও ধরাধামের উদ্ভাবক তিনি, যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, তৎসম্বন্ধে বলেন—'কুন্' বা 'হউক !' অমনি তাহা হইয়া যায়" (১১৭)। কুন্-বাক্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন—এই অজুহাতে হজরত ঈছাকে বিনা-বাপে পয়দা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে দুন্য়ার প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক জীবকে, বিনা-বাপে পয়দা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সে সমস্তও হজরত ঈছার ন্যায় কুন্-বাক্য হইতে পয়দা !

২৬৮ কেতাব, হেক্‌মত প্রভৃতি :—

এখানে কেতাব-অর্থে লিখন, হেকমত সকল প্রকার শিক্ষা ও প্রজ্ঞার ব্যাপক অর্থবাচক—তফ্‌ছিরকারগণ সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অসঙ্গত নহে। তবে আমাদের মতে "আল্‌-কেতাব"-অর্থে হজরত ঈছার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত আছমানী কেতাব, এই অর্থ গ্রহণ করা অধিক সঙ্গত। তাঁহার পূর্ব্বে বানিএছরাইল-বংশীয় নবীদিগের প্রতি, তাওরাত ব্যতীত আরও অনেক কেতাব নাজেল করা হইয়াছিল, হজরত ঈছা সে সমস্তই শিক্ষা করিয়া ছিলেন। অতঃপর আবার বিশেষ করিয়া তাওরাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য।

২৬৯ হজরত ঈছার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ :—

৪৮ আয়তের ورسولا الى بنى اسرائيل বা 'রছুলরূপে বানিএছরাইলের পানে'-পদটী পর্য্যন্ত মর্‌য়মের প্রতি আল্লার বাণী, তাহার পর হইতে ৫০ আয়তের শেষ পর্য্যন্ত, বানিএছাইলের প্রতি হজরত ঈছার উক্তি। বর্ণনা-ভঙ্গিমার পরিবর্ত্তনে এই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে এবং এই জন্যই এখানে উহ্য স্বীকার করা সকলে সঙ্গত মনে করিয়াছেন। অতএব ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই হঠাৎ ভঙ্গিপরিবর্ত্তনের একটা কিছু উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

হজরত ঈছার নিজ মুখের উক্তি এখানে তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করা হইতেছে এবং বর্ণনা ধারার পরিবর্ত্তন করিয়া এ বিষয়টী সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়াও হইতেছে। ইহার মধ্যে যে গূঢ় তথ্য আছে, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে হজরত ঈছার জীবন চরিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার জীবন-ইতিহাস সঙ্কলকগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে কোন কারণে হউক, যীশু-খৃষ্ট জনসাধারণের মধ্যে নিজের মতপ্রচার করিতেন Allegorical বা রূপকভাবে। বাইবেল হইতেও ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন হইয়া যাইতেছে। মথি বলিতেছেন :—
"And the disciples came, and said unto him, why speakest thou unto them in parables ? (10) He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the Kingdom of heaven, but to them it is not given. (11) Therefore speak I to them in parables. (13)" "All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them. (34)" "But without a parable spake he not unto them: And when they were alone, he expounded all things to his disciples. (Mark 4—34)."
বাইবেলের এই সাক্ষ্য হইতে জানা যাইতেছে যে, যীশু জনসাধারণের মধ্যে রূপক উপমা উদাহরণের মধ্য দিয়া কথা বলিতেন—রূপক ব্যতীত কথা বলিতেন না। এমন কি, তাঁহার উক্তিগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার হাওয়ারী বা অন্তরঙ্গ শিষ্যদের পক্ষেও অনেক

সময় সম্ভবপর হইত না। এ জন্ম বাড়ী গিয়া তিনি তাহার মর্ম্ম শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।

আমাদের মতে হজরত ঈছার ভাষার এই বৈশিষ্ট্যটা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্মই এখানে বর্ণনার এই বিশেষ ধারাটী অবলম্বিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই উক্তির অর্থ গ্রহণ করার সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব তাহার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা এছলামের শাস্ত্রীয়-সাহিত্যের আর একটী নীতি ও নিয়মের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মোহকাম্ ও মোতাশাবেহ্ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, কোর্‌আনে এরূপ বহু শব্দ ও আয়ত আছে, সাহিত্যের হিসাবে যাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। পক্ষান্তরে বাহ্যতঃ উহার বিপরীত শব্দ ও আয়তও অনেক আছে। এই হিসাবেই মোহকাম ও মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে—অর্থাৎ মোতাশাবেহ আয়তগুলি হইতে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যাহা মোহকাম আয়তগুলির স্পষ্ট তাৎপর্য্যের বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। অন্যদিকে কোরআনে তাওহীদ, রেছালৎ ও অন্য বহু বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই নীতিগুলি এছলামের ভিত্তি স্বরূপ। কোরআনের কোন শব্দের বা আয়তের এরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যাহাদ্বারা এই মৌলিক নীতিগুলির বিপর্য্যয় ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই শ্রেণীর নিয়ম অনুসারে মৌলিক বা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া, কোরআনের অনুবাদে বহু স্থলে معنی مجازی ভাবার্থ বা গৌণার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন, কোরআনের বহু স্থলে দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বহুবচনাত্মক সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। আরবীতে তিন বা ততোধিক না হইলে বহুবচন হয় না। তাহা হইলে, ঐ আয়তগুলি হইতে কি প্রতিপন্ন হইবে যে, খোদা অন্ততঃ তিন জন? না, কখনই নহে। কারণ, একদিকে আমরা দেখিতেছি যে, আল্লাহ যে একমাত্র ও অদ্বিতীয় এবং তিনি যে একাধিক হইতেই পারেন না, ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপে কোরআন শত শত আয়তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে। অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে, বহুবচনাত্মক শব্দগুলির তাৎপর্য্যে সংখ্যাগত আধিক্যই সর্ব্বত্র উদ্দিষ্ট হয় না, বরং গুরুত্ব ও মহিমা প্রতিপাদনের জন্য সম্মানার্থে এ সব ক্ষেত্রে গৌণার্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'আল্লাহ তিন বা ততোধিক'—এইরূপ তাৎপর্য্য কোন মুছলমানই গ্রহণ করেন না, বরং করাকেই কোরআনের অর্থবিকার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আলোচ্য আয়তের তাৎপর্য্যও ঠিক এই ভাবেই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ বাইবেলের সাক্ষ্য হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, হজরত ঈছা জনসাধারণের কাছে রূপক ভাষায় এবং উপমা-উদাহরণের মধ্য দিয়াই কথা বলিতেন। সেই রূপকগুলি এমন দুর্ব্বোধ্য হইত যে, শিষ্যরা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিতেন না, হজরত ঈছা বাড়ী আসিয়া তাঁহাদিগকে ঐ উক্তিগুলির

তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইতেন। কোরআনও এখানে আসিয়া হঠাৎ বর্ণনাভঙ্গির পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, আলোচ্য উক্তিটী হজরত ঈছার নিজের সেই রূপকভাষাতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সত্য দুইটীকে যুগপৎভাবে স্মরণ রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

পাঠক দেখিতেছেন, আলোচ্য আয়তে হজরত ঈছার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহার তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে—সৃষ্টি করার, জড়কে প্রাণদান করিয়া তাহাকে জীবে পরিণত করার, এবং মৃতকে জীবনদান করার শক্তি হজরত ঈছার ছিল। তফছিরের রাবীরা বলিতেছেন—হজরত ঈছার এই শক্তি ছিল, এবং বাস্তবে তিনি ঐরূপ করিয়াও দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন :—

(১) "যখন হজরত ইছা নবুয়তের দাবী করিয়া অলৌকিক কার্য্যাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় য়িহুদিরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বাদুড়- পক্ষী প্রস্তুত করিয়া দিতে বলায়, তিনি কর্দ্দম লইয়া উহার আকৃতি গঠন করিয়া উহার মধ্যে ফুৎকার করিলেন, অমনি উহা শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল।"

(২) "অহাব বলিতেছেন, যতক্ষণ লোকেরা উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহা উড়িয়া যাইত। আর যখন উহা তাহাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত, মৃত অবস্থায় পতিত হইত।"

(৩) "একদল লোক বলিয়াছেন, তিনি বাদুড় ভিন্ন অন্য পক্ষী গঠন করেন নাই। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি বিবিধ প্রকার পক্ষী গঠন করিয়াছিলেন।"

(৪) "এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, হজরত ইছা এক দিবস মক্তবে বালকদিগের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি কর্দ্দম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য ইহা হইতে পক্ষী প্রস্তুত করিব কি ? তাহারা বলিল, তুমি কি ইহা করিতে পার ? ...... তৎপরে তিনি উহা একটী পক্ষীর আকৃতি করিয়া ফুৎকার প্রদান করতঃ বলিলেন, উহা খোদার হুকুমে পক্ষী হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার হস্তদ্বয়ের মধ্য হইতে উড়িয়া গেল। বালকেরা উহা শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিল এবং লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল।"

এই উক্তিগুলি যুক্তির হিসাবে অবিশ্বাস্য, কোরআনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও তাহার মৌলিক নিয়মের হিসাবে অগ্রাহ্য। ইহা যে যুক্তির হিসাবে অবিশ্বাস্য, তাহার কএকটা কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি :—

(ক) প্রথম উদ্ধৃতাংশটী পাঠ করিলে মনে হয় যে, উহা এমাম রাজীর অভিমত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। এই গল্পটী উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে এমাম ছাহেব روي ان বা "কথিত আছে যে" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং উহা এমাম ছাহেবের উদ্ধৃত একটী কিম্বদন্তি মাত্র, তাঁহার উক্তি বা অভিমত ইহা কখনই নহে।

(খ) এই বিবরণগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। রাবীরা বহু শতাব্দী পরে এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। অথচ কোন্ সূত্রে তাঁহারা যে এ সব কথা অবগত হইলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কোর্‌আন ও হাদিছেও কুত্রাপি এই সব গল্পের উল্লেখ নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে ঐগুলি একেবারে ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

(গ) এই গল্পগুলি পরস্পর বিপরীত বিবরণে পরিপূর্ণ, একটী সত্য হইলে অন্যটী মিথ্যা হইয়া যায়। প্রথম উদ্ধৃতাংশ অনুসারে, হজরত ঈছা নবুয়তের দাবী করার—সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার—পর এহুদীদিগের আহ্বান মতে এই "পক্ষী গঠন" করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ৪র্থ গল্পে দেখা যাইতেছে, ইহা হজরত ঈছার বাল্যকালের ঘটনা। সহপাঠীদের সহিত খেলা করিতে করিতে তিনি নিজের এই সৃষ্টিশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(ঘ) তৃতীয় বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ লোকেরা পাখীর দিকে "দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহা উড়িয়া যাইত। আর যখন উহা তাহাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত, উহা মৃত অবস্থায় পতিত হইত।" অতএব তাহার মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই কোন মানুষই দেখিতে পায় নাই। কারণ, রাবীদের বর্ণনা অনুসারে, লোকদের দৃষ্টিগোচর থাকার সময়'ত তাহা উড়িয়াই বেড়াইত।

হজরত ঈছার এই উক্তিটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এখন আমাদিগকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার পূর্ব্বে আয়তের কএকটী শব্দের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। ঐ সব শব্দ ও তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে যথাক্রমে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) اخلق — খ-ল-ক ধাতু হইতে সম্পন্ন। উহার অর্থ সৃষ্টি করা ও পরিমিতরূপে নির্ম্মাণ করা, উভয়ই হইয়া থাকে। 'আল্লার' সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে, 'মৌলিক সৃষ্টি'-অর্থে উহার ব্যবহার হইতে পারে না। মানুষের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে, উহার অর্থ হইবে—গঠন করা, নির্ম্মাণ করা, পরিমিত আকারে গঠন করা, সঙ্কল্প করা অথবা মিথ্যা সৃষ্টি করা (লেছান, রাগেব, প্রভৃতি)। এই জন্য সকলেই এখানে اخلق শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—নির্ম্মাণ করিব, প্রস্তুত করিব। কাঠকে বিশেষ পরিমাপ ও আকার দিয়া টেবিলরূপে গঠন আমরা করিতে পারি, কিন্তু কাঠের সৃষ্টিকর্ত্তা আমরা কখনই হইতে পারি না। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মত, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করার কোন আবশ্যক নাই।

(২) لكم — তোমাদের জন্য=তোমাদের উপকারের জন্য। হজরত ঈছা রছুলরূপে প্রেরিত হইতেছেন যাহাদের নিকট ও রেছালতের যে মিশন লইয়া, সেই মিশনের দিক দিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধিত হইবে যে-গঠনের দ্বারা, সেইরূপ একটা গঠনের সংবাদই এই আয়তে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অবোধ শিশুদিগের নিকট প্রদর্শিত অনর্থক কোন কাজের বা কোন ছেলেখেলার উল্লেখ নিশ্চয়ই আয়তে করা হয় নাই।

(৩) طين তীন—আরবী সাহিত্যে তীন শব্দের অর্থ—জলসিক্ত মৃত্তিকা বা কর্দ্দম, সহজাত বৃত্তি, جوهر যে যে মৌলিক অবদান দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়-তাহা (طينة الرجل خلقه و جبلته)। কোরআনে, হাদিছে ও সাধারণ আরবী সাহিত্যে এই সব অর্থে তীন-শব্দের প্রযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেছানুল্-আরব, মজমাউল্-বেহার ও লেন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলেও তীন (Tin) শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে দেখিতেছি, সদাপ্রভু বানিএছরাইল-জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin. (1—25) বাঙ্গলা বাইবেলে এই 'টিন' শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে 'সীঁসা' বলিয়া। কিন্তু উহার আভিধানিক অর্থ—"that which is separated' (from precious metal)"—মূল্যবান ধাতব পদার্থ হইতে যাহা স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা হয় (Biblica, 'Tin')। এই 'টিন' শব্দটী মূলতঃ কোন্ ভাষার শব্দ, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল Webster বলিতেছেন "...... of unknown origin"—উহার মূল অজ্ঞাত। হিব্রু অনুবাদে بديل শব্দ আছে, উহার অর্থ—মূলে যে বস্তু ছিল, তাহার স্থলে অন্য যে বস্তুকে স্থাপন করা হয়-তাহা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন বস্তুর মধ্যে ভাল বা মন্দ যে সব অবদান থাকে, আরবীতে তাহাকেও 'তীন' বলা হয়। ভেজাল বা মেকি রৌপ্যের মধ্যে, মূল ধাতুর পরিবর্ত্তে তাহার স্থলে কতকটা তামা, সীসা প্রভৃতি খাদ মিশাইয়া দেওয়া হয়। ঐ খাদগুলিও সেই ভেজাল রূপার অবদান, সুতরাং তাহার 'তীন'। পাঠকের স্মরণ আছে—আলোচ্য আয়তে বস্তুতঃ হজরত ঈছার উক্তিই অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, বাইবেলের Tin ও بديل শব্দের সহিত আরবী তীন-শব্দের এই অর্থের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং এখানে من الطين পদের অর্থ 'মাটি হইতে' না হইয়া তাহাদের "মিশ্রিত সদাসৎ অবদান হইতে"-এইরূপ হওয়াই সঙ্গত হইবে। পরের আলোচনায় এই অর্থটী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য এখানে বাইবেলের একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি :—

"আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য সন্তান, ইস্রায়েল-কুল আমার কাছে খাদস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা সকলে হাফরের মধ্যে পিত্তল, দস্তা, লৌহ ও সীস স্বরূপ; তাহারা রৌপ্যের খাদস্বরূপ হইয়াছে। অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা সকলে খাদস্বরূপ হইয়াছ, এই জন্য দেখ, আমি তোমাদিগকে যিরূশালেমের মধ্যে একত্র করিব। যেমন লোকে অগ্নিতে ফুঁ দিয়া গলাইবার জন্য রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ, সীস ও দস্তা হাফরের মধ্যে একত্র করে তদ্রূপ আমি ...... তোমাদিগকে একত্র করিব, এবং তথায় রাখিয়া গলাইব।...ফুঁ দিব, তাহাতে তোমরা তাহার মধ্যে গলিয়া যাইবে (যিহিষ্কেল ২২, ১৮-২০ পদ)।

(৪) طير তএর—বহুবচন, একবচন তা'এর, একবচনেও কখন কখন উহার ব্যবহার হয়। উহার অর্থ—উড্ডীয়মান হওয়া, যে উড্ডীয়মান হয়;—পাখী, মানুষের কর্ম্ম; বিনয়ী, দুর্ব্বলচিত্ত (timid), ইত্যাদি (লেছান, বেহার, জওহারী, রাগেব)।

গীতসংহিতা ৮৪-৩ পদে বলা হইয়াছে—"সত্য চটক পক্ষী এক কুলায় পাইয়াছে, খঞ্জন পক্ষী নিজ শাবক রাখিবার এক বাসা পাইয়াছে; তোমার বেদিই সেই স্থান, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, আমার রাজন আমার ঈশ্বর।" এই পদে পাখীর ও পাখীর বাসার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে বাইবেলের ব্যাখ্যাতারাও প্রথম প্রথম অনেক গোলে পড়িয়াছিলেন। শাব্দিক অনুবাদ লইলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হজরত দাউদের সময় চটক বা খঞ্জন পক্ষীরা যেরূশেলমের মন্দিরের মধ্যে সদাপ্রভুর বেদীর উপর বাসা করিয়া ছিল এবং সেই সব বাসাতেই তাহারা নিজেদের শাবকগুলির লালন পালন করিত। কিন্তু এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না * বলিয়া ভাবার্থ ও গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। Bp. Horne এই পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন :—

It is evidently the design of this passage to intimate to us, that in the house, and at the altar of God, a faithful soul findeth freedom from fare and sorrow, quiet of mind, and gladness of sprit, like a bird that have secured a little mansion, for the reception and education of her young. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বিশ্বাসী আত্মা ঈশ্বরের মন্দিরে ও তাঁহার বেদিতে মুক্ত, প্রশান্ত ও নিশ্চিন্তভাবে আত্মিক পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে, এখানে আমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ পাখী দ্বারা এখানে মানুষের বিশ্বাসী আত্মাকেই বুঝাইতেছে। পাঠককে এখানে আরও জানাইয়া রাখিতেছি যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে হিব্রু صيفور শব্দ 'is with only two exeptions rendered bird' দুইটী মাত্রস্থান ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'পক্ষী' বলিয়া অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য পদে sparrow বা খঞ্জন বলিয়া এই অনুবাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই; Bp. Lowth, the sparrow স্থলে "Rather, the dove" বলিয়া টীকা দিয়াছেন। ফলতঃ ঐ শব্দের অর্থ পাখী। উপক্রম উপসংহার হিসাবে উহার শ্রেণী বা প্রকার নির্ণয় করা সম্ভব হইলে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথায় পাখী বলিয়াই উহার অর্থগ্রহণ করা হইবে। হোশেয় ১১শ অধ্যায়ের ৭ আয়তে বাঙ্গলা বাইবেলে বলা হইতেছে—তাহারা মিসর দেশ হইতে চটক পক্ষীর ন্যায় ... আসিবে। কিন্তু আরবী বাইবেলে সেই স্থলে আছে—و يطيرون مثل الطاير من مصر 'তাহারা মিসর হইতে পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিবে। এইরূপে কপোত (বা পাখী), (usally to be symbolical of Israel) রূপকভাবে এছরাইল-কুল সম্বন্ধে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Bib. 'Dove')।

* Schott. বাইব্রিকার লেখকও উহাকে Very doubtful interpretation বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) نفخ **নফ্খ**—ইহার অর্থ ফুৎকার করা। কোন সৎপ্রেরণা বা অসৎপ্রবৃত্তিকে কাহারও মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকেও আরবী সাহিত্যে ভাবার্থে 'নফ্খ' বলা হয়। হাদিছেও এইরূপ ব্যবহার যথেষ্ট আছে। যেমন শয়তান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

اعوذ بك من همزه و نفثه و نفخه

"হে আল্লাহ!···আমি শয়তানের ফুৎকার হইতে বাঁচিবার জন্য তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি!" শয়তান যে সত্যসত্যই মানুষকে ধরিয়া তাহার নাকে মুখে 'ফুঁ' দিতে থাকে এবং সেই ভয়ঙ্কর ফুৎকারের জন্য মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়, এরূপ কথা কেহই বলেন না। বরং 'শয়তানের ফুৎকার' অর্থে 'মানুষের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি বা দুষ্ট প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তোলা'—এই অর্থ সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। হাদিছের টীকাকারদের মধ্যে অনেকেই এখানে শয়তানী ফুৎকারের অর্থ করিয়াছেন—'মানব মনের অহমিকতা'। ফলতঃ মানুষের অন্তরে যে কোন প্রকারের প্রেরণা ও প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাকেও 'নফ্খ' বলা যাইতে পারে। ফুৎকার দ্বারা পরীক্ষার ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইবে এবং তাহার তাপে এছরাইল-কুলের খাদ ও খাঁটি বাছাই হইয়া যাইবে,—এই পদে, ফুৎকার করা অর্থে পরীক্ষার আগুনকে প্রবলতর করিয়া তোলা। হাফর, অগ্নি ও ফুৎকার প্রভৃতি এখানেও নিশ্চয়ই রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরের তাৎপর্য্যগুলি সঙ্গত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাবার্থে আয়তের তাৎপর্য্য এইরূপ দাঁড়াইবে—যীশু বলিলেন, হে এছরাইল-কুল! তোমাদের প্রকৃতিগত মূল অবদান (তীন) হইতে আবার তোমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় একটা মহাজাতিরূপে গঠনের চেষ্টা করিব, এজন্য প্রথমে গঠন করিব—জাতির কাল্‌বুদ মাত্রকে। তাহার পর সেই কাল্‌বুদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেরণা প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাকে আল্লার অনুমতিক্রমে এক মুক্ত জীবন্ত ও উর্দ্ধগতি উন্নতিমুখী জাতিতে পরিণত করিয়া দিব। এই মিশন ও এই সাধনা লইয়াই আমি প্রভুর সন্নিধান হইতে তোমাদিগের সমীপে প্রেরিত হইয়াছি।

শেখ মহিউদ্দীন এবনে-আরবী ছুফী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পীর-মুর্শিদদিগের দ্বারা সাধারণতঃ الشيخ الاكبر শেখুল্‌-আকবর বা 'প্রধানতম গুরু' বলিয়া কথিত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন। আলোচ্য আয়তের তফছিরে তিনি বলিতেছেন :—

(انى اخلق لكم) بالتربية و التزكية و الحكمة العملية من طين نفوس المستعدين الناقصين (كهيئة الطير) الطاير الى جناب القدس من شدة الشوق (فانفخ فيه) من نفث العلم الالهى و نفس الحيوة الحقيقية بتاثير الصحبة و التربية (فيكون طيراً) اى نفساً حية طايرة بجناح الشوق و الهمة الى جناب الحق - (و ابرئ الاكمه) المحجوب عن نور الحق الذى لم تنفتح عين بصيرته قط ··· (و الابرص) المحجوب نفسه بمرض الرذايل و العقايد الفاسدة و محبة الدنيا و لوث الشهوات بطب النفوس (و احيى)

موتی الجهل بحیاة العلـــم (و انبئکم بما تأکلـــون) تتناولون من مباشرت الشهوات و اللذات (و ما تدخرون فی بیوتکـــم) ای فی بیوت غیربکـــم من الدواعی و الذیات -
(ص ٥٥ جلد اول)

(৬) اکمه **আক্‌মাহ ও** ابرص **আবরাছ**—সকল প্রকারের অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিকে 'আক্‌মাহ' বলা হয়। ইহা ব্যতীত বুদ্ধিভ্রষ্ট ও ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকেও 'আক্‌মাহ' বলা হইয়া থাকে (কামুছ, রাগেব, মাওয়ারেদ প্রভৃতি)। আব্‌রাছ শব্দের অর্থ—শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত রোগী। এই পদে হজরত ঈছা বলিতেছেন—আমি অন্ধদিগকে দৃষ্টিদান করিব, কুষ্ঠীদিগকে নিরাময় করিব। উভয় কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনাধারার প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, এই শ্রেণীর বর্ণনাগুলিতে অন্ধতা অর্থে দৈহিক অন্ধতা নহে, রোগ অর্থে শারীরিক ব্যাধি নহে, এবং তাহার চিকিৎসা ও নিরাময় করাও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ এই সকল স্থলে অন্তরের অন্ধকার, বিবেকের অন্ধতা, আত্মার ব্যাধি এবং নবিগণ কর্ত্তৃক তাহার আধ্যাত্মিক চিকিৎসাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। ছুরা বকরার ১৮ আয়তে কপটদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— صم بکـــم عمی فهـم لا یرجعـــون "**বধির, মূক ও অন্ধ** তাহারা, অতএব তাহারা আর ফিরিবে না।" এখানে যে দৈহিক বধিরতা, মূকতা বা অন্ধতা উদ্দেশ্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কোর্‌আনের আরও বহু সংখ্যক আয়তে এই সমস্ত আধিব্যাধি ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার মধ্য হইতে দুইএকটা উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

(১) ছুরা আ'রাফের ৬৪ আয়তে হজরত নূহের উম্মৎ সম্বন্ধে বলা হইতেছে— انهم کانوا قوماً عمین নিশ্চয় তাহারা ছিল এক **অন্ধজাতি**।

(২) আম্বিয়া ৪৫ আয়তে বলা হইতেছে—

قل انما انذرکم بالوحی - و لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون

(হে পয়গাম্বর !) বলিয়া দাও, আমি'ত আল্লার প্রেরিত বাণীদ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই মাত্র, কিন্তু **বধির** (সমাজ) সে আহ্বান শ্রবণ করে না—যখনই তাহাদিগকে সতর্ক করা হউক।

(৩) ছুরা আহকাফের ২৬ আয়তে আ'দ-জাতির পরিণাম সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

... و جعلنـــا لهم سمعاً و ابصاراً و افئدة ' فما اغنی عنهم سمعهم و لا ابصارهم افئدتهم و لا من شیئ ...

আর তাহাদিগকে আমরা **কর্ণ** দিয়াছিলাম, **চক্ষু** দিয়াছিলাম ও হৃদয় দিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাদের সেই কর্ণ ও চক্ষুগুলি অথবা তাহাদের হৃদয় সমূহ তাহাদের একটুকুও উপকার করিতে পারে নাই ......।

(৪) ছুরা ইউনুছের ৪২ ও ৪৩ আয়তে বলা হইতেছে :—"তাহাদের মধ্যকার কতিপয় লোক যাহারা তোমার কথা **শ্রবণ** করে—কিন্তু তুমি কি **বধির**দিগকে শুনাইবার চেষ্টা করিয়া, যদিও তাহারা জ্ঞান গত করিতে না চায়। আবার, তাহাদের মধ্যকার কতিপয় লোক তোমার পানে **তাকাইয়া** থাকে, কিন্তু তুমি কি **অন্ধ**দিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবা—যদি-না তাহারা দর্শন করে।

এই উদাহরণ কয়টী হইতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, অহির পরিভাষায় এ সব ক্ষেত্রে দৈহিক নহে, বরং আধ্যাত্মিক আধিব্যাধি এবং তাহার চিকিৎসাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। ছুরা বানি-এছরাইলের ৮২ আয়তে বলা হইয়াছে :—

و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

"এবং আমরা কোর্‌আনের এমন বাণী সমূহ প্রকাশ করিতেছি—যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য রহমৎ ও 'শেফা' …।" ছুরা ইউনুছের ৫৭ আয়তে বলা হইতেছে :—

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور ،
و هدى و رحمة للمؤمنين

"হে মানব! তোমাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে এক মহা উপদেশ ও অন্তরস্থ (বিষয়) গুলির 'শেফা' সমাগত হইয়াছে, আর তাহা হইতেছে বিশ্বাসীদিগের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমৎ স্বরূপ।" প্রথম আয়তে আল্লার বাণীকে 'শেফা' বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়তে আরও পরিষ্কারভাবে বলা হইতেছে যে, কোরআন মানুষের অন্তরের রোগ সমূহের 'শেফা'। শেফা-শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা রোগের নিরাময় হয়, a healing. দৈহিক রোগের নিরাময়কারীর ন্যায় আত্মিক ব্যাধির নিরাময়কারী সম্বন্ধেও উহার যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। উপরের আয়ত দুইটী শেষোক্তরূপ ব্যবহারের অকাট্য ও সর্ব্ববাদীসম্মত প্রমাণ।

এই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ অনুসারে সহজে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এখানেও হজরত ঈছা জ্ঞানান্ধ সমাজকে দিব্যদৃষ্টিদানের এবং নানা জঘণ্য ব্যভিচার-ব্যাধি-কলুষিত জাতিকে পরিশুদ্ধ করারই সংবাদ দিতেছেন।

(৫) احيى الموتى "**মৃতকে আমি জীবন্ত করিব**"—

হজরত ঈছার এই উক্তির তাৎপর্য্যে আমাদের রাবীরা বলিতেছেন—যে সব মানুষ পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল, হজরত ঈছা সেই মৃতদিগকে জীবন্ত করিয়া দিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, বস্তুতঃ তিনি সত্যকার নবী। হজরত ঈছা যে বাস্তবে কএকজন মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এরূপ কএকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। খৃষ্টানী উপকথাগুলির অন্ধ অনুকরণ করিয়া তাঁহারাও বলিতেছেন যে, হজরত ঈছা এইরূপে কএকজন মৃতব্যক্তিকে জীবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জীবিত হওয়ার পর এই লোকগুলা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল, আবার ঘর-সংসার পাতাইয়া দস্তুরমত দুন্‌য়াদারী করিয়াছিল, বিবাহ-শাদী করিয়া

সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল, এসব বেওয়ারা দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের বর্ণনা মতে হজরত ঈছা নূহের পুত্র ছামকে ৪ হাজার বৎসর পরে জেন্দা করিয়া দিয়াছিলেন। ছাম গোর হইতে বাহির হইলে দেখা গেল—"কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার ভয়ে তাঁহার মস্তকের অর্দ্ধাংশ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে লোকদিগের কেশ পরিপক্ক হইত না।"

ঐতিহাসিক হিসাবে এই গল্পগুলির কাণাকড়িরও মূল্য নাই। কারণ, রাবীরা ঘটনার শত শত বৎসর পরে এই উপাখ্যানগুলি বর্ণনা করিতেছেন, অথচ তাঁহারা যে কি সূত্রে ঐ সব বর্ণনা অবগত হইলেন, তাঁহাদের কেহই তাহার কোনও সন্ধান প্রদান করেন নাই। অথচ এরূপ অসাধারণ ঘটনার জন্য দৃঢ়তর প্রমাণেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। ঘটনার হিসাবে তাঁহাদের এই বর্ণনাগুলি পরবর্ত্তী কুসংস্কারগ্রস্ত খৃষ্টানদিগের পুরাণ-পুথি ও উপকথাগুলির বিকৃত ও অতিরঞ্জিত অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এছলামের সহিত ঐ সব বর্ণনায় ঘুণাক্ষরেও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। বরং ঐ প্রকার বিশ্বাস পোষণ করা কোর্‌আনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও এছলামের অলঙ্ঘ্য মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটা হীন অন্ধবিশ্বাস মাত্র। এই শ্রেণীর গল্পগুলির প্রচারের সময় তাঁহারা ভুলিয়া বসেন যে, ছুরা আলে-এম্‌রানের এই আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল খৃষ্টানদিগের প্রতিবাদের জন্য, যীশুর divine aspect বা "ঐশিক দিক"টার অসঙ্গতি প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁহারা যীশুর যে সব শক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার "ঐশিক দিকটা"ই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। যীশু জন্মমৃত্যুর সাধারণ নিয়মের অতীত, তিনি জীবসৃষ্টি করিতে সমর্থ, তিনি মৃতকে জীবন্ত করিতে অভ্যস্ত,—এই সমস্ত উক্তির দ্বারা কোর্‌আনের প্রতিবাদ এবং যীশুর ঐশিক সত্তার সমর্থনই হইয়া যাইতেছে।

জড়কে প্রাণদান করা অথবা মৃতকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তোলা, একমাত্র আল্লার অধিকার ভুক্ত, ইহা তাঁহার ঐশিক গুণ বা ছেফত, কোন মানুষই এই গুণের শরিক হইতে পারে না—ইহা এছলামের একটা সর্ব্ববাদীসম্মত 'নীতি'। কিন্তু অন্যপক্ষ ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন, হজরত ঈছা জীবসৃষ্টি করিয়াছিলেন অথবা মৃতকে জীবনদান করিয়াছিলেন—আল্লারই অনুমতিক্রমে। সুতরাং ঐ সব গুণের অধিকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাই হইতেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তি কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টির কোন পদার্থকে নিজের ঐশিক গুণের শরিক করেন না। অন্যথায় অংশীবাদী বা মোশ্‌রেকদিগের সকলেই'ত বলিতে পারে যে, তাহাদের পূজ্য ব্যক্তি বা বিগ্রহগুলিও ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিদ্বারাই বলীয়ান। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই শেরকের সমর্থনে এইরূপ যুক্তিপ্রমাণেরই অবতারণা করিয়া থাকে।

একটু মনোযোগ দিয়া কোরআনের গবেষণা করিলে জানা যাইবে, আল্লাহ মোশ্‌রেকদের এই শ্রেণীর অন্যায় যুক্তি প্রয়োগের কোন সুযোগই রাখেন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন :—

ربى الذى يحيى و يميت

"জীবিত করেন যিনি, মৃত্যু ঘটান যিনি, তিনিই'ত আমার প্রভু (২—২৫৮)।" সাধারণভাবে এই নীতির উল্লেখ কোরআনের বহুস্থানে দেখা যায়। কিন্তু এখানে ইতি না করিয়া কোরআন স্পষ্টতর ভাষায় বিশেষভাবে বলিয়া দিতেছে যে, যে-সকল মানুষকে মোশ্‌রেকগণ আল্লার শরিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে, জীবসৃষ্টি করার বা মৃতকে জীবন দেওয়ার শক্তি বা অধিকার তাহাদের ছিল না—বস্তুতঃ ঐরূপ কিছু করিতে তাহারা কখন সমর্থও হয় নাই। নিম্নে ইহার দুইটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) ছুরা ফোর্‌কানের প্রথম রুকু'তে বলা হইতেছে :—

و اتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا و هم يخلقون و لا يملكون لانفسهم ضرا و لا نفعا و لا يملكون موتا و لا حيوة و لا نشورا -

"আর আল্লাহ ব্যতিরেকে তাহারা এমন সব 'খোদা' নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে, কোন বস্তুকেই যাহারা সৃষ্টি করে না, বরং সৃজিত হয় তাহারা নিজেরাই; আর নিজেদেরই কোন প্রকার অনিষ্ট বা ইষ্টের অধিকারও তাহারা রাখে না,—এবং কাহার মৃত্যু বা জীবনের অথবা মৃতকে (পুনর্জীবিত করিয়া) তোলার অধিকারী তাহারা কেহই নহে।"

(২) ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له

(হে মোশ্‌রেকগণ!) আল্লাহ ব্যতীত আরও যাহাদিগকে তোমরা (ঈশ্বররূপে) আহ্বান করিয়া থাক, তাহারা একটী সামান্য মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারে না—এ জন্য তাহারা সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিলেও নহে (হজ্জ ৭৩)।

উপরের আয়ত দুইটী হইতে চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মোশ্‌রেকরা যাহাদিগকে আল্লার শরিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে—

সৃষ্টির অধিকার তাহাদের নাই,
কাহার মৃত্যু ঘটাইবার অধিকার তাহাদের নাই,
কাহাকে জীবনদানের অধিকার তাহাদের নাই,
কোন মৃতকে জীবন্ত করিয়া তোলার শক্তি তাহাদের নাই।

বলা বাহুল্য যে, ভ্রষ্ট মানব-সমাজ এ যাবৎ যাহাদিগকে আল্লার শরিকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, হজরত ঈছাই তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং হজরত ঈছা যে ঐ গুণ-চতুষ্টয়ের অধিকারী ছিলেন না, কোর্‌আন হইতে তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে কোর্‌আন ও হাদিছের আর একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইতেও হজরত ঈছার মুর্দ্দা-জেন্দা করার রেওয়ায়তগুলির চূড়ান্ত প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়ত ও হজরৎ রছুলে করিমের বিভিন্ন হাদিছ হইতে খুব পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, একবার মানুষের মৃত্যু ঘটার পর, কেয়ামৎ পর্য্যন্ত, তাহার পুনরায় জীবিত হওয়া অথবা জীবিত

হইয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসা অসম্ভব—ঐশিক নিয়মের বিপরীত। ছুরা জুমর, ৪৩ আয়তে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইতেছে :—

فيمسك التي قضى عليها الموت

"যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের প্রাণগুলিকে আল্লাহ রুকিয়া রাখেন।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাহারা পুনরায় সে প্রাণ ফিরাইয়া পাইতে পারে না। অন্যত্র বলা হইতেছে :—

و حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون

"এবং যে জনপদের অধিবাসীদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা এই যে—তাহারা (এ সংসারে) আর ফিরিয়া আসিবে না (আম্বিয়া ৯৫)।" বহু ছহি হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহ শহিদদিগকে ডাকিয়া বলেন, 'তোমরা কি চাও ?' উত্তরে শহিদরা বলেন, 'আমাদের কোনই অভাব নাই।' আল্লার পক্ষ হইতে পুনঃপুন ঐরূপ প্রশ্ন হওয়ার এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে ঐরূপ উত্তর দেওয়ার পরও যখন আল্লাহ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করেন, শহিদরা তখন বলেন—'প্রভুহে ! আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তুমি আবার আমাদিগকে দুনয়ায় পাঠাইয়া দাও, যাহাতে আবার আমরা তোমার নামে জেহাদ করিতে ও শহীদ হইতে পারি।' তখন আল্লাহ ইহার উত্তরে বলেন :—

انى كتبت انهم اليها لا يرجعون

আমার অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ—মৃতরা আর দুনয়ায় ফিরিবে না (মোছলেম)। হজরত জাবের কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছে আরও জানা যাইতেছে যে, আল্লাহ শহিদদিগকে তাহাদের প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন :— يا عبدى تمن على اعطيك

'হে আমার বান্দা ! আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা দান করিব।' শহীদরা তখন বলে—প্রভুহে ! আবার আমাদিগকে জীবন্ত করিয়া দুনয়ায় পাঠাও, আবার আমরা জেহাদ করি ও শহিদরূপে নিহত হই ! এই প্রতিশ্রুতি ও প্রার্থনা সত্ত্বেও আল্লাহ তখন উত্তর করেন :— قد سبق منى انهم لا يرجعون

"পূর্ব্ব হইতেই আমার নির্দ্দেশ এই যে, (মানুষের মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর) তাহারা আর ফিরিয়া যাইবে না (নাছাই, এবনে-মা'জা প্রভৃতি)।"

পাঠক দেখিতেছেন, এখানে আল্লাহ স্বয়ংই শহীদদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করিতে, এবং সে প্রার্থনা যে পূর্ণ করা হইবে, সে প্রতিশ্রুতিও তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও, শহীদরা পুনরায় দুনয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রার্থনা জানাইলে, স্পষ্টভাষায় উত্তর হইতেছে যে, শহীদদের এ প্রার্থনা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ইহা চিরাচরিত ঐশিক নিয়মের বিপরীত। সেই চূড়ান্ত ও চিরাচরিত খোদায়ী ফর্ম্মাণ এই যে, মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর পুনরায় জীবন্ত হইতে ও দুনয়ায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

অতএব হজরত ঈছার 'মোর্দ্দা জেন্দা করা' সম্বন্ধে পরবর্ত্তী রাবীরা যে সব গল্প-গুজব সৃষ্টি বা আমদানী করিয়াছেন, তাহা এছলামের অলঙ্ঘ্য নীতির এবং আল্লার চরম, চূড়ান্ত ও চিরাচরিত ফর্ম্মাণের বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য।

'জীবন ও মৃত্যুর' প্রকৃত তাৎপর্য্য :—

হজরত ঈছা কর্ত্তৃক 'মৃতকে জীবনদান' করার যে অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সম্পূর্ণ বিপরীত, উপরে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

হায়াত ও মওৎ বা জীবন ও মৃত্যু, যেমন দেহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, জ্ঞান ও আধ্যাত্ম সংক্রান্ত জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সেইরূপ ঐশব্দ দুইটীর যথেষ্ট ব্যবহার আছে এবং এই ব্যবহারের প্রমাণ কোরআনেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এমাম রাগেব তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে এই সমস্ত ব্যবহারের প্রকার ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে সকলে একমত। সুতরাং কোরআনিক ব্যবহারের দুইএকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ আলোচনা সমাপ্ত করিব :—

(১) يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার ও তাঁহার রছুলের আহ্বানে সাড়া দাও—যখন তিনি তোমাদিগকে এরূপ বস্তুর পানে আহ্বান করেন, যাহা তোমাদিগকে **জীবন্ত** করিয়া তুলিবে (আন্‌ফাল ২৪)।

(২) ছুরা আন্‌আমের ১২৩ আয়তে মূর্খতা ও জ্ঞানের বিকারকে মৃত্যু এবং জ্ঞানের মুক্তি ও বিকাশকে জীবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে :—

او من كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس

كمن مثله في الظلمت ليس بخارج منها

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তৎপর আমি তাহাকে জীবনদান করিলাম, আর তাহার জন্য আলোকের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম—যাহার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে বিচরণ করে, সে কি তাহার ন্যায় হইতে পারে—যে অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে (আবদ্ধ হইয়া) আছে, তাহা হইতে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই।"

(৩) আন্‌ফালের ৪২ আয়তে আল্লার আদেশ-নির্দ্দেশ প্রকাশের হেতুবাদ স্বরূপ বলা হইতেছে :— ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة

"যেন যুক্তির হিসাবে ধ্বংস হওয়ার যাহারা, তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়—আর যুক্তির বলে জীবন্ত থাকার যাহারা, তাহারা জীবন্ত থাকে।"

(৪) انك لا تسمع الموتى

"আর মৃতদিগকে তুমি (উপদেশ) শুনাইতে পারিবে না (নমল ৮০)।

এইরূপে আরও অনেক আয়তে অনুভূতি-শক্তির অভাবজনিত অবস্থাকে, মূর্খতা ও জ্ঞানের বিকারকে মৃত্যু বলিয়া, এবং অনুভূতি-শক্তির অস্তিত্বকে, জ্ঞানের মুক্তি ও বিকাশকে এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকেও জীবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এই তাৎপর্য্যটী সর্ব্ববাদীসম্মত। ফলতঃ "আমি মৃতদিগকে জীবনদান করিব"-পদের অর্থ, মূর্খতা ও পাপাচারে যাহাদের জ্ঞান ও বিবেক মরিয়া গিয়াছে, যাহাদের হৃদয় সত্যের অনুভূতি-শক্তি হইতে বঞ্চিত ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্ত জ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্বর্গীয় প্রেরণা জাগ্রত করিয়া আবার তাহাদিগকে ধর্ম্মের হিসাবে জীবন্ত করিয়া তুলিব। নবীদিগের আগমন হয় এই জীবনদান করার জন্য এবং নবিকুল-শিরোমণি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাও এইরূপে কোটি কোটি মৃতমানবকে শাশ্বত স্বর্গীয় জীবন দিয়া অমর করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন।

ভোগ করা ও সঞ্চয় করা :—

হজরত ঈছা বলিতেছেন—তোমরা কি ভোগ করিবে আর কি সঞ্চয় করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহা বলিয়া দেই। আমাদের মতে পার্থিব জীবনের ভোগ ও পারলৌকিক জীবনের সঞ্চয়ের কথাই এখানে বলা হইতেছে। কোন কোন রাবী এখানে একটা অতি হীনভাবের গল্প রচনা করিয়া, হজরত ঈছার মোযেজা প্রমাণ করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপই করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—বাল্যকালে হজরত ঈছা পাঠশালার সহপাঠী বালকদিগকে বলিতেন, তোমাদের মাতা এই এই জিনিষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা মাতাদের নিকট গমন করিয়া সেই সেই জিনিষ খাইবার জন্য আবদার করিত, কিন্তু মাতারা তাহা স্বীকার করিতেন না। তখন বালকেরা বলিত—অমুক জিনিষ অমুক স্থানে লুকান রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে খাইতে দাও! তখন মাতারা জিজ্ঞাসা করিতেন—এ সব সংবাদ তোমাদিগকে কে জানাইয়া দিল? তাহারা উত্তর করিত—ঈছা-বেন-মর্‌য়ম। তখন মাতারা বিচলিত হইয়া পুরুষদিগকে বলিলেন—তোমরা নিজেদের পুত্রদিগকে যদি ঈছার সঙ্গে যাইতে দাও, তাহা হইলে সে তাহাদিগকে একেবারে বিগড়াইয়া দিবে! ফলে হজরত ঈছার সংশ্রব হইতে রক্ষা করার জন্য সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সমস্ত শিশুপুত্রদিগকে ধরিয়া এক গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিল। হজরত ঈছা সন্ধানে বাহির হইয়া বালকদিগকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহাদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। হজরত ঈছা তাহাদের সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সমাজের পুরুষরা বলিল—তাহারা এখানে নাই। হজরত ঈছা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে এই ঘরে কাহারা আছে? তাহারা উত্তর করিল—আছে কতকগুলা বাঁদর ও শূকর। হজরত ঈছা বলিলেন—'তবে তাহাই হউক!' তখন দেখা গেল, গৃহে আবদ্ধ সমস্ত বালক বাস্তবিকই শূকর ও বাঁদর ছানায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।

এই গল্পটী অতি হীন ও সম্পূর্ণ অসত্য কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হজরত ঈছার যে উক্তিটাকে উপলক্ষ করিয়া এই গল্পের সৃষ্টি করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা তাঁহার বাল্যকালের উক্তি

আদৌ নহে। কোর্‌আন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, তিনি বানি-এছরাইলের নিকট রছুলরূপে সমাগত হওয়ার পর—সুতরাং নিশ্চয়ই বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর—তাহাদিগকে ঐ সব কথা বলিয়াছিলেন। তাহার পর, এই প্রকার দুষ্টামি শিক্ষা দেওয়া নবীদিগের পক্ষে বাল্যকালেও সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এই গল্পের কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণও আমাদের রাবীরা প্রদান করেন নাই। ফলতঃ গল্পটা সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য।

বস্তুতঃ হজরত ঈছা এখানে পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের কথাই বলিয়াছেন। অভিধান-কারেরা বলিতেছেন— ذخر الشيئ ... خبأه لوقت الحاجة اليه

"দরকারের সময় কাজে লাগিবে বলিয়া কোন জিনিষ সারিয়া রাখা— ذخر শব্দের ধাতুগত অর্থ।" ইহা ইহকাল ও পরকালের সকল সঞ্চয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। এমাম রাগেব আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—و ادخرته اذا اعددته للعقبى

অর্থাৎ, পরকালের জন্য যে সঞ্চয়, 'এদ্দেখার'-শব্দে সেই সঞ্চয়কে বুঝাইয়া থাকে। কোর্‌আনের অন্যত্র মুছলমানদিগকে বলা হইয়াছে— تزودوا তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও। এখানে পরকালের মহাযাত্রার পাথেয় স্বরূপ পুণ্য-সম্বলকেই বুঝাইতেছে। বাইবেলে, যীশুর বিখ্যাত পার্ব্বতীয় উপদেশে এই সঞ্চয়ের কথাই বলা হইয়াছে :—"তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধনসঞ্চয় করিও না ; এখানে'ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোর সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধনসঞ্চয় কর ...... ইত্যাদি (মথি ৬—১৯, ২ পদ)। "কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেন না কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে (৩৪)।"

৪৮ আয়তের দীর্ঘ আলোচনা আমরা এখানে শেষ করিতেছি। যীশুর এই উক্তির মূল শিক্ষা হইতে খৃষ্টানসমাজ কতদূর স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, নজরানের পাদ্রীপুরোহিত-দলকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই আয়তের মূল উদ্দেশ্য।

২৭০ যীশুর সাধনা :—

আয়তে বলা হইতেছে, হজরত ঈছা তিনটী বিশেষ সাধনা লইয়া স্বজাতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাওরাতের নামকরণে পণ্ডিতপুরোহিতরা যে সব অন্যায় 'ব্যবস্থা' দ্বারা এছরাইল-কুলকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ তাহার শিক্ষার মূল প্রেরণাকে বাদ দিয়া এহুদীজাতি যেখানে বাহিরের অনুষ্ঠানকে মাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—হজরত ঈছা মানুষের রচিত সেই অন্যায় ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবেন, জাতিকে ধর্ম্মের প্রাণ-বস্তুর সন্ধান জানাইবেন। তাঁহার তৃতীয় ও প্রধান সাধনার বিষয় পরবর্ত্তী আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আয়তের শেষভাগে তাহার উপক্রম স্বরূপে বলা হইতেছে—আমি তোমাদের সমীপে আল্লার সন্নিধান হইতে এক "আয়ত" আনয়ন করিয়াছি। আয়ত-অর্থে এখানে عبرة , حجة উপদেশ ও অকাট্য সত্য। সেই

পরম উপদেশ ও সার সত্যটা যে কি, পরবর্ত্তী আয়তে আমরা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইব।

২৭১ ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ :—

হজরত ঈছা বানি-এছরাইলকে বলিতেছেন—আমি ও তোমরা সকলে আল্লার দাস, এবং একমাত্র তিনিই হইতেছেন; আমার ও তোমাদের সকলের প্রভু। অতএব পূজা করিতে হইবে সেই প্রভুর, দাসের পূজা সঙ্গত নহে। ইহা হইতেছে, পূর্ব্ব-আয়তের কথিত সেই অকাট্য সার সত্য এবং মানবজাতির পক্ষে পরম উপদেশ। নজরানের লর্ডবিশপ ও অন্যান্য পুরোহিত-প্রধানদিগকে কোর্‌আন নিরুত্তর করিয়া বলিতেছে—খৃষ্টান-তোমরা ত্রিত্ববাদের সৃষ্টি করিয়া যীশুকে ও তাঁহার সেই সার শিক্ষাকে অস্বীকার করিতেছ।

বর্ত্তমান বাইবেলের নূতন ও পুরাতন নিয়মেও যীশুর এই উক্তি ও তাহার মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। মথি ৪—১০ ও লুক ৪—৮ পদে লেখা আছে, যীশু শয়তানকে বলিতেছেন—"দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" এই পদে 'লেখা আছে' শব্দে যীশু তাওরাতের লেখার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। বাইবেল-অনুবাদকেরা এই পদের টীকায় দ্বিতীয় বিবরণ ৬—১৩ পদের বরাত দিয়াছেন। ঐ পদে বলা হইতেছে—"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে।" সুতরাং তাওরাতের এই উপদেশ এবং যীশুর এই আদেশ অনুসারে খৃষ্টান সমাজ নিশ্চয় ভ্রষ্ট, নিশ্চয় যীশুর চরম বিদ্রোহী। কারণ, তাঁহারা যীশুকে ও পবিত্রাত্মাকেও ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূজা আরাধনাও তাঁহারা করিতেছেন।

২৭২ হাওয়ারীদিগের আত্মসমর্পণ :—

হজরত ঈছা আল্লার বাণী ও স্বর্গের আলোক লইয়া জাতিকে মুক্তির ও জীবনের পথ দেখাইতে চাহিলেন। কিন্তু চির-বিদ্রোহী 'শক্তগ্রীব' এহুদী-জাতি সাধারণভাবে তাহাকে অস্বীকার করিল, তাহাদের পণ্ডিত পুরোহিতরা যথানিয়মে সেই নূরের বিরুদ্ধে চরম-বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। দুনয়ার হিসাবে একান্ত নিঃস্ব হজরত ঈছা তখন প্রাণের আবেগে আহ্বান করিলেন—আল্লার কাজে কে আমার আনছার হইবে—এই মহাযাত্রায় কে আমার সাথী হইবে? তখন বিরাট বানি-এছরাইল জাতির মধ্যকার মাত্র দ্বাদশ জন দরিদ্র ব্যক্তি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিলেন—আল্লার আনছার আমরা। আনছার হওয়ার জন্য কি কি অবদানের আবশ্যক হয়—৫১ আয়তের শেষভাগে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "আমরা বিশ্বাসী" "আমরা আত্মসমর্পণকারী"—বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ, এই দুইটাই হইতেছে নবীর আনছারদিগের প্রধান সম্বল। এই বিশ্বাসের বাস্তব নিদর্শন এবং এই আত্মসমর্পণের সত্যকার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে—নবীর প্রতি প্রকাশিত আল্লার কালামকে গ্রহণ করাতে এবং সেই কালামের বাহন—

তাঁহার নবীর পূর্ণ-অনুসরণে। ৫২ আয়তে হজরত ঈছার হাওয়ারী বা ছাহাবীরা তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিতেছেন—আমরা আল্লার কালামকে গ্রহণ করিলাম, তাঁহার রছুলের অনুসারী হইলাম।

২১৩ مكر মক্‌র :—

আরবী সাহিত্যে মক্‌র শব্দের অর্থ— صرف الغير عما يقصده بحيلة কোন অভিসন্ধি দ্বারা অন্যকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বারিত রাখা। ইহা দুই প্রকার—সৎ ও অসৎ। এই উপায়ে কোন সাধু ও সুন্দর কার্য্য সমাধা করার ইচ্ছা থাকিলে তাহা مكر محمود বা সৎ-অভিসন্ধি, আর উদ্দেশ্য অসাধু হইলে তাহা مكر مذموم বা দুরভিসন্ধি (রাগেব)। ফলতঃ ইংরাজীতে Plan-করা বলিতে যেমন ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারে প্লানকে বুঝায়, আরবীতে মক্‌র বলিতে ঠিক সেইরূপ ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের Planকে বুঝায়। আমরা 'হীলা'-শব্দের অনুবাদ করিয়াছি 'অভিসন্ধি' বলিয়া। কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য—

الحذق و جودة النظر و القدرة على دقة التصرف

"বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সূক্ষ্মকার্য্য সমাধার শক্তি" (লেছানুল-আরব)। কোরআনে সৎ-মক্‌র ও অসৎ-মক্‌র বলিয়া বিভিন্ন স্থানে উহার উভয় প্রকার বিশেষণই প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন আলোচ্য আয়তের শেষভাগে خير الماكرين বলা হইয়াছে। ছুরা ফাতেরের ৪৩ আয়তে المكر السيئ পদের উল্লেখ আছে। ফলতঃ আয়তের প্রকৃত ও একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, এহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে এক দুরভিসন্ধি আঁটিয়াছিল, পক্ষান্তরে সেই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার সুব্যবস্থাও আল্লাহ্ করিয়া দিলেন। সেই দুরভিসন্ধি কি, এবং কিরূপে আল্লাহ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী রুকু'তে তাহার বিবরণ জানা যাইবে।

৬ রুকু

৫৪ আর আল্লাহ্ যখন বলিলেন—হে ঈছা ! নিশ্চয় আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব ও তোমাকে নিজ সান্নিধ্যে উন্নত করিব, এবং অমান্যকারীদিগের (মিথ্যা অপবাদ) হইতে তোমাকে পরিশুদ্ধ করিব, আর তোমার অনুসরণকারীদিগকে অমান্যকারীদিগের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিব —কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত ; অতঃপর তোমাদের (সকল পক্ষ) কে ফিরিতে হইবে—আমারই পানে, সে-মতে, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে, সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের মধ্যে ফয়ছালা (প্রদান) করিব।

٥٤ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ◎

৫৫ ফলতঃ অমান্য করিয়াছে যাহারা - তাহাদিগকে আমি ইহকালে ও পরকালে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করিব, আর (এই শাস্তি হইতে রক্ষা করার মত) তাহাদের সাহায্যকারী কেহই নাই।

٥٥ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِينَ ◎

৫৬ পক্ষান্তরে ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছে যাহারা - তাহাদিগকে তিনি, তাহাদের (কর্ম্মের) সুফল পরিপূর্ণরূপে প্রদান করিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না।[২৭৬]

٥٦ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ◎

৫৭ (হে মোহাম্মদ !) এই যে (বিবরণ পরম্পরা) তোমাকে আমরা জ্ঞাত করিতেছি, এগুলি হইতেছে (আমার বহু নিদর্শনের মধ্যকার) কতিপয় নিদর্শন ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ।

٥٧ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ◎

৫৮ বস্তুতঃ আল্লার সমীপে ঈছার স্বরূপ আদমের স্বরূপ-বৎ ;— তাহাকে তিনি সৃষ্টি করিলেন মাটি হইতে, তৎপর তাহাকে বলিলেন—'হও !' ফলে হইয়া যাইতেছে।[২৭৭]

٥٨ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ◎

৫৯ ইহা সত্য-তোমার প্রভুর নিকট হইতে (সমাগত), অতএব সংশয়ীদের দলভুক্ত কদাচ হইবে না।

٥٩ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ◎

৬০ অতঃপর, তোমার নিকট যে-জ্ঞান সমাগত হইয়াছে—তাহার পরেও সে সম্বন্ধে তোমার সহিত হঠতর্কে প্রবৃত্ত হয়

٦٠ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

নَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا وَاَبْنَاۤءَكُمْ وَنِسَاۤءَنَا وَنِسَاۤءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

যাহারা, তাহাদিগকে বল:— আইস, আমরা (উভয় পক্ষ) নিজ নিজ পুত্রদিগকে ও নিজ নিজ নারীদিগকে এবং নিজ নিজ স্বজনগণকে ডাকিয়া (একত্র সমবেত করি), তাহার পর সকলে চরম বিনীতভাবে প্রার্থনা করি[২৭৮]—সে মতে আল্লার অভিসম্পাৎকে মিথ্যাবাদীদের উপর স্থাপন করিয়া দেই ![২৭৯]

৬১ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬১ নিশ্চয় এই যে (বৃত্তান্তগুলি), বাস্তবিক এগুলি হইতেছে অতীতের সত্য-আদর্শ[২৮০]; বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই, আর (সেই যে অদ্বিতীয়) আল্লাহ, বাস্তবিক একমাত্র তিনিই'ত হইতেছেন —পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬২ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝ ع

৬২ ইহার পরেও যদি তাহারা (সত্য-) বিমুখী হইয়া যায়, তবে (নিশ্চয় জানিও যে,) বিপর্য্যয়-কারীদিগের বিষয় আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত আছেন।

টীকা:—

২৭৪ হজরত ঈছার "মৃত্যু ও উত্থান" :—

এই আয়তের অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় এত মতভেদ করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া দুঃখের অবধি থাকে না। কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল "স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়" এবং মরুপ্রান্তরবাসী বেদুইনরাই ছিল তাহার প্রথম ও প্রধান শ্রোতা। কোর্‌আন শ্রবণ করিয়া সে সময়ের সেই নিরক্ষর বেদুইনরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তফছিরের রাবীদিগের হাতে পড়িয়া তাহার অধিকাংশ আয়ত ক্রমে ক্রমে এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াও তাহার মর্ম্ম উদ্ধার করা আজ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূল কারণ ঐই যে, খৃষ্টানদের অনুসরণে এবং অন্যান্য নানা কারণে একএকটা সংস্কারকে তাঁহারা প্রথমে এছলামের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লন, তাহার পর সেই সংস্কারকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহারা তাহার অনুকূলভাবে আয়তের ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হন।

এই আয়তের ব্যাখ্যাতেও এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, 'হজরত ঈছা সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আছমানে চলিয়া গিয়াছেন, এ:যাবৎ সেখানেই অবস্থান করিতেছেন এবং 'আখেরী জামানায়' তিনি আবার দুনয়ায় নামিয়া আসিবেন ও 'দজ্জাল'কে নিহত করিবেন। তাহার পর, তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে।' কিন্তু অভিধান, সাহিত্যিক ব্যবহার ও সাধারণ যুক্তি প্রমাণের কোন দিক দিয়া আলোচ্য শব্দগুলিদ্বারা ঐরূপ অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত হয় না, বরং তাহার প্রতিকূল অর্থই আয়ত হইতে সূচিত হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই মতভেদের সৃষ্টি। এমাম রাজী দেখাইয়াছেন, এই সব মতবাদীদের নিজেদের মধ্যেও আবার নানাবিধ উপমতের সৃষ্টি হইয়াছে। একটী মতের মধ্যে এইরূপ নয়টী উপমতের অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং এই সব মতবাদের কুট তর্কবিতর্কের মধ্যে কোর্‌আনের সরল সহজ তাৎপর্য্যটী লোপ পাইতে বসিয়াছে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও আমাদের আলোচনা একটু দীর্ঘ হইবে বলিয়া মনে করিতেছি।

متوفيك অফাৎ—এই শব্দটীই আয়তের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য। আমরা ইহার অর্থ করিয়াছি—"আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব।" আমাদের মতে ইহাই একমাত্র সঙ্গত অর্থ। অন্যরা ইহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। যেমন (১) আমি তোমাকে নিদ্রিত করিব (২) আমি তোমাকে গ্রহণ করিব (৩) আমি তোমাকে পূর্ণসম্পদ দান করিব (৪) আমি তোমাকে পূর্ণভাবে প্রদান করিব, ইত্যাদি (কবির, মনছুর)। কিন্তু এই প্রকার অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত নহে। ইহার যুক্তিপ্রমাণগুলি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) متوفيك শব্দটী মূলতঃ وفى ধাতু হইতে সম্পন্ন। উহার মূল অর্থ পরিপূর্ণ হওয়া বা করা। বিভিন্ন 'বাবের' বিশেষত্ব অনুসারে এই ধাতু হইতে সম্পন্ন শব্দগুলির বিভিন্ন প্রকার

অর্থ হইয়া থাকে। যেমন—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা, পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ বা দান করা, ষোল আনা রকম ওজন বা পরিমাপ করা, ইত্যাদি। পার্থিব জীবন পূর্ণ হওয়া আর তাহার মৃত্যু ঘটা, একই কথা। এই জন্য 'অফাৎ'-শব্দ মৃত্যু অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (রাগেব, প্রভৃতি)। একটু মনোযোগ দিয়া কোরআন পাঠ করিলে توفى মছদর হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াগুলির দুই প্রকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইবে—কোথায় উহার কর্ম্মপদ একটী মাত্র, আবার কোথায় ক্রিয়াটী দ্বিকর্ম্মক। যেমন একটু পরেই (৫৬ আয়তে) বলা হইতেছে— يوفيهم اجورهم আল্লাহ মোমেনদিগকে তাহাদের পুরস্কার পরিপূর্ণরূপে দান করিবেন। এখানে কর্ত্তা আল্লাহ, এবং কর্ম্ম—মোমেনগণ ও পুরস্কার, এই দুইটী। এইরূপে যেখানে এই ক্রিয়াপদটী দ্বিকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে তাহার অর্থ হইবে পরিপূর্ণরূপে দান করা। পক্ষান্তরে যে সব স্থলে এই ক্রিয়ার কর্ম্ম একটী মাত্র, সেখানে উহার একমাত্র অর্থ হইবে—মৃত্যু। যেমন কোরআনে বলা হইতেছে— يتوفاكم ملك الموت "মলেকুল-মওৎ তোমাদের অফাৎ করেন"—অর্থাৎ, তোমাদের 'জান-কবজ' করেন, তোমাদের মৃত্যু ঘটান। এইরূপ আয়তগুলিতে ইহার একমাত্র অর্থ যে মৃত্যু, তফছিরকারগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে আরও কএকটা আয়তের উল্লেখ করিতেছি :—

(ক)   فكيف اذا توفتهم الملائكة

"ফেরেশ্‌তাগণ যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবে, তখনকার অবস্থা কি হইবে ?" —কেতাল।

(খ)   و توفنا مع الابرار

"আর (হে আল্লাহ !) সজ্জনগণের সঙ্গে আমাদিগের মওৎ করিও !" —আলে-এমরান।

(গ)   توفنى مسلما

"মোছলেম অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটাইও ! —ইউছফ।

এমাম রাগেব তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে এইরূপ ব্যবহারের বহু প্রমাণ দিয়াছেন, এবং অবশেষে আলোচ্য আয়তটীকেও তিনি এই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বলিতেছেন, উহার অর্থ—"হে ঈছা আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব।"

(২) আরবী সাহিত্যের সমস্ত অভিধানকার একবাক্যে এই মতের সমর্থন করিতেছেন। যথা :—

(ক)   و توفاه الله ، اى قبض روحه ، و الوفات الموت - جوهرى

"আল্লাহ তাহার অফাৎ করিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাহার জান কবজ করিলেন। অফাৎ অর্থে—মৃত্যু।" —জওহারী।

(খ)   توفاه الله اذا قبض نفسه - لسان العرب

"আল্লাহ তাহাকে অফাৎ দিলেন" 'তাহার জান কবজ করিলেন'-অর্থে বলা হয়।" —লেছান।

(গ) و الوفاة الموت - و توفاه الله قبض روحه - قاموس

"অফাৎ অর্থে মৃত্যু। আল্লাহ তাহাকে অফাৎ দিলেন—অর্থাৎ, আল্লাহ তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন।" —কামূছ।

(ঘ) و توفاه الله قبض روحه - تاج العروس

"আল্লাহ তাহার অফাৎ করিলেন" অর্থাৎ—তিনি তাহার জান কবজ করিলেন। —তাজ।

(ঙ) توفاه الله اماته و الوفاة الموت - المصباح المنير

"আল্লাহ তাহাকে অফাৎ দিলেন, অর্থাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। অফাৎ অর্থে মৃত্যু।" —মেছবাহ।

(চ) و توفى الله زيدا قبض روحه ... و الوفات الموت - اقرب الموارد

"আল্লাহ জএদকে অফাৎ দিলেন—অর্থাৎ, তাহার জান কবজ করিলেন। অফাৎ অর্থে মৃত্যু।" —মাওয়ারেদ।

(৩) আমাদের আলেম সমাজ হজরত এবনে-আব্বাছকে তফছিরের সর্ব্বপ্রধান ছনদ বা Otherity বলিয়া সমবেতভাবে স্বীকার করেন। বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে:—

عن ابن عباس رض فى قوله انى متوفيك اى مميتك - اخرجه البخارى فى ترجمته

অর্থাৎ (আলোচ্য আয়তে) আমি তোমাকে অফাৎ দিব—অর্থে, আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব।

(৪) পূর্ব্বকথিত সংস্কারের মোহে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, রাবীদিগের মধ্যকার একদল এই সাহিত্যিক প্রমাণগুলিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারাও বলিতেছেন যে, আয়তে انى متوفيك পদের অর্থ—"আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব বা তোমার জান কবজ করিব।" কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের সংস্কারটীকে রক্ষা করার জন্যও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাদের একদল বলিতেছেন, আয়তের অর্থ টা মূলের বর্ণনা ধারায় ওলটপালট করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ আয়তের তরতিব অনুসারে, অগ্রে হজরত ঈছার মৃত্যু হইবে এবং তাহার পর তাঁহাকে উঠাইয়া লওয়া হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ স্পষ্টতঃ বোঝা যাইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন— انى متوفيك و رافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك "আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব ও তোমাকে নিজের পানে তুলিয়া লইব—অর্থাৎ, আমি তোমাকে তুলিয়া লইব, তাহার পর আখেরী জামানায় তোমার মৃত্যু ঘটাইব।" অন্যরা বলিতেছেন, আছমানে ওঠার পূর্ব্বে হজরত ঈছার মৃত্যু ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি সেই মৃতাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন—সাত দণ্ড, তিন দণ্ড বা তিন দিন মাত্র। সেটা একটা অস্থায়ী মৃত্যু মাত্র, তাহাতে কিছু আসে যায় না (মনছুর ২—৩৬)। কিন্তু এই ঘড়িঘণ্টার সন্ধান বহু শতাব্দী পরে তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন, তাহার কোন নিদর্শনই তাঁহাদের কেহ আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। সে যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনা পরে করা হইবে। এখানে বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, রাবীদিগের একদলও এখানে "মৃত্যু"-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরে কোর্‌আনের ব্যবহার ও অভিধানকারগণের বর্ণনা হইতে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়তে "আমি তোমাকে অফাৎ দিব"-অর্থে, "আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব"-ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অন্যপক্ষ এখানে 'অফাৎ'-শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া হঠতর্ক উপস্থিত করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইতেছেন—'স্থান বিশেষে বা আয়ত বিশেষে এই ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে মৃত্যু-অর্থ গ্রহণ করা মোটেই সঙ্গত হইতে পারে না।' কিন্তু তর্কের ইস্যু ইহা আদৌ নহে। আমরাও স্বীকার করি যে, وفى ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াগুলির অন্য অর্থও হইয়া থাকে। প্রকৃত ইস্যু এই যে, যেখানে توفى ক্রিয়ার কর্ত্তা আল্লাহ এবং কর্ম্ম একটী মাত্র, সেখানে উহা মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হওয়ার কোন প্রমাণ আরবী সাহিত্যে আছে কি না? توفاه الله আল্লাহ তাহার অফাৎ দিলেন—পদের অর্থ, 'আল্লাহ তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন' ব্যতীত অন্য কোন অর্থের কোন প্রমাণ অভিধানে পাওয়া যায় কি না?—এদিক দিয়া প্রশ্নটীর বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অন্য পক্ষকেও ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ প্রমাণ কোরআনের ব্যবহারে ও আরবী সাহিত্যে নাই। এই জন্য আমরা উহার অর্থ করিয়াছি—"আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব"। অর্থাৎ আমার আদেশে স্বাভাবিকভাবে তোমার মৃত্যু হইবে—শত্রু পক্ষ তোমাকে নিহত করিতে পারিবে না।

রফ্‌উন— رفع রফ্‌উন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার চারি প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা:—

(১) কোন বস্তুকে তাহার অবস্থান স্থল হইতে উর্দ্ধদেশে উত্তোলন করা;
(২) ঘর বা এমারৎকে বর্দ্ধিত করা;
(৩) কাহারও খ্যাতি বৃদ্ধি করা;
(৪) সম্মানের দ্বারা কাহারও পদপর্য্যাদা বৃদ্ধি করা।

এমাম রাগেব রফউন-শব্দের এই প্রকার তাৎপর্য্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন হইতে প্রত্যেক ব্যবহারের প্রমাণও উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যেমন, মছজেদ বা উপাসনালয়গুলি সম্বন্ধে কোরআনে في بيوت اذن الله ان ترفع الاية বলা হইয়াছে। উহার মর্ম্ম—এই গৃহগুলিকে আল্লাহ 'রফ্‌অ' করার আদেশ দিয়াছেন। উপরের দিকে টানিয়া তোলা অথবা উর্দ্ধদেশে তুলিয়া ধরা উহার অর্থ এখানে কখনই হইতে পারে না। এখানে উহার অর্থ—ঐ গৃহগুলি সম্মানিত হউক—আল্লাহ এই আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য অভিধানকারগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বহুক্ষেত্রে সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি অর্থেই উহার ব্যবহার হইয়া থাকে (কামুছ, মাওয়ারেদ প্রভৃতি)। পাঠক দেখিতেছেন, মূলে 'রাফেও' শব্দ আছে, আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে ঐ বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ—আল্লাহ হইবেন হজরৎ ঈছার 'রাফে''। আল্লার এক নাম রাফে' তাহা সকলেই জানেন। এই নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লেছানুল-আরবে বলা হইয়াছে:—

الرافع الذی یرفع المؤمن بالاسعاد و اولیاءہ بالتقریب

"বিশ্বাসীদিগকে সুমতি সম্পন্ন করিয়া এবং নিজের 'অলি'দিগকে সান্নিধ্য দান করিয়া উন্নত করেন যিনি, রাফে' বলিতে তাঁহাকে বুঝায়।" সুখের বিষয়, বিশিষ্ট তফছিরকারগণ সকলেই এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এমাম রাজী বলিতেছেন—ভ্রান্তমতবাদীরা বলিয়া থাকে, আল্লাহ আছমানে আছেন, এবং এই আয়ত হইতে তাহারা আল্লার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা সপ্রমাণ করিতে চায়। কিন্তু আমরা বহু স্থানে বহু অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, কোন স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা আল্লার সম্বন্ধে অসম্ভব।" অতঃপর কোরআনের বিভিন্ন আয়তের নজির দিয়া তিনি বলিতেছেন,--ইহার অর্থ হইবে, আল্লাহ হজরত ঈছার সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবেন (২—৬৯০)।

এমাম রাজী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী এমাম ও আলেমগণ সকলেই বলিতেছেন—আল্লাহ অনন্ত, অসীম, কোন স্থানে বা দিকে (مکان وجهة) তিনি সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। সুতরাং আল্লাহ আছমানে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনৈছলামিক। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ও অনৈছলামিক মতটাই এখন মুছলমানদিগের মধ্যে এছলামের শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত। এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তফছিরের এক দল রাবী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—আল্লাহ হজরত ঈছাকে 'নিজের পানে' তুলিয়া লওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। যেহেতু আল্লাহ আছমানে অবস্থান করেন, অতএব হজরত ঈছাও নিশ্চয়ই আছমানে উত্থাপিত হইয়াছেন। এমাম রাজী অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ আছমানে অবস্থান করেন—বলিলে, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ অসীম, সসীম কখন আল্লাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া আর তাঁহার ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করা, একই কথা। পক্ষান্তরে ' اِلیّ বা আমার পানে' বলিলে কেবল দৈহিক নৈকট্যকে বুঝায় না, বরং উহাদ্বারা বহুস্থানে আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যকেই বুঝাইয়া থাকে। যেমন হজরত এবরাহিম বলিয়াছিলেন—انی ذاهب الی ربی আমি আমার প্রভুর নিকট (বা পানে) যাত্রা করিতেছি (ছুরা ছাফ্‌ফাৎ)। অথচ তখন তিনি এরাক হইতে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিতেছিলেন (কবির)। ফলতঃ এখানে আল্লার নিকট বা তাঁহার পানে গমন করার অর্থ—আত্মার দিক দিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা।

হাদিছেও 'রফ্‌উন' শব্দ বহুস্থলে মানুষের সম্মান ও মর্য্যাদা বর্দ্ধন অথবা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামাজে দুই ছেজদার মধ্যকার যে প্রার্থনা, তাহাতে মানুষ আল্লাহকে ডাকিয়া বলে وارفعنی —ইহার অর্থ, "হে আল্লাহ তুমি আমাকে উন্নত কর!" আমাকে সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আছমানে তুলিয়া লও, এরূপ অর্থ কেহই গ্রহণ করেন না। হজরত রছুলে করিম ছাহাবাগণকে বিনয় ও নম্রস্বভাব অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া বলেন— فتواضعوا یرفعکم الله "বিনত হও, আল্লাহ তোমাদের সম্মান বর্দ্ধন করিবেন।" এখানেও সেই

এক 'রফউন' ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াপদ, কিন্তু কেহই হাদিছের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করেন না যে, মানুষ বিনয়ী হইলে আল্লাহ তাহাকে জীবন্ত আছমানে তুলিয়া লন।

ফলতঃ কোরআন-হাদিছের ও আরবী-সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে এ সকল স্থলে 'রফউন'-শব্দ সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্য আয়তের এই অংশের অনুবাদ করিয়াছি—"হে ঈছা! আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব ও নিজ সান্নিধ্যে তোমার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিব।" উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাই আয়তের সরল, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ। এহুদীরা হজরত ঈছাকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, ৫৩ আয়তে তাহার উল্লেখ করার পরই এই (৫৪) আয়তে হজরত ঈছার প্রতি আল্লার চারিটা প্রতিশ্রুতির কথা পর পর বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়তের و اذ "এবং যখন" পদটী ৫৩ আয়তের সংলগ্ন। অর্থাৎ, এহুদীরা যখন হজরত ঈছাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সেই সময় আল্লাহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ঈছা! এহুদীদের এই ষড়যন্ত্র দেখিয়া ভীত হইও না, আল্লাহ তোমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবেন (কবির, জরির)। তুমি তাহাদের দ্বারা নিহত হইবে না, বরং অন্য মানবসাধারণের ন্যায় নির্দ্ধারিত সময়ে তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে।

ছুরা নেছার একটী আয়তের উল্লেখ করিয়া এখানে যে সব অন্যায় সংশয় উপস্থাপিত করা হয়, ঐ আয়তের টীকায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। তবে, সাধারণ সংস্কারের সমর্থনে এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যে সব 'যুক্তির' অবতারণা করা হইয়া থাকে, এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

(১) সংস্কারের সমর্থকগণ বলিতেছেন—"হজরত ঈছা কোন্ আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ আছে। অনেক পীর বলিয়াছেন, তিনি চতুর্থ আছমানে আছেন। হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, তিনি প্রথম আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন।" হজরত ঈছা এই শরীর লইয়া আছমানে উঠিলেন কি করিয়া?—এই সমস্যারও তাঁহারা সমাধান করিয়া দিয়াছেন! রাবী লোকের মুখ দিয়া তাঁহারা বলাইয়া দিয়াছেন—"হজরত ঈছার তখন বড় বড় ডানা ও পালক বাহির হইয়াছিল।" কাজেই তাঁহার আছমানে উড়িয়া যাওয়ার কোন বাধা হয় নাই। এখনও না-কি হজরত ঈছা "ফেরেশ্‌তাগণের সহিত উড়িয়া আরশের চারি দিকে অবস্থান করিতেছেন।"

আমাদের বক্তব্য :—

(ক) এই বর্ণনাটীর এক অংশ অপর অংশের বিপরীত। তাঁহাদের বিশ্বাস মতে, আল্লার আরশ সাতওয়াঁ আছমানের আরও উর্দ্ধে স্থাপিত। প্রথমতঃ "অনেক পীরের" মতের সহিত এবনো-আব্বাছের মতবিরোধ। তাহার পর রেওয়ায়ত হইতেই জানা যাইতেছে যে, তিনি সাতওয়াঁ আছমানের উর্দ্ধে আরশের আশেপাশে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে

মে'রাজ সংক্রান্ত যে হাদিছকে এক্ষেত্রে একটা প্রধান প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হয়, তাহাতে দেখা যায়, হজরত ঈছা দ্বিতীয় আছমানে অবস্থান করিতেছেন (বোখারী-মোছলেম প্রভৃতি)। সুতরাং এই রেওয়ায়তটী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(খ) হজরত ঈছার 'আছমানে ওঠার' সাত আট শত বৎসর পরে রাবীরা এই সব বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার ডানা ও পালক উদ্গমের ব্যাপার তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেন নাই। অন্যদিকে চৌথা আছমানে বা আল্লার আরশের আশেপাশেও রাবীরা নিশ্চয় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং হজরত ঈছার ফেরেশ্‌তাগণের সঙ্গে আরশের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ানটা তাঁহারা নিজেরা দেখিতে পান নাই। অথচ এই সকল সংবাদের কোন শাস্ত্রীয় সূত্রও তাঁহারা প্রদান করিতেছেন না। সুতরাং এগুলি রাবী-বিশেষের স্বকপোল কল্পিত খোশ্‌খেয়াল অথবা মূর্খ-খৃষ্টানদের অন্ধ-অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(২) হজরত ঈছা জীবন্ত ও সশরীরে আছমানে উঠিয়া গিয়াছেন এবং সেই অবস্থায় সেখানে অবস্থান করিতেছেন—ইহার প্রমাণ স্বরূপ হজরত রছুলে করিমের মে'রাজের হাদিছটীর উল্লেখ করা হয়। এই হাদিছের সার মর্ম্ম এই যে, মে'রাজের রাত্রে হজরত দ্বিতীয় আছমানে হজরত ঈছার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং সেখানে পরস্পর অভিবাদন ও প্রীতিসম্ভাষণ হয়। অন্যপক্ষ ইহাদ্বারা প্রমাণ করিতে চান যে, হজরত ঈছা তাঁহার পার্থিব দেহ লইয়াই আছমানে অবস্থান করিতেছেন।

আমাদের উত্তর :—

(ক) মে'রাজ সংক্রান্ত এই হাদিছের প্রথমে ও শেষে হজরত রছুলে করিম স্বয়ং স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত। সুতরাং ইহাকে বাস্তব ঘটনারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(খ) মে'রাজের ঐ হাদিছে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা যাইতেছে যে, ঐ যাত্রায় হজরত আদম, হজরত মূছা, হজরত এবরাহিম, হজরত ইউছফ প্রভৃতি আরও অনেক নবীর সঙ্গে হজরতের দেখা সাক্ষাৎ, অভিবাদন ও প্রীতিসম্ভাষণ সমানভাবেই হইয়াছিল। দ্বিতীয় আছমানে হজরত ঈছা ও হজরত এহ্‌য়ার সহিত একত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব অন্যপক্ষের যুক্তি অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য সমস্ত নবীগণও হজরত ঈছার ন্যায় সশরীরে আছমানে উত্থাপিত হইয়াছিলেন। অন্যপক্ষও এই মতকে অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং মে'রাজের হাদিছের দ্বারা তাঁহাদের মতের পোষকতা সামান্য পরিমাণেও হইতে পারে না।

(৩) হজরত ঈছার পুনরায় নাজেল হওয়া :—

হজরত ঈছা আখেরী জামানায় আবার 'অবতীর্ণ' হইবেন ও দজ্জালকে নিহত করিবেন—এই মর্ম্মের কএকটা বর্ণনা হাদিছের বিভিন্ন কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এইগুলিই অন্যপক্ষের প্রধান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই বর্ণনাগুলি সম্বন্ধে এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে দুইএকটা কথা বলিব। এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রথমে ধরিয়া লওয়া যাউক যে, এগুলি বস্তুতই হজরতের বাণী, সুতরাং অবশ্যবিশ্বাস্য। কিন্তু ইহাদ্বারা হজরত ঈছার জীবন্ত সশরীরে আছমানে চলিয়া যাওয়ার থিউরী কখনই প্রমাণিত হইতে পারে না। আখেরী জামানায় তিনি আবার দুনয়ায় শুভাগমন করিবেন, উল্লিখিত বর্ণনাগুলিদ্বারা কেবল এইটুকু মাত্র সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ হয়'ত বলিবেন, মানুষের দুইবার মৃত্যু হইতে পারে না, অথবা মৃত্যুর পর কেহ আর এ দুনয়ায় ফিরিয়া আসিতে পারে না—অথচ হজরত ঈছা আখেরী জামানায় আবার নাজেল হইবেন, ইহা হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং এই দুইটী বিষয় একত্র করিয়া অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জানা যাইতেছে যে, তিনি আজও জীবন্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এ যুক্তিটীও বিচারসহ নহে। কারণ, সমস্ত তফছিরের কেতাবেই দেখা যাইতেছে—আছমানে উঠিবার পূর্ব্বে তাঁহার একবার মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন রেওয়ায়তে (অবশ্য খৃষ্টানী পুরাণপুথির অনুকরণে) বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার পুনরুত্থান হইয়াছিল। এ হিসাবে হজরত ঈছার একবার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা বলিতেছেন যে, তিনি ফিরিয়া আসিবেন ! সুতরাং একবার মরিয়া গেলে মানুষ আর ফিরিয়া আসিতে পারে না—এ যুক্তি তাঁহাদের পক্ষ হইতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না।

(৪) **মছীহ ও দাজ্জাল :—**

'ঈছা মছীহ' আবার দুনয়ায় অবতীর্ণ হইবেন এবং দাজ্জালকে নিহত করিবেন—বলিয়া হজরতের প্রমুখাৎ যে সব বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিক হজরতের উক্তি কি না, এবং হইলে সে উক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে, পদে পদে এত দুরপনেয় সংশয় ও এমন অসাধ্য সমস্যাপুঞ্জের সম্মুখীন হইতে হয় যে, তখন এই উক্তিগুলিকে হজরতের হাদিছ বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অন্য দিকে এই বিচারকালে, এই সব উক্তির মূলসূত্রগুলির সন্ধান পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। অথচ এই সংস্কার বা কুসংস্কারটা আজ এমন দৃঢ় ও এত ব্যাপকভাবে সমাজের অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে যে, এখন তাহা একেবারে অতিগুরুতর ধর্ম্মবিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। এই তথাকথিত হাদিছগুলিকে অবলম্বন করিয়া মুছলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে, 'মেহেদী' ও মছীহের নামকরণে যে সব সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করা হইয়াছে, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। মীরজা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছাহেব, বর্ত্তমান যুগে মোছলেম ভারতে যে অভিনব অকল্যাণ আনয়ন করিয়াছেন, তাহারও মূল অবলম্বন এই 'হাদিছ'গুলি। অথচ হাদিছ পরীক্ষার যে সব সাধারণ নিয়ম মোহাদ্দেছগণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, সে অনুসারেও এই বর্ণনাগুলির যাচাই করিয়া দেখা কোন পক্ষই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ পরীক্ষার পর, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে,—

(১) এছলামের আবির্ভাবের সময় ও তাহার পূর্ব্বে; মছীহার আগমন ও দাজ্জালের আবির্ভাব সম্বন্ধে আরবের এহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে নানা প্রকার কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল ;

(২) তামিম্‌দারী, কাআব আহবার ও অহ'ব-এবনে-মোনাব্বাহ প্রভৃতি (এহুদী, খৃষ্টান ও পার্সিক) নবদীক্ষিত মুছলমানগণের প্রমুখাৎ এই বর্ণনাগুলি মুছলমানদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল ;

(৩) এই বর্ণনাগুলি নানা যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়া এত অসংলগ্ন এবং এমন গুরুতর ভাবে পরস্পর বিরোধী যে, তাহার কোনটীর প্রতি আস্থা স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না।

এই বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা করা এ ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব হইবে না। তাই তাহার অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতার একটু আভাস মাত্র দেওয়ার জন্য, এখানে কএকটা আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি :—

(ক) হজরত ঈছা আবার নাজেল হইবেন—এ সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ হাদিছের কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটীর দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা যাইতেছে যে, দাজ্জালকে নিহত করাই এই সময় তাঁহার প্রধান কাজ ও বিশেষত্ব হইবে। দাজ্জালের ফেৎনা চরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর, হজরত ঈছা আছমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন ও দাজ্জালকে নিহত করিবেন—সমস্ত বর্ণনাই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিতেছে। সুতরাং এই বর্ণনা বা 'হাদিছ'গুলির সমবেত সাক্ষ্য এই যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে অগ্রে ও হজরত ঈছা নাজেল হইবেন তাহার পরে। পক্ষান্তরে দাজ্জালের যখন মৃত্যু ঘটিবে, হজরত ঈছা তখন (নাজেল হইয়া) জীবিত থাকিবেন (মোছলেম, তিরমিজী, এবনো-মাজা প্রভৃতি)।

(খ) দাজ্জাল সম্বন্ধে যে সব বিবরণ হাদিছের কেতাবগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যকার অনেক বিবরণে দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান ও কালেরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ বিদ্যমান আছে। বহু বিবরণে দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতর পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণগুলিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। এমন কি, হজরত রছুলে করিমের সময়ই যে দাজ্জাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাঁহার এন্তেকালের কিছু দিন পরেই যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, বহু 'হাদিছে' তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে দুইএকটী হাদিছের উল্লেখ করিতেছি।

হজরত জাবের, এবনে-ওমর, আবু-জর প্রভৃতি ছাহাবীরা আল্লার নামে হলফ করিয়া বলিতেছেন যে, এবনে-ছাইয়াদই দাজ্জাল। —বোখারী, মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি।

জাবের বলিতেছেন—আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ওমর হজরতের সম্মুখে হলফ করিয়া বলিতেছেন যে, এবনে-ছাইয়াদই দাজ্জাল, অথচ হজরত তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। —বোখারী, মোছলেম।

হজরতের সহধর্ম্মিণী বিবি হাফছার এক উক্তিতে জানা যায় যে, তিনিও এবনে-ছাইয়াদকে (হজরতের হাদিছ অনুসারে) দাজ্জাল বলিয়া জানিতেন।

আবদুল্লাহ-এবনে-ওমর কর্ত্তৃক বর্ণিত একটী হাদিছের (এবং অন্যান্য বহু হাদিছের) দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হজরত রছুলে করিমও এবনো-ছাইয়াদকে দাজ্জাল বলিয়া মনে করিতেন। —বোখারী, মোছলেম।

বোখারী, মোছলেমের এই হাদিছেই জানা যাইতেছে যে, মদিনার শহরতলীতে এবনে-ছাইয়াদের বাস ছিল, হজরত দুইবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবনে-ছাইয়াদ তখন যৌবনের সীমায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে।

দাজ্জালের আবির্ভাব ও মছীহার অবতরণ সংক্রান্ত বিবরণগুলি যদি অবশ্যবিশ্বাস্য হাদিছ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে এগুলিও হাদিছ ও অবশ্যবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, এই এবনো-ছাইয়াদ-রূপী দাজ্জালের জীবনকালের মধ্যেই হজরত ঈছার অবতরণ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। অতএব হিজরীর প্রথম শতাব্দীতেই এই সব হাঙ্গামা নিশ্চয় চুকিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা হইাও দেখিতেছি যে, দাজ্জাল আসিল ও আপনাপনি মরিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে হজরত ঈছা নাজেল হইলেন না, তাহাকে নিহতও করিলেন না।

পাঠক দেখিয়াছেন—হজরত ওমর ফারুকের ন্যায় প্রধানতম ছাহাবা হজরতের সম্মুখে আল্লার নামে হলফ করিয়া বলিতেছেন যে, এবনে-ছাইয়াদই নিশ্চয়ই দাজ্জাল। হজরত ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাও আমরা হাদিছের রাবীর মুখে জানিতে পারিতেছি। সুতরাং অছুলে-হাদিছের নিয়ম অনুসারে, ইহাও হজরতের হাদিছ বলিয়া গণ্য। এই প্রকার হাদিছকে تقریری বলা হয়। হাদিছ আবার বোখারী ও মোছলেম কর্ত্তৃক বর্ণিত। সুতরাং রেওয়ায়তের হিসাবে এ সম্বন্ধে অন্য পক্ষ কোন প্রকার 'চুঁ চেরা' করিতে পারেন না। কাজেই আমাদের আলেমগণ এই ব্যাপারটাকে একটা মুশ্কিল-সমস্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ফৎহুল্‌বারী ১৩—২৫৪)। তাই কোন কোন আলেম এই সমস্যার সমাধান কল্পে বলিতেছেন যে, ছোটখাট দাজ্জাল একাধিক বাহির হইবে বলিয়া হাদিছে সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে অপেক্ষিত, প্রতিশ্রুত ও প্রধান হইতেছে—কাণা দাজ্জাল। হজরত ঈছা নিহত করিবেন এই কাণা দাজ্জালকে, আর এবনো-ছাইয়াদ হইতেছে একজন জুনিয়র দাজ্জাল।

কিন্তু অন্য আলেমরা দেখাইয়াছেন যে, এবনো-ছাইয়াদই বস্তুতঃ সেই কাণা দাজ্জাল। আবুদাউদ ও তিরমিজীর এক হাদিছে, আবু-বকরা নামক ছাহাবী হইতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই অপেক্ষিত কাণা দাজ্জালের ও তাহার পিতার সমস্ত লক্ষণ হজরতের মুখে শ্রবণ করার পর, তিনি ও জোবের-বেন-আওয়াম এবনো-ছাইয়াদের বাড়ী যাইয়া সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত লক্ষণই তাহার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। তাহার এক চোখ কাণাও ছিল। সুতরাং এবনো-ছাইয়াদই যে, সেই অপেক্ষিত প্রতিশ্রুত কাণা দাজ্জাল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব সমস্যাটা পূর্ব্বের ন্যায় অসমাধিত থাকিয়া যাইতেছে।

(গ) বহু হাদিছে ইহাও জানা যাইতেছে যে, মুছলমানরা কনষ্টান্টিনোপল জয় করার অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। আবুদাউদের এক হাদিছে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল বাহির হইবে। এই মর্ম্মের হাদিছগুলি মোছলেম, তিরমিজী ও আবুদাউদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সকলেই জানেন, ছোলতান (দ্বিতীয়) মোহাম্মাদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং আজ হইতে ৫৭৯ বৎসর পূর্ব্বে, কনষ্টান্টিনোপল জয় করিয়াছেন। অতএব ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে দাজ্জাল নিশ্চয়ই বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং হজরত ঈছাও নিশ্চয় নাজেল হইয়া তাহাকে কতল করিয়া ফেলিয়াছেন। হজরত ঈছার মৃত্যুও হইয়া গিয়াছে।

অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিবরণগুলির কাণাকড়িরও মূল্য বাস্তবে নাই। কারণ, প্রথমতঃ দাজ্জাল আসিল ও নিহত হইল এবং হজরত ঈছা আসিলেন ও এন্তেকাল করিলেন—কিন্তু দুন্য়া তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারিল না। তাই আজ এই ছয় শত বৎসর পরেও তাহারা সকলে মছীহার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে।

(ঘ) ছাহাবী আবু-কাতাদা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন :— الایات بعد المائتین. অর্থাৎ দুই শত বৎসর পরেই "আয়ত" বা প্রতিশ্রুত ঘটনাগুলি ঘটিতে আরম্ভ হইয়া যাইবে (এবনে-মাজা)। "ঘটনাগুলি ঘটিতে আরম্ভ হইবে"—অর্থাৎ, এমাম মেহদী জাহের হইবেন, দাজ্জাল বাহির হইবে, হজরত ঈছা নাজেল হইবেন, এবং কিয়ামতের পূর্ব্বকার অন্যান্য ঘটনা "পরম্পরাগতভাবে ঘটিতে আরম্ভ হইবে" (মেরকাৎ)।

হজরত যে সময় এই উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে দুই শত বৎসর পরে কাণা দাজ্জাল ও হজরত ঈছার আবির্ভাব হইবে, এই হাদিছে ইহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। সুতরাং এই হাদিছ অনুসারে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আজ হইতে ১১ শত বৎসর পূর্ব্বে দাজ্জালের আবির্ভাব ও হজরত ঈছার দাজ্জালবধ-কাণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সময় তাঁহাদের অপেক্ষায় থাকা যতটা অন্যায়, নিজকে মছীহরূপে প্রকাশ করা ততোধিক অসঙ্গত। সে যাহা হউক, বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে, ঐ প্রতিশ্রুত সময় বা তাহার নিকট-ভবিষ্যতে দাজ্জালের বা হজরত ঈছার আবির্ভাব আদৌ ঘটে নাই। অথচ ছেহাহ্ ছেত্তার বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থগুলিতে এই বিবরণটী ছাহাবার প্রমুখাৎ হজরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে!

মেশ্‌কাতের বিখ্যাত টীকাকার স্বনামধন্য পণ্ডিত, মোল্লা আলী কারী হানাফী এই হাদিছের আলোচনায় নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন :—

و یحتمل ان یکون اللام فی المائتین للعهد ای بعد المایتین بعد الالف الخ

'দুই শতাব্দী'-শব্দের উপর যে লাম (আল্) আছে, তাঁহাকে 'আহাদের' বলিয়া গ্রহণ করাও সম্ভব। ফলতঃ দুই শত বৎসর পর—অর্থে, সহস্র বৎসর গতে, দুই শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর। মেহদী, দাজ্জাল ও হজরত ঈছার আবির্ভাবের সময় উহাই (মেরকাত)।

এখানে লামের তর্ক তুলিয়া এক হাজার বৎসর সময় বাড়াইয়া লওয়ার যে ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। কারণ, সকলেই জানেন যে, 'আহাদের' জন্য 'লাম' গৃহীত হইতে গেলে এবং তাহার ফলে এক হাজার বৎসরকে উহ্য স্বীকার করিতে হইলে, তাহার জন্য "বাস্তব বা মানসিক" একটা ইঙ্গিত বা ক'রিনা থাকা চাই। এখানে সেরূপ কোন ইঙ্গিতই নাই। যদি হজরতের অন্য হাদিছের দ্বারা জানা যাইত যে, তাঁহার দ্বাদশ শতাব্দী পরে দাজ্জাল প্রভৃতির আবির্ভাব হইবে, তাহা হইলে এই হাদিছের নির্দ্দেশ অনুসারে এখানে "এক হাজার বৎসর"কে লামের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারিতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কারী ছাহেব হাদিছের দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অগত্যা এই "সম্ভাবনার" অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চোখ বন্ধ করিয়া তাঁহার যুক্তিটা স্বীকার করিয়া লইলেও, আজ আর তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা রক্ষা পাইতে পারিতেছি না। মোল্লা আলী কারী ছাহেবের মৃত্যু হইয়াছে ১০১৪ হিজরীতে। সুতরাং দ্বাদশ হিজরীর পরেই দাজ্জালের ও হজরত ঈছার আবির্ভাব হইবে বলিয়া, তাঁহারা সহজে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। কারণ, দ্বাদশ শতাব্দী শেষ হইতে তখনও পুরা দুই শত বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দ্বাদশ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার দেড় শত বৎসর পরে, আজ এই হাদিছের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, কারী ছাহেবের ঐ উহ্য স্বীকারও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ, দ্বাদশ শতাব্দীর পরেও দাজ্জালের আবির্ভাব বা হজরত ঈছার অবতরণ ইত্যাদি কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই।

উপরে যে কএকটা নমুনা দিয়াছি, তাহা এই আলোচনার একটা দিকের একটু আভাস মাত্র। পাঠকগণ ইহা হইতে জানিতে পারিবেন যে, এই বিবরণগুলির মূল্য মর্য্যাদা কিছু নাই, বস্তুতঃ এগুলি হজরত রছুলে করিমের হাদিছও নহে। আমাদের তফছিরকারগণ এই সংস্কারটাকে প্রথমে এছলামের একটা গুরুতর অপরিহার্য্য আকিদা (ধর্ম্মবিশ্বাস) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পর, কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত ঈছা আবার দুনয়ায় আসিবেন, বহু হাদিছ হইতে তাহা যখন জানা যাইতেছে, তখন আমাদিগকে অগত্যা আয়তের উল্লিখিত শব্দগুলির প্রচলিত অর্থের এবং আয়তের তরতিবের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ঐ রেওয়ায়তগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে—এইটাই হইতেছে, তাঁহাদের যুক্তিবাদের সাধারণ ধারা। এমাম রাজী'ও এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ রেওয়ায়তগুলি সকল দিকের সকল প্রকার যুক্তি প্রমাণের হিসাবে অগ্রহণীয়, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার অসারতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য আয়তের শব্দগুলির সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করা ও তাহার তরতিবের বিপর্য্যয় ঘটান, কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ আয়তের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত।

এহুদীরা যখন হজরত ঈছাকে ক্রুসে দিয়া নিহত করার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সেই সময় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে যে চারিটী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আয়তে পরপর তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম প্রতিশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, অন্য সমস্ত আম্বিয়ার মত তোমারও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইবে। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে বলা হইতেছে—তোমার মৃত্যু এরূপভাবে হইবে না—যাহাতে তোমার মর্য্যাদার কোন খর্ব্ব হইতে পারে। এহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ফাঁসিতে টাঙ্গাইয়া বা ক্রুসে আবদ্ধ করিয়া যাহার প্রাণবধ করা হয় "সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১—২৩)। তাওরাতের এই ব্যবস্থা অনুসারে একদল খৃষ্টান-পুরোহিত মনে করিতেন যে, বস্তুতই যীশুখৃষ্ট ক্রুসে নিহত হইয়া আল্লার লা'নৎ বা অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন (দেখ—গলাতীয় ৩-১৩ এবং ২য় করিন্থীয় ৫-২১)। আয়তে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে—আল্লাহ হজরত ঈছাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ক্রুসে নিহত করিয়া আমি তোমাকে শাপগ্রস্ত হইতে দিব না। বরং এহুদীদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমি তোমাকে সেই অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। ইহাতে আমার হুজুরে তোমার সম্মান ও মর্য্যাদা আরও বাড়িয়া যাইবে। তৃতীয় প্রতিশ্রুতিতে বলা হইতেছে—কাফেরদিগের (মিথ্যা অপবাদ) হইতে আল্লাহ হজরত ঈছাকে পরিশুদ্ধ করিবেন। মানুষের প্রতি যত প্রকার অপবাদ দেওয়া যায়, মাতৃনিন্দা তাহার মধ্যে নিকৃষ্টতম। এহুদীরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া বেড়াইত—যীশুজননী মেরী ভ্রষ্টা, পান্থার নামক জনৈক সৈনিকের সহিত তাঁহার ব্যভিচারের ফলেই যীশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা মনে বিশ্বাস করিত, মেরী ভ্রষ্টা নহেন। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিত যে, তিনি পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে তাহারা এহুদী-আক্রমণের সহায়তাই করিয়া যাইত। আল্লাহ হজরত ঈছাকে তখন শান্তনা দিয়া বলিয়াছিলেন, কাফেরদিগের প্রদত্ত এই অপবাদ হইতে আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করিবেন। এই মুক্তি পূর্ণপরিণতরূপে জগতের পৃষ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে কোরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্যদ্বারা।

চতুর্থ প্রতিশ্রুতিতে বলা হইতেছে—"তোমার অনুসারীদিগকে অমান্যকারীদিগের উর্দ্ধে স্থাপন করিব।" হজরত ঈছা প্রেরিত হইয়াছিলেন স্বজাতীয় এছরাইল-গোত্রের প্রতি। ইহাদের মধ্যে একদল তাঁহাকে অমান্য করিল, তাঁহার বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অন্য একদল তাঁহাকে স্বীকার করিল, তাঁহার অনুসরণ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানে এই দুই দলের কথা বলা হইতেছে। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে অমান্যকারী-এহুদীরা, খৃষ্টানদের নিকট পরাজিত হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া থাকিবে।

২৭৫ পার্থিব দুরবস্থা—নিজেদেরই কর্ম্মফল

উপরে হজরত ঈছার অনুসরণকারী ও অমান্যকারী দুই দলের উল্লেখ হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, নবীর আদর্শকে উপেক্ষা করিবে যাহারা, তাঁহাকে অমান্য করিয়া চলিতে চাহিবে যাহারা, পরকালে তাহাদের জন্য যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে, তাহা ব্যতীত

দুনয়াতেও তাহারা নিজেদের এই অপকর্ম্মের কঠোর প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, এবং সে প্রতিফল সমাগত হইবে, দুঃখজনক দণ্ডের হিসাবে। পাঠক দেখিতেছেন, হজরত ঈছাকে অমান্য করিয়াছিল এহুদীরা। সুতরাং এই আয়ত অনুসারে সেই প্রতিশ্রুত পার্থিব দণ্ড তাহাদের উপর সমাগত হইয়া গিয়াছে।

সেই দণ্ডের স্বরূপ কি ? এহুদীরা দুনয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবেরের জাতি। শিক্ষিত ও রাজনীতি-বিষারদ পণ্ডিতেরও তাহাদের মধ্যে অভাব নাই। কিন্তু তত্রাচ, কোরআনের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যাইতেছে যে, তাহারা পৃথিবীতে আল্লার কঠোরতর আজাবে দণ্ডিত হইয়া আছে। বলা বাহুল্য যে, সেই ঐশিক দণ্ড হইতেছে—এহুদী জাতির স্বাধীনতার ও এহুদী সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের চির অবসান।

মুছলমান-আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি, এগুলি এহুদীদের কথা, আমাদের শিক্ষার বা চিন্তার বিষয় ইহাতে কিছুই নাই। কিন্তু ইহা খুবই ভুল ধারণা। কোরআনের কোন আয়ত কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে প্রকাশিত হইলেও, উহার নির্দ্দেশ সকল যুগের ও সকল লোকের জন্য ব্যাপক। এহুদীদের এই সব উপাখ্যান মুছলমানের সম্মুখে পুনঃপুন বিবৃত করিয়া তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—সাবধান ! এহুদীদের ন্যায়, তোমরাও যদি নিজেদের নবীকে অমান্য করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে, আল্লার শাশ্বত নিয়ম অনুসারে তোমরাও তাহাদের মত, পরাধীন দাসের জাতিতে পরিণত হইবে। কোরআনের এই সতর্ক-বাণীর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পরবর্ত্তী যুগের মুছলমান সমাজ একটুও দ্বিধা বোধ করে নাই। তাহাদের এই ভীষণ অপকর্ম্ম যে কঠোর প্রতিফল লইয়া দুনয়ার প্রান্তে প্রান্তে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও এই আয়তের বাস্তব তফছির। এই জন্য ৫৭ আয়তে ইহাকে মুছলমানদিগের জন্য 'জ্ঞানগর্ভ উপদেশ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৭৬ ঈমান ও সৎকর্ম্ম

'নবীর উপর ঈমান আনিয়াছি'—শুধু এই দাবীই যথেষ্ট নহে। ঈমানের সঙ্গে চাই আমল বা সাধনা। এই বিশ্বাস ও সৎসাধনা ব্যর্থ যাইবার নহে। যাহারা ইহাতে রত হইয়া থাকে, ইহার ফল তাহারা ইহজগতে ও পরকালে পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মই ফলের কারণ—আয়তে এই তত্ত্বটাই বুঝান হইতেছে।

২৭৭ ঈছার স্বরূপ আদমের ন্যায়

আদম অর্থে "আদি মানব হজরত আদম" না মানব-সমাজ, এ সম্বন্ধে প্রথম হইতে মতভেদ আছে। এমাম রাজী এই মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন (কবির ১—৩৮২)। হাফেজ এবনে-কছির দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, আদম অর্থে মানব-সমাজকেই বুঝাইতেছে (কছির ১—১২৫)। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ৪২ টীকা দ্রষ্টব্য। আমাদের মতে এখানেও উহার অর্থ—মানব-সাধারণ। ফলতঃ আয়তে বলা হইতেছে যে, অন্য সব মানুষকে আল্লাহ যে ভাবে

সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈছার সৃষ্টিও সেই ভাবে ও সেই অবদানে হইয়াছে। সুতরাং জন্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করা সঙ্গত হইবে না।

একদল লোক এই মতের সঙ্গতি অস্বীকার করিয়া বলেন—এখানে বলা হইতেছে যে, আদমকে আল্লাহ্ মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সাধারণ মানবের প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বীর্য্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহা হঠতর্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোরআনের বহু সংখ্যক আয়ত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, সমস্ত মানবই "তারাব" বা মাটি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ছুরা হজ্জের ৫ম আয়তে বলা হইতেছে :—

يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانما خلقنكم من تراب — الاية

"হে মানব সকল! তোমরা কি পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দীহান? অথচ তোমাদিগকে আমরা মাটি হইতে, পরে বীর্য্য হইতে, সৃষ্টি করিয়াছি।" এই প্রকার আয়ত আরও অনেক আছে। সুতরাং মাটি হইতে পয়দা হওয়া 'হজরত আদমের' কোন বিশেষত্ব নহে, সমস্ত মানুষই মাটি হইতে পয়দা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে বলা হইতেছে যে, আদমকে আল্লাহ্ 'কুন্'-শব্দদ্বারা পয়দা করিয়াছিলেন, সুতরাং অন্য মানুষের সম্বন্ধে তাহা খাটিতে পারে না। কিন্তু ইহাও হাস্যকর যুক্তি। কারণ, অন্য সমস্ত মানুষকে, স্বর্গমর্ত্তকে, 'আঠার হাজার আলমের' সমস্তকেই'ত তিনি ঐরূপ 'কুন্'দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। ছুরা নাহালে বলা হইতেছে :—

انما قولنا لشيئ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون -

অর্থাৎ—"যখনই আমরা কোন বস্তুর (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি, আমাদের একমাত্র কথা হয়—'হউক!' আর অমনি তাহা হইয়া যায় (৪০ আয়ত)।" ছুরা বকরার ১১৭ আয়তে, ছুরা আলে-এমরানের ৪৭ আয়তে এবং আরও কএক স্থানে এই মর্ম্মের বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

এখানে 'আদম'-অর্থে হজরত আদম যে হইতেই পারে না এবং নিশ্চিতরূপে উহার তাৎপর্য্য যে 'মানব-সাধারণ'—আয়তের একটী সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আয়তে فيكون "ফা-য়্যাকুনো"-শব্দ আছে। য়্যাকুনো শব্দের অর্থ—বর্ত্তমানে হইয়া যায়, হইয়া যাইতেছে—অথবা ভবিষ্যতে হইয়া যাইবে। অতীতকালের (অর্থাৎ হইয়া গিয়াছে) অর্থে উহার ব্যবহার হইতে পারে না। হইয়া গেল বা হইয়া গিয়াছে অর্থ বুঝাইতে হইলে, এখানে 'য়্যাকুনোর' পরিবর্ত্তে كان 'কানা' শব্দ ব্যবহার করা উচিত হইত। আয়তে আদম সম্বন্ধে বলা হইতেছে—"আল্লাহ তাহাকে বলিলেন হও!—ফলে হইয়া যাইতেছে।" অতীতকালের 'আদি মানব হজরত আদম' সম্বন্ধে এই আয়তটী কথিত হইয়া থাকিলে এখানে নিশ্চয় বলা হইত—আল্লাহ তাহাকে বলিলেন হও, আর সে হইয়া গেল বা হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ আয়ত হইতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, যে-আদমের সৃষ্টি বর্ত্তমানে হইয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে, সেই আদম বা মানুষের সহিতই এখানে হজরত ঈছার জন্মের সামঞ্জস্য দেখান হইতেছে।

মানুষ মাটি হইতে পয়দা হইয়াছে—ইহার অর্থ এই যে, তাহার মানবরূপে আবির্ভূত হওয়ার যে মূল উপাদান, তাহার উদ্ভব হইয়াছে মাটি হইত। মাটি হইতে অর্থে—من سلالة من طين —"মাটি হইতে উৎপন্ন বীর্য্যসার হইতে" (মো'মেনুন ১২)। মুফতী আবদুহু তাঁহার বিখ্যাত তফছিরে বলিতেছেন :—

فالسلالة المستخرجة من الطين هى المكون الاول الذى يعبـــرون عنه بلسان العلم الان بالبرتوبلاسما و منها تكون اصلنا ـ

"মাটি হইতে বহির্গত যে 'ছোলালা' তাহাই হইতেছে সৃষ্টির প্রথম অবদান। এই 'ছোলালা'কেই আজকাল বিজ্ঞানের ভাষায় "প্রোটোপ্লাজম" বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং আমাদের মূল-উপাদান তাহা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে (৩—৩২০)।"

মানব সৃষ্টির জন্য, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুসারে, যে চিরাচরিত উপাদান ও পরম্পরা নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, হজরত ঈছার জন্মে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতে পারে না—ইহাই আয়তের প্রতিপাদ্য। আদি-মানব হজরত আদমের সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যপক্ষ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, কতকটা কাদামাটি লইয়া আল্লাহ তাঁহার দেহ-অবয়ব গঠন করিয়া তাহাতে প্রাণদান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জীবন্ত মানবরূপে পয়দা হইয়া গেলেন। কিন্তু আয়তের শব্দগুলির প্রতি একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি দান করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কোরআন বলিতেছে—"আল্লাহ আদমকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিলেন"—"তাহার পর তাহাকে বলিলেন হউক! ফলে সে হইয়া যায়।" এখানে দেখার বিষয় এই যে, প্রথমে আল্লাহ যখন হজরত আদমকে "সৃষ্টি করিলেন" তখন তিনি'ত হইয়াই গেলেন। সুতরাং "তাহার পর" আবার তাহাকে "হও" বলার এবং "তাহার ফলে তাহার হইয়া যাওয়ার" সার্থকতা কিছুই থাকে না। কিন্তু আদম অর্থে "মানব" বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন সমস্যাই থাকে না। কারণ, মাটি হইতে মানুষের সৃষ্টি করার অর্থ যে, মাটি হইতে উদ্ভূত প্রোটোপ্লাজম হইতে তাহার মূল উপদানগুলির উদ্ভাবন, কোরআনের বিভিন্ন আয়ত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তফছিরকারগণও এই মতের সমর্থন করিতেছেন। এমাম রাগেব বলিতেছেন :—

و قوله تعالى من سلالة من طين ' اى من الصفو الذى يسل من الارض

"মাটির ছোলালা হইতে—অর্থাৎ, মাটি হইতে আকর্ষিত সার পদার্থ হইতে।" মানুষের মূল উপাদান এই 'সার পদার্থ'টী সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার পর, আল্লাহ বলিলেন—মানুষ হউক! এবং সে মতে মানুষ হইয়া যাইতেছে, তাঁহারই নির্দ্ধারিত পর্য্যায়ক্রমে। যেমন ছুরা মো'মেনুনে বলা হইতেছে :—

و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ـ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ـ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر' فتبارك الله احسن الخالقين ـ

"নিশ্চয় মানুষকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি—মাটিতে অবস্থিত সারপদার্থ হইতে, অতঃপর সেই সারপদার্থকে আমরা বীর্য্যরূপে পরিণত করিলাম—সুদৃঢ় সংরক্ষণস্থলে, তাহার পর সেই বীর্য্যকে আমরা ঘনীভূত শোণিতে পরিণত করি, ও সেই ঘনীভূত শোণিতকে মাংসপিণ্ডরূপে সৃষ্টি করি, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডের মধ্যে অস্থি সৃষ্টি করি এবং সেই অস্থিকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেই, তাহার পর এক অভিনব রূপে তাহার অভ্যুত্থান ঘটাই, অতএব সুন্দরতম স্রষ্টা সেই আল্লাহ্-ই মহিমময় (১৪ আয়ত)।" এখানেও আদম বা মানবকে "মাটি হইতে সৃষ্টি করা" প্রভৃতি বলিয়া, মানব সাধারণের সৃষ্টিধারার সেই অপরিবর্ত্তনীয় ঐশিক নিয়মেরই উল্লেখ করা হইতেছে।

খৃষ্টানেরা যীশুর ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ স্বরূপে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার জন্ম দুনয়ার মানবসৃষ্টির সাধারণ নিয়মের বিপরীত—তিনি বিনা-বাপে পয়দা হইয়াছেন। নাজরানের খৃষ্টান পুরোহিতরাও এই প্রকার যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিল। আয়তে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমরা 'আদম' শব্দের যে তাৎপর্য্য দিয়াছি, তাহা স্বীকার না করিয়া যদি বলা হয় যে, আলোচ্য আয়তে আদম-অর্থে আদি মানব হজরত আদমকেই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেও, খৃষ্টানদের কুসংস্কারের প্রতিবাদ তাহা হইতেও হইয়া যাইতে পারে। কারণ, হজরত আদম যে বিনা পিতামাতায় সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের হিসাবে এ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন। যীশু কেবল 'বিনা-বাপে পয়দা' বলিয়া যদি ঈশ্বর হওয়ার অধিকারী হন, তাহা হইলে উভয় পিতামাতার সংশ্রব ব্যতিরেকে জন্ম যে হজরত আদমের, তিনি'ত তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ঈশ্বর হওয়ার অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন!

২৭৮ নাব্‌তাহেল্—এব্‌তেহাল্

ধীরচিত্তে ও চরম বিনয় সহকারে প্রার্থনা করাকে এবতেহাল বলা হয় (রাগেব, লেছান)। তফছিরের রাবীগণ এই আয়ত-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—নাজরানের খৃষ্টান পুরোহিতগণ যখন কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইল না, তখন হজরত তাহাদিগকে "মোবাহেলা" করার জন্য আহ্বান করিলেন। খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে নানা প্রকার অসাধু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস ও তফছিরের রেওয়ায়তগুলি পরিত্যাগ করিয়া, হাদিছের কেতাবগুলির সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, ঐ আহ্বান হজরত প্রথমে করেন নাই। বরং পুরোহিতদের চ্যালেঞ্জের উত্তরে হজরত মোবাহালা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। বোখারীতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত আছে যে, নাজরানের প্রধান পুরোহিতদ্বয় হজরতের নিকট আসিয়াছিলেন, يريدان ان يلاعناه তাঁহার সঙ্গে 'মলাআনা' করার উদ্দেশ্যে (১৭ যুজ, আহলে নাজরানের কেচ্ছা) হাকেমের একটী রেওয়ায়তে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। জাবের বলিতেছেন, নাজরানের ডেপুটেশন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"যীশু সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? হজরত উত্তর করিলেন—তিনি রূহল্লাহ ও তাঁহার কলেমা, এবং

আল্লার দাস ও তাঁহার রছুল।" খৃষ্টান পুরোহিতরা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া বলেঃ—
هل لك ان نلاعنك انه ليس كذلك ؟ قال و ذاك احب اليكم ؟ قالوا نعم - قال فاذا شئتم
তিনি ঐরূপ (আল্লার দাস) ছিলেন না, এ সম্বন্ধে আমরা আপনার সঙ্গে 'মলাআনা' করিতে চাই, আপনি সম্মত আছেন কি ? হজরত বলিলেন—এইটাই কি তোমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অভিপ্রেত ? তাহারা বলিল—হাঁ। তখন হজরত বলিলেন, তাহা হইলে যখন তোমাদের ইচ্ছা হয় (আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত)। ফলতঃ হজরত রছুলে করিম প্রথমে নাজরান পুরোহিতদিগকে মোবাহালা করার আহ্বান করেন নাই, তাহাদের আহ্বানের উত্তরে অগত্যা তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই মোবাহালার স্বরূপ কি হইবে, আলোচ্য আয়তে তাহার স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের স্ত্রীপরিবারসহ প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা করিবে, চরম বিনয় সহকারে আল্লার হুজুরে মোনাজাত করিয়া বলিবে—সত্য জয়যুক্ত হউক, অসত্য বিধ্বস্ত হউক ! বলা আবশ্যক যে, হজরত মোবাহলার জন্য প্রস্তুত হইলে, নাজরান-পুরোহিতরা অগ্রপশ্চাৎ করিতে থাকে, এবং অবশেষে তাহারাই আবার তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কারণ, আত্মসত্যে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না।

এখানে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রকাশ্যক্ষেত্রে মোবাহালা হইবে এবং সেখানে মুছলমান-অমুছলমান সকলেই উপস্থিত থাকিবেন। আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, সেই মোকাবেলার ময়দানে মুছলমান-মহিলারাও সকলে উপস্থিত থাকিবেন এবং তাঁহারাও পুরুষদের ন্যায় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবেন। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, নারীদিগকে জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা, কোরআন-প্রবর্ত্তিত এছলামের অভিপ্রেত কখনই নহে।

২৭৯ লা'নৎ বা অভিসম্পাৎ

প্রার্থনার ফলই এই লা'নৎ। সত্য জয়যুক্ত ও মিথ্যা বিধ্বস্ত হইলে, সত্যের বাহকরাই জয়জুক্ত ও মিথ্যার বাহকরাই বিধ্বস্ত হইবে, মিথ্যার বাহকদের জন্য ইহাই আল্লার অভিসম্পাৎ। আমরা অন্যপক্ষকে অভিসম্পাৎ করি—আয়তে এরূপ না বলিয়া বলা হইতেছে যে, "সকলে চরম বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, সে মতে আল্লার অভিসম্পাৎকে মিথ্যাবাদীদের উপর স্থাপন করিয়া দেই।"

৭ রুকু

٦٣ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ◎

৬৩ হে গ্রন্থধারিগণ[২৮০] ! সকলে তোমরা সেই ‘বিচারসম্মত ন্যায্য সিদ্ধান্তের’ প্রতি সমাগত হও—যাহা আমাদের ও তোমাদের (সকলের) মধ্যে সাধারণ,[২৮১] (তাহা) এই যে ঃ—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই পূজা আমরা করিব না, আর অন্য কিছুকে তাঁহার শরীক বানাইব না, এবং আমাদের কেহ, আল্লাহ ব্যতিরেকে, নিজেদের মধ্যকার কাহাকেও প্রভুরূপে গ্রহণ করিবে না ; ইহার পরেও তাহারা যদি পরাঙ্মুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা বলিয়া দিও—‘সকলে তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা হইতেছি অনুগত-মোছলেম[২৮২] ।

٦٤ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ◎

৬৪ হে গ্রন্থধারিগণ ! এবরাহিম সম্বন্ধে তোমরা কেন হঠতর্ক করিতেছ ? অথচ তাওরাৎ ও ইঞ্জিল’ত অবতীর্ণ হইয়াছিল তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে ; তোমরা কি তবে বুঝিতে পারিতেছ না[২৮৩] !

৬৫ সেই লোক'ত তোমরা !—যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল, তাহাতেও তোমরা বিসম্বাদ ঘটাইয়াছ, এখন, যে বিষয়ে কোনও জ্ঞানই তোমা-দিগের নাই, তাহাতে (আবার) বিসম্বাদ করিতেছ কি জন্য[২৮৪]? একমাত্র আল্লাই (এ সমস্ত বিষয়) অবগত, তোমরা কিন্তু (কিছুই) অবগত নহ।

٦٥ هَـاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ◎

৬৬ এবরাহিম এহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না,—বরং সে ছিল একজন সত্যাশ্রয়ী, আত্ম-নিবেদিত (=মোছলেম[২৮৫]) ; বস্তুতঃ মোশ্‌রেকগণের দলভুক্ত সে কখনই ছিল না।

٦٦ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ◎

৬৭ নিশ্চয় জনগণের মধ্যে, এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতার যোগ্যপাত্র (প্রথমতঃ) তাহারাই —যাহারা তাহার* পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, এবং (তাহার পর) এই নবী আর যাহারা ঈমান্ আনিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাই হইতেছেন বিশ্বাসিগণের সহায়[২৮৬]।

٦٧ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ◎

৬৮ (হে মুছলমান্ সমাজ !)

٦٨ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ

الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط
وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ◎

গ্রন্থধারীদিগের মধ্যকার একদল লোক তোমাদিগকে ভ্রষ্ট করার কামনা (পোষণ) করিয়া থাকে ; কিন্তু বস্তুতঃ (এই আচরণের দ্বারা) তাহারা ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে কেবল আপনা-দিগকে, অথচ তাহারা (ইহা) অনুভব করিতেছে না[২৮৭]।

٦٩ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ◎

৬৯ হে গ্রন্থধারিগণ ! কেন তোমরা আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিতেছ ? অথচ (সেগুলিকে) তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক[২৮৮] !

٧٠ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ
الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

৭০ হে গ্রন্থধারিগণ ! তোমরা সত্যকে মিথ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতেছ এবং সত্যকে গোপন করিয়া রাখিতেছ — কিসের জন্য ? অথচ নিজে তোমরা (এ সমস্তই) অবগত আছ[২৮৯] !

টীকা :—

২৮০ আহ্‌লে কেতাব :—

আল্লার নিকট হইতে কোন কেতাব বা ধর্ম্মগ্রন্থ সমাগত হইয়াছে যে জাতির নিকট, আহ্‌লে-কেতাব বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। কোরআনের বহুস্থলে আহ্‌লে-কেতাব বিশেষণদ্বারা এহুদী ও খৃষ্টানদিগকে বা তাহাদিগের মধ্যকার কোন এক জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—সত্য। কিন্তু ব্যাপক ও স্থায়ী অর্থে, ঐ দুই জাতি ছাড়া অন্যান্য আহ্‌লে-কেতাব সম্প্রদায়ও উহার অন্তর্গত। আলোচ্য আয়তের তফছিরে এবনে-কছির বলিতেছেন :—

هذا الخطاب يعم اهل الكتاب من اليهود و النصارى و من جرى مجراهم

অর্থাৎ—"এই আহ্‌লে-কেতাব সম্বোধন, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ও তাহাদিগের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।" আহ্‌লে-কেতাব বলিতে কেবল এহুদী ও খৃষ্টানদিগকেই বুঝাইবে, ইহা ভুল ধারণা। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে অনেকে পার্সিকদিগকেও আহ্‌লে-কেতাব বলিয়া গণ্য করিতেন। এমাম এবনে-হাজ্‌ম কোরআন হইতে এই মতের সঙ্গতি সপ্রমাণ করিয়াছেন (মেলাল ১—১১৪)।

কোরআনের শত শত স্থানে এহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ সম্প্রদায়গুলিকে আহলে-কেতাব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সম্বোধনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এমাম রাজী বলিতেছেন :—

و هذا الاسم من احسن الاسماء و اكمل الالقاب ... اراد المبالغة فى تعظيم المخاطب

"ইহা হইতেছে একটা সুন্দরতম বিশেষণ ও পূর্ণতম উপাধি ...... এই সম্বোধনদ্বারা অভিহিত জাতিগণের প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন করাই বক্তার উদ্দেশ্য।" একদিকে এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় এছলামধর্ম্ম ও মোছলেম জাতিকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সাধ্যপক্ষ চেষ্টার ত্রুটী করিতেছে না। অন্যদিকে তাহাদিগের অসত্য ধর্ম্মমতগুলির অসঙ্গতি প্রতিপাদন করাই এছলামের একটা বৃহত্তম সাধনা। এ অবস্থাতেও প্রাণের বৈরী বিধর্ম্মী এহুদী ও খৃষ্টান জাতিকে সম্বোধন করার সময়, কোরআন তাহাদিগের সম্বন্ধে পূর্ণতম ও সুন্দরতম বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। এই মহান আদর্শটীর প্রতি মুছলমান সমাজের—বিশেষতঃ ভক্তিভাজন আলেমগণের—মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এছলামের পরম শত্রু অমুছলমানদিগের সম্বন্ধে কোরআনের এই শিক্ষা। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী মুছলমান সম্বন্ধেও আমাদের আলেমগণ সাধারণতঃ এই আদর্শের চরম অপচয় ঘটাইতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন না। মজহাবী বাদ-বিতণ্ডা সম্বন্ধে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে সব বহি-পুস্তক আমাদের 'নায়েবে রছুল' সমাজের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভাষা ও রুচির জঘন্যতা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন কোন কুৎসিত বিশেষণ নাই, প্রতিপক্ষ আলেমের বা মজহাবের প্রতি যাহার প্রয়োগ করা হয় নাই। কাহারও সঙ্গে কোন আয়ত বা হাদিছের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ হইলে, সমাজে বিশেষরূপে সম্মানিত আলেমগণও তাহার নামটী পর্য্যন্ত বিকৃত করিয়া লিখিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই বাঙ্গলা দেশে, বহু মুদ্রিত বহি-পুস্তকে দেখিতে পাই—"বকরী দল" "নিকারীর ধোকাভঞ্জন" "মৌঃ এক—রাম খাঁ" "মহামুদী" "অহাবী" "হাঁপানী" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেও আমাদের আলেমগণ কুণ্ঠিত হন না। কোরআনের বাহকগণ নিজেরাই তাহার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, শত সহস্রের মধ্যে ইহাও তাহার একটা মর্ম্মবিদারক উদাহরণ।

২৮১ বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি আহ্বান :—

নানা অবস্থাগতিকে দুন্‌য়ার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-মানুষের পরস্পর ঘোরতর সংঘাত সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মের অজুহাতে বিভিন্ন বংশের ও বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের প্রাণের

বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম তখন দুনয়ার প্রধানতম সমস্যায় পরিণত। এই সময় করুণাময় আল্লার মঙ্গল ইঙ্গিতে এছলামের আবির্ভাব হইল—এই সমস্যার পূর্ণ, স্থায়ী ও সঙ্গত সমাধান সঙ্গে লইয়া। এই সমাধানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় পাঠকগণ অন্যত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, বিশ্বজনীন ধর্মের এই শুভ সন্দেশ এছলামই সর্ব্বপ্রথমে দুনয়ায় ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহাকে কার্য্যে পরিণত করার সুসঙ্গত, সুসংযত ও বাস্তব উপায় অবলম্বন করিতে একমাত্র এছলামই সফলতালাভ করিয়াছে। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে ইহাই হইতেছে এছলামের "বিশেষ বাণী"। সেই বাণীর স্বরূপ আলোচ্য আয়তে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমে আহ্‌লে-কেতাবদিগকে كَلِمَةٍ سَوَاءٍ-এর পানে সমাগত হইতে আহ্বান করা হইয়াছে। 'ক'লেমা'-শব্দের আভিধানিক অর্থ—বাক্য, বাণী ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত, ফর্ম্মাণ বা decree কেও কলেমা বলা হয় (২৬২ টীকা)। আমি উহার অনুবাদ করিয়াছি 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া। "যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত এবং পক্ষদিগের মধ্যে সাধারণ, 'ছাওয়া' বলিতে তাহাকে বুঝায় (কছির, কবির, বায়জাভী প্রভৃতি)।" অনুবাদে এই ব্যাপক ভাবটা প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছি, উহার প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই নাই। ফলতঃ আয়তের প্রথমাংশে দুনয়ার সমস্ত আহলে-কেতাবকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে—আইস, তোমরা ও আমরা সকলে এমন একটা সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি, যাহা সত্য ও সঙ্গত এবং যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সত্য, সঙ্গত ও সাধারণ সিদ্ধান্তটী যে কি, আয়তের পরবর্ত্তী অংশে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

(ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর এবাদৎ (দাসত্ব ও পূজা) আমরা করিব না,

(খ) অন্য কিছুকেই আল্লার শরিক আমরা বানাইব না, এবং

(গ) একমাত্র আল্লাহকে আমরা প্রভুরূপে গ্রহণ করিব, তাঁহাকে ছাড়িয়া নিজেদের মধ্যকার কোন মানুষকে আমাদিগের কেহ প্রভুরূপে গ্রহণ করিবে না।

এই সিদ্ধান্তগুলিকে জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও কর্ম্মে সত্যরূপে গ্রহণ করিবে যে সকল আহ্‌লে-কেতাব সমাজ বা ব্যক্তি, ধর্ম্মের হিসাবে তাহাদিগের সহিত কোন বিরোধই মুছলমানের থাকিবে না, অন্য কাহারও থাকা উচিত নহে। এহুদী, পার্সিক, হিন্দু ও খৃষ্টান প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থের অবিসম্বাদিত শিক্ষা যে ইহাই, একথা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই শিক্ষার অপচয় করিতেও তাঁহারা একটুও কুণ্ঠিত হন না। না হওয়ার কারণ কি, তাহার সন্ধানও আয়তের এই অংশের মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে।

আলোচ্য আয়তের শিক্ষাগুলি যে, দুনয়ার সমস্ত আহলে-কেতাব জাতির ধর্ম্মপুস্তকের সাধারণ নির্দ্দেশ, কোন ন্যায়নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিই এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই দাবীর দুইএকটা প্রমাণ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

হজরত মুছা (মোশি) সীনাই পর্ব্বততলে যে দশ মহা-আজ্ঞা বা Ten Commandments প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই হইতেছে এহুদীধর্ম্মের প্রাণবস্তু। উহার প্রথমেই বলা হইতেছে :— "আমি ব্যতিরেকে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না ; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জল মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না ; এবং তাহাদের সেবা (এবাদত) * করিও না" (যাত্রা পুস্তক, ১০ম অধ্যায়)।

নবী-জীবনের প্রারম্ভে (শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষার সময়) শয়তান যীশুকে বলিয়াছিল—তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম (সেজদা) কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব।" যীশু ইহার উত্তরে বলিলেন—"দূর হও, শয়তান ! কেন না লেখা আছে,—তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই পূজা করিবে এবং কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে" (মথি ৪—১০)। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যীশু শিষ্যবর্গের সম্মুখে প্রার্থনা করিতেছেন এবং সেই প্রার্থনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন :— "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর-তোমাকে, এবং তোমার প্রেরিত (রছুল) যীশুখৃষ্টকে, জানিতে পায়"—(যোহন ১৭—৩)।

পার্সীধর্ম্মের ইতিহাসেও এই সাধারণ সত্যের স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। আদিম যুগের অন্যান্য বহু জাতির ন্যায় পার্সিকরাও পূর্ব্বে প্রকৃতির পূজা করিত। রাজা জম্‌শেদের সময়, প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায়, এই প্রকৃতিপূজা প্রতীক পূজায় এবং প্রতীক পূজা ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়া যায়। এই মহাপাতক তাহার শোচনীয়তার চরম দশায় উপনীত হইলে, Zoraster (Zarathustra) বা জরদশ্‌তের আবির্ভাব হয়। জরদশ্‌ত স্বদেশবাসীদিগকে নিরাবিল তাওহীদের পানে আহ্বান করিতে এবং শের্ক ও পৌত্তলিকতার অসঙ্গতি শিক্ষা দিতে থাকেন। একমাত্র খাঁটি তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই যে জরদশ্‌তের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, বিজ্ঞ লেখকগণ সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রথমতঃ জরদশ্‌তের প্রচারিত "নব-ধর্ম্ম"কে যথানিয়মে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অবশেষে, পারস্য-সম্রাট আস্পেন্দিয়ার তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সে ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন বা সনাতনী পার্সিকরাও, পৈতৃক ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইতে থাকে। সিস্তানের বিখ্যাত বীর রোস্তম এই সনাতনীদলের নায়ক হিসাবে আস্পেন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং এই যুদ্ধে আহত হইয়াই আস্পেন্দিয়ারকে শহীদ হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে শের্ক ও তাওহীদের এই সংঘাত-সংঘর্ষের নিবৃত্তি ঘটে নাই। কালক্রমে তাওহীদের সেবকগণই জয়যুক্ত হন। এই ধর্ম্মযুদ্ধের ফলেই পৌত্তলিক পার্সিকগণ পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করে এবং প্রাচীন

---

* আরবী বাইবেলে হিব্রুর সঠিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে— لا تسجدلهن و لا تعبدهن অর্থাৎ, তাহাদের সমীপে সেজদা করিও না ও তাহাদের এবাদৎ করিও না। বাঙ্গলা অনুবাদে সেজদা ও এবাদৎ স্থলে যথাক্রমে প্রণিপাত ও সেবা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

পার্সিকদিগের সেই জড়পূজা ও পৌত্তলিকতাই এখানে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাইয়া বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়। *

এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ন্যায়, হিন্দুজাতির মূল ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতেও এই সাধারণ সত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের নানা প্রকার শোচনীয় পরিস্থিতির প্রভাবে সেগুলি একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। এছলামের সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে, হিন্দুসমাজের সাধক ও সংস্কারকগণ, আবার সেগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা পাইতেছেন। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মসংস্কারকগণের নাম এই উপলক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৮২ তাওহীদের স্বরূপ :—

আয়তের প্রথম অংশে যে সাধারণ সত্যের কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। বলা আবশ্যক যে, তাওহীদের পরিপূর্ণ রূপটা ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই তাওহীদই সকল দেশের সত্যকার ধর্ম্মশাস্ত্রের সার শিক্ষা। এই শিক্ষার অপচয় ঘটাতেই আজ ধর্ম্ম লইয়া মানুষে মানুষে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সকলের ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত সেই সাধারণ সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পাওয়াতেই আজ এহুদী প্রভৃতি আহলে-কেতাবগণ এছলামের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষ নিজের কর্ম্মে ও বিশ্বাসে আল্লাহ-সংক্রান্ত সত্যজ্ঞানের অপচয় ঘটাইয়া থাকে যে যে বিকার ও বিভ্রমকে অবলম্বন করিয়া, সে সমস্তের প্রবেশপথকে কোরআন স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতে চায়। একদল লোক এই বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তাহার স্থলে গয়রুল্লার এবাদৎ বা পূজা-আরাধনা আরম্ভ করিয়া। পরবর্ত্তী যুগের পার্সিকরা যেমন ঈজদ্ ও আহরমনের পূজা করিতেছে, অথবা বৌদ্ধরা যেমন "বৌদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া বুদ্ধদেবের আরাধনা করিয়া আসিতেছে। এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মানব মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে, সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কথাদ্বারা, কাজের দ্বারা বা অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা সৃষ্টির কোন বিষয় বা বস্তুকে আল্লাহ তাআলার জাত বা ছেফাতের (স্বত্বার বা গুণের) শরিক বানাইয়া লয়। ইহার প্রথম স্তরের শোচনীয় উদাহরণ খৃষ্টান সমাজ। ইহারা আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে যীশুকে ও পবিত্রাত্মাকেও আর দুইটী পূর্ণ ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতেছে আল্লার জাত বা স্বত্বার শরিক করার উদাহরণ। আল্লার গুণ বা ছেফাতের শরীক করিয়া যে শের্ক করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও শোচনীয়। মানুষের সকল প্রকার ইষ্ট বা অনিষ্টের মূল মালেক হইতেছেন আল্লাহ, ইহা তাঁহার একটা গুণ। কিন্তু পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক মোশ্‌রেকগণ, ইষ্টলাভের ও অনিষ্টনিবারণের জন্য নানা প্রকার কল্পিত দেব-দেবীর, ঠাকুর

---

* The Teachings of Zorastar—S. A. Kapadia M.D., L.R.C.P., 19—21, এবং এস, এম, তাহের রেজভী এম-এ কৃত—Parsis : A People of the Book, বিশেষতঃ তাহার ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিগ্রহের, ভূত-প্রেতের, পীর-ফকিরের, দরগাহ বা আস্তানার শরণ গ্রহণ করে, পূজা-আরাধনা বা নজর-নায়াজের পর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে সেগুলির সমীপে নিজেদের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের কেহই এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদর্শী ও মঙ্গলময় আল্লার অস্তিত্ব অস্বীকর করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অপকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিয়া বলে—সংসারের ক্ষুদ্র কীট আমরা, আল্লাহ পর্য্যন্ত পৌছিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তাই তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত দেবদেবী বা সাধুসজ্জনের 'অছিলা' ধরিয়া তাঁহারই হুজুর হইতে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করার চেষ্টা পাইয়া থাকি—ঠিক যেমন নিজেদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য আদালতে উকিল মোখ্‌তারদিগের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অধিকতর চতুর, শিক্ষিত ও দার্শনিক মোশ্‌রেকগণই সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যুক্তিধারার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় তাহারা যে আল্লার প্রেমময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান স্বরূপটাকেই—অস্বীকার করিয়া বসে, একথা তাহারা বুঝিতে চায় না! তাই দুন্‌য়ার সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, সসীমজ্ঞান, সম্পূর্ণভাবে অক্ষম বিচারকদিগের সহিত আল্লার তুলনা করিয়া, উকিল-মোখতারের উদাহরণ দিতে তাহারা একটুও দ্বিধা বোধ করে না। সর্ব্বদর্শী আল্লার পূর্ণ ও শাশ্বতবাণী কোরআন, মোশ্‌রেকদিগের এই শ্রেণীর যুক্তিধারার প্রতিবাদ করিতেও ত্রুটী করে নাই। ছুরা ইউনছে, ইহাদিগের অধঃপতনের অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইতেছে :—

و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل
اتنبئون الله بما لم يعلم فى السموات و لا فى الارض ، سبحانه و تعالى عما يشركون

"এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে, এমন সব (বিষয় বা বস্তুর) পূজা তাহারা করিয়া থাকে—যাহা তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে পারে না—ইষ্টও করিতে পারে না, এবং (এই অনাচারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ) তাহারা বলিয়া থাকে, 'এগুলি হইতেছে আল্লার সমীপে আমাদের সুপারিসকারী'; বলিয়া দাও—(এইরূপে উকিল বা মুরুব্বী ধরিয়া, তাহাদিগের দ্বারা) তোমরা কি আল্লাহকে স্বর্গের বা মর্ত্তের সেই তত্ত্বগুলি জানাইয়া দিতে চাও, যাহা তিনি অবগত নহেন! তাহাদিগের কৃত শের্কের কলঙ্ক হইতে তিনি অতিপবিত্র, অতিমহান (১৮)।" একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, মুছলমান সমাজের মধ্যেও এই সূক্ষ্ম শের্কটী ক্রমশঃ অধিকতর মারাত্মকরূপে সংক্রমিত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের পীরপূজা, গোরপূজা প্রভৃতির দার্শনিক কৈফিয়ৎও ঠিক ইহাই।

তৃতীয় দফায় বলা হইতেছে—একমাত্র আল্লাহকে আমরা প্রভুরূপে গ্রহণ করিব, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদিগের মধ্যকার কেহ অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে না। ইহা শের্কের তৃতীয় স্তর, এবং ইহাতে নরপূজার প্রতিরোধ চেষ্টা করা হইয়াছে। মানুষ অন্য মানুষকে 'রব্‌' বা ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে নানা প্রকারে। ইহার মধ্যকার একটা প্রধান প্রকার হইতেছে—অবতারবাদ। মানুষের এই জ্ঞানগত অধঃপতনের ফলে, তাহারা সৎ, মহৎ ও কীর্ত্তিমান

মানুষদিগকে রক্তমাংসে অবতীর্ণ "সাক্ষাৎ শ্রীভগবান" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। এমন কি, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবকেও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবতাররূপে গ্রহণ করিতেও একদল লোক কুণ্ঠিত নহে। মানুষকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করার আর একটা বাস্তব প্রকারের সন্ধান পাওয়া যায়—পাত্রী পুরোহিতের পূজায়, এমাম ও আলেমগণের নির্ব্বিচার অনুসরণে। ছুরা তওবার ৩০ আয়তে বলা হইতেছে:—নিজেদের পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে তাহারা—আল্লাহ ব্যতিরেকে—ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে।" হজরত রছুলে করিম একদা এই আয়তটীর আবৃত্তি করিতেছিলেন—এমন সময় ছাহাবী আদি-এবনে-হাতেম সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—এহুদীরা-ত নিজেদের পণ্ডিত পুরোহিতগণের এবাদৎ (পূজা) কোন দিনই করে নাই! হজরত উত্তরে বলিলেন—পণ্ডিত ও সাধুরা তাহাদিগের জন্য যাহা কিছুকে বৈধ বা অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই নির্দ্দেশগুলিকে তাহারা বিনা বিচারে বৈধ বা অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ইহা কি সত্য নহে? আদি বলিলেন—হাঁ, ইহা-ত খুব সত্য কথা। হজরত তখন বলিলেন—ইহাই-ত হইতেছে তাহাদের পণ্ডিত পুরোহিতের এবাদৎ (তিরমিজী)।

ইহাই এছলামের বিশেষ বাণী। মদিনায় অবস্থান কালে, দুনয়ার বিভিন্ন নরপতির নিকট হজরত রছুলে করিম কএকখানা পত্র লেখেন। ইহাদিগকে এছলামের পানে আহ্বান করাই এই সকল পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উপলক্ষে, মিসরের রাজা মেকাওকাছকে এবং রোম সম্রাট হরকল (Hearaculus)-কে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই আয়তটী উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, হজরত রছুলে করিম এই আয়তের শিক্ষাকেই, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানব সমাজের সংঘাত সংঘর্ষ নিবারণের মূল অবদানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৮৩ এবরাহিম সম্বন্ধে হঠ-তর্ক

এহুদী ও খৃষ্টানগণ কি লইয়া হজরত এবরাহিম সম্বন্ধে বাদবিসম্বাদ করিয়াছিল, কোন বিশ্বাস্য হাদিছে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তফছিরকারগণ সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, এহুদী ও খৃষ্টানরা একদা হজরতের নিকট আসিয়া কলহ আরম্ভ করে। এহুদীরা বলিতে থাকে—হজরত এবরাহিম এহুদী ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরাও বলিতে থাকে যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে, তাহাদের ভ্রান্ত-উক্তির প্রতিবাদ করার জন্য, এই আয়তটী অবতীর্ণ হয়। ইহাতে বলা হইতেছে যে, তাওরাৎ হইতে এহুদীধর্ম্মের আর ইঞ্জিল হইতে খৃষ্টানধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। অথচ এবরাহিম পরলোক গমন করিয়াছেন তাওরাৎ ও ইঞ্জিল প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে। সুতরাং তাঁহাকে এহুদী বলিয়া বা খৃষ্টান বলিয়া দাবী করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমাদের মতে কোন বিশেষ ঘটনার সহিত এই আয়তের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে, আবশ্যকও নহে। যে সময় কোরআনের এই আয়তগুলি নাজেল

হইয়াছিল, আরবের অধিবাসীরা তখন চারিটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সম্প্রদায় চারিটীর-অর্থাৎ এহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুছলমানদিগের সকলেই হজরত এবরাহিমকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত এবং ইহাদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়, বিশেষতঃ এহুদী ও খৃষ্টানরা, দাবী করিয়া বলিত-এবরাহিমের আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকি একমাত্র আমরা। ইহা ছিল সমসাময়িক আরব জাতির ধর্ম্মজীবনের সাধারণ অবস্থা। আমাদের মতে, উপরের আয়তে যে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই আয়তটী উক্ত হইয়াছে তাহারই পোষক-প্রমাণ হিসাবে। হজরত এবরাহিম ছিলেন নিরাবিল তাওহীদের একনিষ্ঠ সাধক, আর খৃষ্টান ও এহুদীরা ছিল গয়রুল্লার উপাসক, অংশীবাদী বা মোশ্‌রেক, অথবা স্পষ্ট নরপূজক।০ অথচ তাহাদের প্রত্যেকই হজরত এবরাহিমকে স্বসম্প্রদায়ের আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া দাবী করিত। আলোচ্য আয়তে আনুসঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে যে, উপরের আয়তে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে শিক্ষাকে পেশ করা হইয়াছে, হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মসাধনার চরম আদর্শও তাহাই ছিল। তোমরা 'খৃষ্টানধর্ম্ম' 'এহুদীধর্ম্ম' প্রভৃতি বলিয়া ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যে সব সীমারেখা রচনা করিয়া লইয়াছ, এবং নিজ নিজ ধর্ম্মের নামকরণে নানা দিক দিয়া তাওহীদের যে সব অপচয় ঘটাইয়াছ, তাহা এবরাহিমের বহু পরবর্ত্তী যুগের আবিষ্কার। ৬৬ ও ৬৭ আয়তে বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

২৮৪ "কিছু জ্ঞান"

তাওরাতে ও ইঞ্জিলে হজরত মূছার ও হজরত ঈছার জীবনের ইতিহাস ও ধর্ম্মসাধনার আদর্শ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পুস্তক দুইখানির মূল শিক্ষার অধিকাংশই—কতকটা তাহার বাহকগণের ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃতির জন্য, কতকটা তাহাদের উপেক্ষা ও অবহেলার দোষে, আর কতকটা নানা দৈব দুর্বিপাকের ফলে—বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তত্রাচ তাহার কিছু কিছু আভাস এখনও তাওরাৎ ও ইঞ্জিলে পাওয়া যাইতে পারে। "যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল" বলিতে তাওরাৎ ও ইঞ্জিলে বিদ্যমান সেই আভাসকেই বুঝাইতেছে। "যে বিষয়ে কোন জ্ঞানই তাহাদের নাই"-বলিতে, হজরত এবরাহিমের জীবন-ইতিহাস ও ধর্ম্ম সাধনার আদর্শকে বুঝাইতেছে। হজরত এবরাহিমের সাধনা ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের যে কোন জ্ঞানই নাই, তাহার প্রধানতম প্রমাণ তাহাদের বাইবেল। পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকে এছরাইলীয়দের বংশ-বিবরণ দেওয়ার সময় কএকবার তাঁহার নামমাত্রের উল্লেখ দেখা যায় (১১—২৫, ২৫—১৮) তাহার পর, হজরত মূছার কএক হাজার বৎসর পরে লিখিত যিহিস্কেলের পুস্তকে (৩৩—২৪) ভূমির অধিকার সম্বন্ধে আবরাহামের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা ব্যতীত, যিশাইয় ২৯—২২, যিরমিয় ৩৩—২৬, এবং মীখা ৭—২০ পদেও তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাসও এই সব পদে পাওয়া যায় না। নূতন নিয়ম বা খৃষ্টানদিগের বাইবেলে হজরত এবরাহিমের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার ভাব, চিন্তা, নীতি ও আদর্শের কোন পরিচয় আমরা এখানেও

জানিতে পারি না। বরং খৃষ্টান বাইবেলের স্থানে স্থানে, তাঁহার সম্ভ্রম ও গুরুত্বের খর্ব্ব করারই চেষ্টা হইয়াছে (যোহন ৮—৫৬, ৫৭, ৫৮, এবং রোমীয় ৪—১-৬ পদ)। যে সব আধুনিক পণ্ডিত বাইবেলের সাহায্যে হজরত এবরাহিমের শিক্ষা, সাধনা ও জীবন-ইতিবৃত্ত উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এক দল বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই মিথ্যার স্তূপ মাত্র, বস্তুতঃ এবরাহিম বলিয়া কোন ঐতিহাসিক-মানুষের অস্তিত্ব কোন কালেই বিদ্যমান ছিল না। অন্য দিকে, বাইবেলের "Patient reconstructive" সমালোচক বলিয়া পাশ্চাত্যে প্রশংসিত হইতেছেন যাঁহারা, কোন-এক এবরাহিমের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে তাঁহারা প্রথমতঃ সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্মবিচার ও দার্শনিক আলোচনার কল্যাণে সে অস্তিত্বটা অবশেষে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। এমন কি, শেষকালে বিবি ছারা ও হাজেরার সঙ্গে তাঁহার বিবাহকে পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলে একবাক্যে symbolise করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। *

২৮৫ হানিফ

"সমস্ত মিথ্যা ও ভ্রষ্টতাকে বর্জ্জন করিয়া সত্যকে প্রাপ্ত হওয়ার এবং তাহাকে স্থায়ীভাবে অবলম্বন করিয়া থাকার যে আন্তরিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা"—হ-ন-ফ বলিতে তাহাকে বুঝায় (রাগেব)। এই আগ্রহ ও নিষ্ঠা আছে যাহার, সেই হানিফ। "মোছলেম"-অর্থে, আত্মসমর্পণকারী, আল্লার হুজুরে নিবেদিত-চিত্ত সাধক (১০৩ ও ১২০ টীকা)। এহুদী, খৃষ্টান ও আরবের পৌত্তলিকগণ সকলে সমস্বরে হজরত এবরাহিমকে নিজেদের আদি পিতা ও আদি ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত। এখানে বলা হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নামে যে সঙ্কীর্ণ সীমারেখাগুলি ইহারা রচনা করিয়া লইয়াছে, এবরাহিম তাহার কোনটীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি এহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না, অথবা আরব-সাধারণের মত পৌত্তলিক ও মোশ্‌রেকও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন হানিফ বা সত্যাগ্রহী, এবং মোছলেম বা আল্লাতে আত্মসমর্পণকারী। ৬৩ আয়তে সকল ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণিত যে সাধারণ সত্যের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছে, হজরত এবরাহিম তাহারই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আরবের পৌত্তলিক এবং এহুদী ও খৃষ্টান জাতিরা যদি সত্যসত্যই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়, তাহা হইলে সেই সাধারণ সত্যের অনুসরণ করাই তাহাদেরও কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত বর্ত্তমানের সংঘাত-সংঘর্ষগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে।

২৮৬ এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতা

এই আয়তে বলা হইতেছে যে, আদি-পিতা ও আদি-গুরু বলিয়া কেবল মৌখিক স্পর্দ্ধা করার সার্থকতা কিছুই নাই। নবীদিগের উত্তরাধিকার বর্ত্তাইয়া থাকে আত্মার হিসাবে, আর তাঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করার দাবী সার্থক হয় তাঁহাদের সনিষ্ঠ অনুসরণে। আরবের

* Biblica—Abraham.

পৌত্তলিক এবং এহুদী ও খৃষ্টান সমাজগুলি তাহা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এবরাহিমকে লইয়া স্পর্দ্ধা বা গৌরব করার অধিকার তাহাদের কাহারও নাই। বস্তুতঃ এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতার যোগ্য-পাত্র ছিল সেই বিশ্বাসীমণ্ডলী, যাহারা তাঁহার নবুয়ৎ-যুগে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ইহাদ্বারা হজরত এবরাহিমের উম্মতের মোমেনদিগকে বুঝাইতেছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার অনুসরণকারী সত্যকার মোমেনগণ অতঃপর এই দাবীর অধিকারী। কারণ, তাঁহারাও হজরত এবরাহিমের আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

২৮৭ মুছলমানকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা

মুছলমানজাতি বিধ্বস্ত হউক, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাউক, আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের একদল লোকের, অর্থাৎ তাহাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক দলপতিগণের, প্রাণের আকাঙ্খা ইহাই। কারণ তাহারা অপ্রেম, অসাম্য ও অজ্ঞানতার যে সব উপাদান উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের শয়তানী শাসন ও শোষণদ্বারা বিশ্বমানবকে জর্জ্জরিত করিয়া আসিতেছে, এছলাম দুনয়ার বুক হইতে তাহার ভিত্তিমূলকে পর্য্যন্ত উৎখাৎ করিয়া ফেলিতে চায়, আর মুছলমান হইতেছে সেই এছলামের সুদৃঢ় বাহন।

মুছলমানকে বিধ্বস্ত করার সব চাইতে সহজ উপায় হইতেছে—তাহাকে এছলামের সাধনা ও আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলা, মুছলমানকে কোরআনের প্রেরণাবর্জ্জিত একটা বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীন আত্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করিয়া তোলা। এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাব সমাজ প্রথমদিন হইতে এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এদেশে খৃষ্টান প্রচারকদিগের দেখাদেখি আর্য্য-সমাজী হিন্দুরাও সে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এহুদীদিগের এই চেষ্টার একটা উদাহরণ ৮ম রুকু'র ৭১ আয়তে পাওয়া যাইবে। খৃষ্টান সমাজ বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ বহিপুস্তক প্রকাশ করিয়া, হাজার হাজার মিশনারীদ্বারা প্রচার ও প্রোপ্যাগাণ্ডার কাজ চালাইয়া, বিজিত মোছলেম রাজ্যগুলিতে সর্ব্বনাশকর শিক্ষা ও শাসননীতি প্রবর্ত্তন করিয়া ; মুছলমানকে এছলামের শিক্ষা, সাধনা, আদর্শ ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত ও স্খলিত করার অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মুছলমানকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য আয়তের প্রথমভাগে আহলে-কেতাবদিগের এই অসাধু চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, এই অসাধু প্রচেষ্টার দ্বারা, জাতি হিসাবে মুছলমানের কোন ক্ষতিই'ত তাহারা করিতে পারিবে না, বরং অবিরত মিথ্যাভাষণ ও অসত্য চিন্তার ফলে তাহাদের আত্মা সত্যবিমুখ, মিথ্যাশ্রয়ী ও হীনগতি হইয়া পড়িতেছে। অথচ স্বকৃত এই সর্ব্বনাশটাকে তাহারা অনুভবই করিতে পারিতেছে না। এছলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার অতি-আগ্রহে খৃষ্টান প্রচারক ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিজেদের আত্মিক দীনতার যে শোচনীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মুছলমানেরা নামাজের প্রারম্ভে

যে ছুরা ফাতেহা পাঠ করে, পাঠকগণ খৃষ্টানপণ্ডিতের মুখে তাহার অনুবাদ শ্রবণ করুন— "সকল প্রশংসা আমাদের ঈশ্বর দয়াময় মোহাম্মদের প্রতি। হে লোক সকল, আনন্দধ্বনি কর এবং সেই মোহাম্মদ-ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিদান কর! তবেই আমাদের ভীষণ শত্রুগণ দমিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" * এইরূপ জঘন্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এছলামের বিলোপ সাধনের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাঁহাদের এই সব প্রচার ও প্রোপ্যাগাণ্ডার উপকরণগুলিই পাশ্চাত্যে এছলামের প্রগতিপথকে সহজ করিয়া দিয়াছে।

২৮৮ আল্লার নিদর্শন অমান্য করা

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সত্যনবী ও এছলাম সত্যধর্ম্ম, পক্ষান্তরে এহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস ও দাবীগুলি সাধারণতঃ মিথ্যা—ইহার বহু নিদর্শন নানাদিকে নানারূপে বিদ্যমান আছে। এখানে নিদর্শন বলিতে সে সমস্তকেই বুঝাইতেছে। কোরআনে আল্লার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে যে সব যুক্তি-প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, বাইবেলে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে, তাহাও এই "নিদর্শনগুলির" অন্তর্গত।

২৮৯ সত্যের অপচয়

সত্যের অপচয় ঘটাইতে চাহে যাহারা, কখন তাহারা সত্যকে একেবারে গোপন করিয়া ফেলে, আর তাহা সুবিধাজনক না হইলে সত্যকে প্রচার করে মিথ্যার ভেজাল দিয়া। এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাব সম্প্রদায়গুলির পণ্ডিতপুরোহিতরা সুযোগ ও আবশ্যক মতে এই উভয় পন্থাই অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। আয়তে তাহাদিগের এই আচরণের প্রতিবাদ করা হইতেছে।

* Ecclasiastical History of England, Normandy, Vol. 3, 175.

৮ রুকু

৭১ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۞

৭১ গ্রন্থাধিকারিগণের মধ্যকার এক সম্প্রদায় (স্বদলস্থ লোকদিগকে) বলে ঃ— "মোমেনদিগের প্রতি যে কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে, দিবসের প্রথমভাগে তাহার প্রতি ঈমান প্রকাশ কর, আর তাহার শেষ বেলায় উহাকে অমান্য করিয়া দাও ! খুব সম্ভব (এই অভিসন্ধির ফলে, নিজেদের ধর্ম্ম হইতে) তাহারা ফিরিয়া যাইবে ;

৭২ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط

৭২ (হে মোমেনগণ, সাবধান !) তোমাদিগের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলে যে ব্যক্তি, সে ব্যতীত অন্য কাহারও উপর আস্থাস্থাপন করিও না ; বলিয়া দাও— আল্লার (প্রদত্ত) যে হেদায়ৎ, প্রকৃত হেদায়ৎ'ত তাহাই, ফলে তোমরা যাহা প্রদত্ত হইয়াছ - তাহার অনুরূপ (ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থ) অন্যরাও প্রাপ্ত হইবে, অথবা তোমাদিগের প্রভুর সন্নিধানে তোমাদিগকে তাহারা বিচারে পরাজিত করিয়া

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۙ

দিবে (ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই); বলিয় দাও—নিশ্চয় সমস্ত প্রসাদই আল্লার হস্তগত, তিনি যাহাকে ইচ্ছা সেই প্রসাদ দান করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হইতেছেন বিপুল-প্রসাদ, সর্ব্ব-বিদিত,—

৭৩ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ◎

৭৩ নিজ করুণাহেতু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মহিমময়-প্রসাদ স্বামী।

৭৪ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج

৭৪ আর গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে এরূপ লোকও আছে, যে, তুমি যদি তাহার কাছে স্তুপাকার স্বর্ণ-রৌপ্য গচ্ছিত রাখ—সে তোমাকে তাহা ফিরাইয়া দিবে, আবার এমন লোকও তাহাদিগের মধ্যে আছে, যে, একটী মাত্র দীনার দিয়াও যদি তুমি তাহাকে বিশ্বাস কর, সে তোমাকে তাহা আর ফিরাইয়া দিবেনা—যদিনা অনবরত তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক; ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে— " নিরক্ষরদের

সম্বন্ধে আমাদের উপর জওয়াব-দিহি কিছুই নাই"; বস্তুতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা উক্তি করিতেছে নিজেদের জ্ঞাতসারে।

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৫ হাঁ, নিজের অঙ্গীকারকে পূর্ণ-রূপে পালন করে ও সংযত হইয়া চলে যে ব্যক্তি, সেইরূপ সংযমী-লোকদিগকেই'ত আল্লাহ্ প্রেম করিয়া থাকেন[২২৭]।

৭৫ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৭৬ নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকারকে এবং নিজদের দিব্যগুলিকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে যাহারা, তাহারাই'ত হইতেছে সেই (হতভাগ্যের দল) পরকালে যাহাদের অংশ কিছুমাত্রও নাই —এবং, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না—কিয়ামতের সময়, আর তাহাদের পানে নজর করিবেন না, এবং (পাপের কলুষ হইতে) তাহাদিগকে তিনি পরিশুদ্ধও করিবেন না, অধিকন্তু তাহাদের জন্য (নির্দ্ধারিত আছে) পীড়াদায়ক দণ্ড[২২৮]।

৭৬ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৭ আর নিশ্চয় তাহাদিগের মধ্যে এরূপ একটী দল আছে (নিজেদের) ধর্ম্মগ্রন্থকে যাহারা

৭৭ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ

مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

বিকৃতভাবে পাঠ ও প্রকাশ করিয়া থাকে, যেন তাহাকে তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থের অংশ বলিয়াই মনে করিয়া লও, অথচ ধর্ম্মগ্রন্থের অংশ তাহা কখনই নহে,—অধিকন্তু তাহারা বলিয়া থাকে যে, এ সমস্তই আল্লার নিকট হইতে সমাগত, অথচ আল্লার নিকট হইতে সমাগত তাহা কখনই নহে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা উক্তি করিতেছে, নিজেদের জ্ঞাতসারে।

৭৮ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۞

৭৮ যে মানুষকে আল্লাহ্ কেতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ৎ প্রদান করেন, ইহার পরেও সে লোকদিগকে বলিবে— "তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আমার পূজাকারী দাস বনিয়া যাও", ইহা তাহার পক্ষে কখনই 'সঙ্গত ও শোভনীয়' হইতে পারে না, বরং (স্বভাবতই সে বলিবে) সকলে তোমরা "রাব্বানী" হইয়া থাকিবে!—যেহেতু তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়নে - অধ্যাপনে ব্যাপৃত হইয়া আছ,—

৭৯ পক্ষান্তরে সে তোমাদিগকে এ-আদেশও করিবে না যে, ফেরেশতাগণকে ও নবীদিগকে তোমরা ঈশ্বররূপে গ্রহণ কর;—কী! যে অবস্থায় তোমরা হইয়া আছ মোছলেম, তৎপর সে তোমাদিগকে আদেশ করিবে কাফের হইয়া যাওয়াঁর!

৭৯ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ط أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ع

টীকা:—

২৯০ এহুদীদিগের দুরভিসন্ধি

মুছলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস পর্ব্বতের ন্যায় অটল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় বিশাল। প্রলোভন ও বিভীষিকার শত অগ্নিপরীক্ষাকে বিশ্বাসী-মুছলমান ঈমানের তেজে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাহাকে পরাভূত করারও কোন আশা ছিল না। অতএব, হীন ষড়যন্ত্রে চিরঅভ্যস্ত এহুদীপ্রধানরা তখন মুছলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসকে শিথিল করার জন্য দুইটী দুরভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। একদিকে তাহারা চেষ্টা করিতেছিল, অতীতের অপ্রীতিকর ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া মদিনার আওছ ও খজরজ গোত্র দুইটীর মধ্যে পুরাতন দ্বেষহিংসাকে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে, যাহাতে মুছলমানের সঙ্ঘশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অন্যদিকে তাহারা প্রয়াস পাইতেছিল—মুছলমানের অন্তরে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিয়া, তাহার মোছলেম-অস্তিত্বের প্রাণবস্তু—ঈমানকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতে। আলোচ্য আয়তে শেষোক্ত দুরভিসন্ধিটীর উল্লেখ করা হইতেছে।

আয়তে দিবসের প্রথমভাগ বা শেষভাগ বলিয়া যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—অল্প সময়। এহুদী-প্রধানরা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—দুই-একজন করিয়া এহুদীরা মুছলমানদিগের নিকটে গিয়া এছলামের প্রশংসা করিবে, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া মুছলমান হইয়া যাইবে। ইহাতে, তাহাদের ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যাগ্রহ ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া মুছলমানগণ তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। কিছুকাল এই ভাবে কাটাইবার পর, তাহারা এছলাম সম্বন্ধে নিজেদের অনাস্থা প্রকাশ করিয়া বলিতে থাকিবে—সত্যের জন্য স্বধর্ম্ম ও স্বজনগণের মায়া কাটাইয়া এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাহির হইতে তাহার যে রূপ

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিপরীত দেখিতে পাইলাম। কাজেই, স্বধর্ম্ম ও স্বজনবর্গকে বিসর্জ্জন দিয়া মুছলমান হইয়াছিলাম যে সত্যের জন্য, তাহারই তাকীদে আজ আবার এছলামকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তাহাদের আশা ছিল, মুছলমানের অন্তরে এইরূপে সন্দেহের বীজ বপন করিয়া দিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের অনেকেই স্বধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আজও এই শ্রেণীর হীন ষড়যন্ত্রগুলির নিবৃত্তি ঘটে নাই। কেহ অল্পদিনের জন্য মুছলমান হইয়া ঠিক এই ভাবে আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতেছেন, কেহ মুছলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মোছলেম-সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংস সাধনের ষড়যন্ত্র করিতেছেন, আর কেহ বা শিক্ষার্থী তরুণের বুকে মিঠা বিষ 'ইন্‌জেক্ট' করিয়া দিয়া তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে মুছলমানকে চিরকাল সাবধান হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই আয়তের স্থায়ী সতর্কবাণী।

২৯১ বিধর্ম্মীর উপর নির্ভর করা

"তোমাদিগের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলে যে ব্যক্তি, সে ব্যতীত, অন্য কাহারও প্রতি আস্থাস্থাপন করিও না"—এই অংশটুকু বাদে আয়তের সমস্তই-যে মুছলমানদের প্রতি আল্লার উক্তি, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু উল্লিখিত অংশটুকুকে সাধারণতঃ (৭১ আয়তে বর্ণিত) এহুদীদিগের উক্তির শেষভাগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে, আয়তটীর তাৎপর্য্য এমন দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এমাম রাজীর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহাকে من المشكلات الصعبة কঠিন মুশ্‌কিল বলিয়া মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলা আবশ্যক যে, এই মুশ্‌কিলটীর সৃষ্টি তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইয়াছেন। আয়তের অন্য সমস্ত অংশের ন্যায় তাহার প্রথম অংশটুকুকেও, মুছলমানদিগের প্রতি আল্লার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে, কোন মুশ্‌কিলই থাকে না। কিন্তু তাহা হওয়ার উপায় নাই। কারণ, তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক তফছিরকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, هذا بقية كلام اليهود ইহা যে এহুদীদিগের উক্তির অবশিষ্টাংশ, সে সম্বন্ধে তফছিরকারগণ একমত। কাজেই তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তকে যে কোন গতিকে হউক, বহাল রাখিতেই হইবে। এই বহাল রাখার আগ্রহে لمن تبع -পদের লামকে জাএদ বা অতিরিক্ত আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই! অথচ তত্রাচ সমস্যার যথোচিত সমাধান করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সমস্ত তফছিরকারগণের ঐক্য মত সম্বন্ধে যে দাবী এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। থাকিলেও, যে ঐক্যমতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া কোরআনের কোন বর্ণকে আর্ষপ্রয়োগ বা অনর্থক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়,

তাহাকে অপরিহার্য্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহি। এমাম এবনে-হাইয়ান এই আয়তের তফছিরে লিখিতেছেন :—

قال ابن عطية لا خـ ف بين اهل التاويل ان هذا القول من كلام الطايفـــة انتـــهى - و ليس كذلك ، بل من المفـــسرين من ذهب الى ان ذلك من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود و تزويرهم -

"এবনে আতিয়া বলিয়াছেন—'তফছির বর্ণনাকারীরা একমতে বলিয়াছেন যে, এই পদটী এহুদী-দিগের উক্তির অবশিষ্টাংশ।' কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। বরং তফছিরকারগণের মধ্যে এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা এই অংশটাকে আল্লার উক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আল্লাহ এই আয়তে মুছলমানদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতেছেন, যেন এহুদীদিগের প্রবঞ্চনার সময় তাহারা সংশয়হীন ও ঈমানে অটুট হইয়া থাকিতে পারে" (মুহীত ২—৪৯৪)।

আয়তের لا تؤمنوا ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্য লইয়াও নানা প্রকার মতভেদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পূর্ব্ব-বর্ণিত সমস্যাটী আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এখানেও উহার অর্থ ঈমান-আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। তাই অসতর্ক লেখকগণ ৭১ আয়তের آمنوا بالذى পদের যেমন অর্থ করিয়াছেন "বিশ্বাস স্থাপন কর" বলিয়া, ঠিক সেইরূপ এই আয়তের لا تؤمنوا ক্রিয়ার অনুবাদ করিয়াছেন "বিশ্বাস স্থাপন করিও না"। দুঃখের বিষয়, প্রথম আয়তে ঈমানের 'ছেলা' (উপসর্গ) বে-দ্বারা এবং দ্বিতীয় আয়তে লাম-দ্বারা বর্ণিত হওয়ার সার্থকতা যে কিছু থাকা দরকার, সে দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। কোরআনের এই দুই প্রকার প্রয়োগের প্রতি মনোযোগ দিলে সহজেই জানা যাইবে যে, آمنوا به মানে তাহার উপর ঈমান আনয়ন কর, আর آمنوا له মানে তাহার উপর আস্থা কর, নির্ভর কর, ইত্যাদি (আবদুহু)। প্রথম প্রয়োগের নজির কোরআনের শত শত আয়তে বিদ্যমান আছে, ৭১ আয়তও তাহার একটা প্রমাণ। এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। শেষোক্ত প্রয়োগের দুইএকটা নজির দিতেছি।

হজরত ইউছফকে অন্ধকূপে ফেলিয়া আসার পর তাঁহার ভ্রাতারা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—ইউছফকে বাঘে খাইয়াছে, কিন্তু ما انت بمؤمن لنا আপনি'ত আমাদের (কথার) উপর আস্থা করিবেন না (ইউছফ, ১৭)। ছুরা তাওবার ৬১ আয়তে হজরত রছুলে করিম সম্বন্ধে বলা হইতেছে :— يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين অর্থাৎ—রছুল, আল্লার প্রতি ঈমান রাখে আর মোমেনদিগের উপর আস্থা করিয়া থাকে। হজরত ইউছফের ভ্রাতারা যে পিতা-হজরত য়্যা'কুবকে নিজেদের উপর ঈমান আনিতে বলিতেছিলেন, অথবা হজরত রছুলে করিম যে, আল্লার ন্যায় মোমেনদিগের উপরেও ঈমান আনিয়াছিলেন, এরূপ অসঙ্গত কথা কেহই বলেন না। ফলতঃ 'ছেলার' পার্থক্য অনুসারে এখানে উহার একমাত্র তাৎপর্য্য

তাহাদিগের উপর আস্থা করিও না। হাফেজ এবনে কছিরও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, لا تؤمنوا পদের অর্থ— لا تطمئنوا و تظهروا سركم "নিঃশঙ্ক হইয়া বসিও না এবং নিজেদের গোপনীয় সংবাদগুলি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিও না।"

আয়তের শিক্ষাটা অতি স্পষ্ট এবং মুছলমান সমাজের আত্মরক্ষার জন্য চির-আবশ্যকীয়। পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, মুছলমানের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সার-সম্পদ ও প্রাণ-বস্তু যে-ঈমান, সন্দেহের হলাহল দ্বারা তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলার জন্য আহলে-কেতাব দলপতিরা সর্ব্বদাই নানা প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে, বন্ধু সাজিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের প্রয়াস পাইতে থাকিবে। অতএব, হে মুছলমান! সাবধান, ইহাদের প্রপঞ্চে আত্মবিস্মৃত হইও না। এমন কি, ইহাদিগের মধ্যকার কেহ এছলাম গ্রহণ করিলেও, যাবৎ না কার্য্যের দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাবৎ তাহাদিগের প্রতিও আস্থাস্থাপন করিও না। বলা আবশ্যক যে, এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্র আজ পর্য্যন্ত অবিরামভাবে চলিয়া আসিতেছে।

২৯২ এছলাম-বৈরীদিগের মনস্তত্ত্ব

আহলে-কেতাব জাতিগুলি এছলামধর্ম্ম ও তাহার বাহন মুছলমান জাতিকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলার জন্য এত যে ব্যগ্র, তাহার মূলের মনস্তত্ত্বটা এই আয়তে প্রকাশ করা হইয়াছে। এহুদী, হিন্দু ও খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমাজগুলির প্রত্যেকের সাধারণ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সত্যধর্ম্ম ও আল্লার বাণী প্রাপ্ত হওয়ার বংশগত, দেশগত ও ভাষাগত অধিকার একমাত্র তাহাদের সমাজেরই একচেটিয়া হইয়া আছে। তাহারা ব্যতীত অন্য কোন দেশে, অন্য কোন যুগে, অন্য জাতির মধ্যে আল্লার কোন নবী বা রছুলের আবির্ভাব হয় নাই, হইতে পারে না— এবং তাহাদের মুনিঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত 'দেবভাষা' ব্যতীত জগতের অন্য কোন ভাষায় স্বর্গের বাণী প্রকাশিত হয় নাই, হইতে পারে না। ধর্ম্মের নামে, আল্লার নামে বিশ্বমানবের মধ্যে যে সংঘাত-সংঘর্ষ আর দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার-অবিচার, তাহার সৃষ্টি ও পুষ্টি সমস্তই সম্ভব হইয়াছে এই অন্যায় বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়া। বস্তুতঃ, স্বর্গীয়-কৌলিন্য ও দৈব-স্বত্বাধিকারের এই সব অসঙ্গত দাবীদাওয়ার কল্যাণে, তাহারা যুগপৎভাবে অস্বীকার করিয়াছে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম সাধ্য দুইটীকে—আল্লাহ্‌কে, আর তাঁহার 'সন্তান' মানুষকে।

সকল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা রাব্বুল্‌-আলামীন যিনি, সকল দেশের, সকল যুগের, সকল বর্ণের সমস্ত মানুষের প্রতি সমানভাবে ন্যায়বান ও করুণানিধান তাঁহার হওয়া চাই, এবং সে করুণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার শক্তি-সামর্থ্যও তাঁহার থাকা চাই। তিনি নিজের সন্দেশবাহক রছুলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় নিজের বাণী প্রচার করিয়া থাকেন, মানুষের কল্যাণের জন্য। সুতরাং, তাহা যদি কেবল এছরাইলীয় বা ভারতীয় সমাজ বিশেষের অথবা হিব্রু বা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই (তথ

কথিত) ঈশ্বর, হয় অন্যান্য দেশের মানুষের ও তাহার ভাষার কোন সংবাদ রাখেন না, নতুবা সেই সব দেশের মানুষকেও নিজের দেওয়া কল্যাণের অংশী হইতে দেওয়ার মত নিরপেক্ষতা বা শক্তিসামর্থ্য তাঁহার নাই। এহেন সসীমদৃষ্টি, পক্ষপাতী বা শক্তিহীন যিনি, তাঁহাকে ঈশ্বর বা খোদা বলিলেও পাপ হয়। এইরূপে, নিজেদের এই ভ্রান্তবিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের ও ঐশিক শাস্ত্রের নামে তাহারা প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছে প্রকৃত ঈশ্বরকে—সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান; ন্যায়স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনকে। জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা বলিয়া প্রকাশ করিতে এবং নিজেদের কএকজন গণিত ব্যক্তি ব্যতীত দুন্য়ার সমস্ত মানুষকে নীচ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, দাস ও দস্যু বলিয়া প্রচার করিয়া যাইতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইতেছে না—এই স্বকপোল কল্পিত দৈব-স্বত্বাধিকারের দোহাই দিয়া। তাহাদের সম্মান-সম্পদের মূল উৎস ইহাই। পোপ-পুরোহিতদিগের এই সব অধিকারের দাবীকে কঠোরতর কণ্ঠে প্রত্যাখ্যাত করিয়া এছলাম বিশ্বমানবের সার্ব্বজনীন অধিকার ঘোষণা করিতেছে, সকল দেশের, সকল বর্ণের, সকল খণ্ড-ধর্ম্মের সমস্ত মানুষকে—আল্লার সমস্ত বান্দা'কে লইয়া এক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-মহামণ্ডল সংগঠনের চেষ্টা করিতেছে। আহলে-কেতাবদিগের পণ্ডিত পুরোহিতরা তাই বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিতেছে—আল্লার কেতাব পাওয়ার অধিকারী এছরাইলের বংশধরগণ—আমরা। অন্য কোন গোত্রের লোক নবুয়ৎ পাইবে, কেতাব পাইবে, ইহা খুবই অসঙ্গত কথা। অতএব মোহাম্মদের নবুয়তের দাবী কখনও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আয়তের প্রথমাংশে তাহাদিগের এই অসঙ্গত অহমিকতার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা যেরূপ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছ, অন্যরাও তাহার অনুরূপ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই।

"তোমাদিগের প্রভুর সন্নিধানে তোমাদিগকে বিচারে পরাজিত করিবে"-পদে, 'প্রভুর সন্নিধানে'-অর্থে—"আল্লার প্রদত্ত কেতাব ও ন্যায়বুদ্ধিদ্বারা।" এহুদী ও খৃষ্টানরা দাবী করিতে-ছিল—মোহাম্মদ এছরাইল-বংশীয় নহেন, আর আল্লার কেতাব অনুসারে তাহারা ব্যতীত দুন্য়ার অন্য কোন বংশে আল্লার নবীর আবির্ভাব হইতে পারে না। সুতরাং আল্লার কেতাব বা তাওরাৎ ইঞ্জিল অনুসারে মোহাম্মদ কখনই নবী বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। তাহাদের উপস্থাপিত সেই "আল্লার কেতাব"কে অবলম্বন করিয়াও এছলাম তাহাদের এই দাবীকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রথমতঃ, এছরাইল-বংশীয়রা ব্যতীত অন্য কোন বংশের লোক নবী হইতে পারে না—প্রতিজ্ঞার এই উপক্রমটা তাহাদের কেতাব অনুসারেও অসঙ্গত। কারণ, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সদাপ্রভু মোশি (হজরত মুছা) কে বানি-এছরাইল সম্বন্ধে বলিতেছেন —"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। … কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহা বলে, … সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে" (দ্বিতীয়

বিবরণ)। বানি-এছরাইলের ভ্রাতৃগণ বলিতে বানি-এছমাইলকেই বুঝাইতেছে। কারণ এছরাইল ও এছমাইল উভয়ই এবরাহিমের সন্তান। বানি-এছরাইল ব্যতীত অন্য কোন বংশের লোক নবী হইতে পারেন না—প্রতিজ্ঞার এই উপক্রমটা তাহাদের স্বীকৃত তাওরাত হইতেও অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সাধারণভাবে তাহাদের উপস্থাপিত মূলনীতির প্রতিবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বানি-এছরাইলের ভ্রাতৃ-বংশীয় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়তের সত্যতাও এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

হজরত ঈছা সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীটী কোন মতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ:— (১) তিনি এছরাইল বংশীয়, এছরাইলের ভ্রাতৃ-বংশীয় নহেন। (২) হজরত মুছার সঙ্গে তাহার জীবনের আদৌ কোন সাদৃশ নাই, তিনি নিজেও কখন সেরূপ দাবী করেন নাই। (৩) ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে এবং তাওরাতের অন্যান্য স্থানে (সখরীয় ১৩—৩ প্রভৃতি) ইহাও বলা হইতেছে যে, এছরাইলীয়দিগের নিকট সদাপ্রভুর নামে নবুয়তের মিথ্যা দাবী উপস্থিত করিবে যে ভণ্ড ভাববাদী, তাহাকে নিহত হইতে হইবে। ক্রুশে নিহত ব্যক্তিগণ যে মালউন বা অভিশপ্ত, তাহাও বাইবেল হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে (গালাতীয় ৩—১৩)। আবার খৃষ্টানদিগের বাইবেল হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, যীশু ক্রুশে আবদ্ধ হইয়াই নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য তিনি কখনই হইতে পারেন না। বরং এই সমস্ত বর্ণনাদ্বারা তাঁহার নবুয়তের দাবীও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে—অবশ্য খৃষ্টানদিগের স্বীকৃত বাইবেল অনুসারে। পক্ষান্তরে হজরত মূছার সহিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-সাধনার সামঞ্জস্য সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান এবং কোরআন প্রকাশ্যভাবে এই সাদৃশ্যের দাবীও উপস্থিত করিয়াছে।

২৯৩ ফজল—প্রসাদ

ফজ্‌ল-শব্দের অর্থ grace বা প্রসাদ। নবুয়ৎ আল্লার প্রধানতম প্রসাদ, একমাত্র তিনিই হইতেছেন সে প্রসাদের অধিকারী, আর সে প্রসাদ হইতেছে বিপুল ও বিশাল। সুতরাং রাব্বুল-আলামীন বা সর্ব্বজগৎস্বামী আল্লার সে প্রসাদ, কোন ভৌগলিক বা গোত্রগত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ববিদিত—অর্থাৎ, কোন্ যুগে, কোন্ দেশের কোন্ গোত্রের কোন্ ব্যক্তিতে নবুয়তের মহাপ্রসাদকে ন্যস্ত করিলে বিশ্বমানবের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে, তিনি তাহা সম্যকরূপে অবগত।

২৯৪ নবী নির্ব্বাচনের হেতু

এই আয়তটী উপরের আয়তের পরিশিষ্ট মাত্র। "তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রসাদ দান করেন" —পূর্ব্ব আয়তের এই অংশ হইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে, আল্লার এই নবুয়ৎ-দান রূপ যে অনুগ্রহ, তাহা অহেতুক। অর্থাৎ, যাঁহাকে নবুয়ৎ দান করা হইতেছে, নবুয়ৎলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা লাভের নিজস্ব কোন যোগ্যতা হয়-ত তাঁহার ছিল না। ইচ্ছাময়

আল্লার ইচ্ছা হইল, আর দুন্য়ার যে-কোন একজন মানুষকে ধরিয়া নবী বানাইয়া দিলেন! এই সংশয়ের নিরাকরণ করার জন্য এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লার নবী-নির্ব্বাচনরূপ-অনুগ্রহ অহেতুক নহে। ব্যক্তি বিশেষকে নবীরূপে নির্ব্বাচন করার কারণ হইতেছে, তাঁহার করুণার নির্দ্দেশ। যে-পাত্র এই ভার বহনের উপযোগী ও অধিকারী—যাহাকে নবুয়ৎ দিলে আল্লার সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার বিরাট বিপুল রহমতের অংশভাগী হইতে পারিবে, নবুয়তের গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করার জন্য সেইরূপ মহান ও শক্তিমান মানুষকে তিনি নির্ব্বাচিত করিয়া ল'ন। পূর্ব্বে দেশগত বা গোত্রগত ধর্ম্মের আবশ্যক ও সার্থকতা ছিল—মানব জাতির তখনকার অবস্থা অনুসারে। তাই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক নবী রছুলগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এগুলিকে খণ্ড-নবুয়ৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানব জাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে, সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বমানবের সমীকরণের সুযোগ ও আবশ্যকতার সূত্রপাত হইল যখন, তখন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নির্ব্বাচন হইল—পূর্ব্বের সমস্ত খণ্ডকে সমন্বিত করিয়া এক অখণ্ড বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। এইরূপে সকল কল্যাণের, সকল রহমতের পুণ্যতম ও পূর্ণতম সমবায়ে, স্বর্গের ইঙ্গিতে বিশ্বমানবের জন্য যে মহাকল্যাণের আবির্ভাব হইতেছিল, তাহার যোগ্যতম বাহন ও শ্রেষ্ঠতম অধিকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন—বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা রহমতুল-লিল-আলামীন-রূপে। বিশ্বমানবের প্রতি আল্লার অনন্ত করুণার ইহাই ছিল অপরিহার্য্য নির্দ্দেশ।

২৯৫ কেন্তার—দীনার

এই ছুরার ১২ রুকু'তে আহলে-কেতাবদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—সকলে তাহারা সমান নহে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভীরু ও সাধু লোকও বিদ্যমান আছেন (:১২)। তাহাদিগের মধ্যকার কতক লোক সত্যকার বিশ্বাসী, আর তাহাদিগের অধিকাংশই ব্যভিচারী (১০৯)। এখানে বলা হইতেছে যে, তাহারা সকলে সমান নহে—ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে আহলে-কেতাবদিগের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মোটের উপর তাহাদের সাধারণ জাতীয়-চরিত্র। কিন্তু এই সাধারণ চরিত্রের বহির্ভূত এবং এ সমস্ত দোষত্রুটি হইতে মুক্ত, মহান চরিত্রের লোকও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। এই সব সাধু মহাজনদিগের চরিত্রের মহিমাকে কোরআন কখনও অস্বীকার করে নাই, অসম্মান দেখায় নাই।

"কেন্তার"-শব্দের অর্থ—বহু পরিমাণ, অপর্য্যাপ্ত, স্তুপাকার অর্থ। "দীনার" = তখনকার প্রচলিত ক্ষুদ্র স্বর্ণ-মুদ্রা। যথাক্রমে শব্দ দুইটীর ভাবার্থ—অধিক পরিমাণ ও অল্প পরিমাণ। "যদি-না তাহাদের মাথার উপর দাঁড়াইয়া থাক"—অর্থে, সে তোমাকে ফাঁকি দিতে না পারে, এজন্য সর্ব্বদাই সাক্ষী প্রমাণ, তলব তাকাদা ও নালিশ-ফরয়াদ ইত্যাদির দ্বারা তাহার ফাঁকি দেওয়ার শক্তি ও প্রবৃত্তিকে তুমি যদি ব্যর্থ ও বিকল করিয়া দিতে না পার, তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বিরত হইবে না। অর্থাৎ—সামান্য টাকা-সিকা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা ও

বিশ্বাসঘাতকতা করে—এরূপ লোকও যেমন আহলে-কেতাবদিগের মধ্যে আছে, সেইরূপ, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও নিজের ঈমান নষ্ট করিতে প্রস্তুত হয় না, এরূপ সাধু প্রকৃতির মহাজনদিগের অভাবও তাহাদের মধ্যে নাই। এখানে তাহাদের ঈমান ও বে-ঈমানীর বিচার করা হইয়াছে, টাকা-কড়ি সংক্রান্ত উদাহরণের মধ্য দিয়া। কারণ—সাধুতার দাবী ও ধার্ম্মিকতার দম্ভকে, সত্যকার সাধুতা ও ধার্ম্মিকতা হইতে পৃথক করিয়া লওয়ার ইহাই হইতেছে প্রধান কষ্টিপাথর।

২৯৬ আহলে-কেতাবদিগের মূল-মনোভাব

এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি যে সব আহলে-কেতাব জাতি দুন্‌য়ায় বিদ্যমান আছে, তাহাদের সাধারণ মনোভাব এই যে, ন্যায় ও ধর্ম্মের বিধান তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে একরূপ, আর পরজাতীয়দের সম্বন্ধে অন্যরূপ। এই জন্য নিজেদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাকে তাহারা অসঙ্গত বলিয়া মনে করে, অন্যদের প্রতি সেই ব্যবস্থার প্রয়োগ করিতে তাহারা ধর্ম্মের হিসাবে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। আল্লার নামে যে সব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার তাহারা করিয়া থাকে, তাহারই বরাত দিয়া তাহারা এই সব অন্যায় ব্যবস্থার সমর্থন করিতে চায়। কিন্তু, ন্যায়বান করুণানিধান আল্লাহ এরূপ অন্যায় আদেশ কখনই প্রদান করেন না, তাঁহার ন্যায়বিধান বিশ্বমানবের সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ সমস্ত তাহারা অবগত আছে এবং তাহা সত্ত্বেও আল্লার নামে ঐ সকল অবিচার ও অসাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছে !

বাইবেলের শিক্ষা হইতে জানা যায় যে, পরজাতীয়দিগের সঙ্গে এই অসঙ্গত ব্যবহার, এমন কি প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের অর্থ অপহরণ করাতেও অধর্ম্ম হয় না। বরং পরজাতীয়দিগের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতাই হইতেছে সদাপ্রভুর অভিপ্রেত। মিসর হইতে পলায়নের সময় স্বয়ং সদাপ্রভু পরমেশ্বর এছরাইলীয়দিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, রিক্ত হস্তে যাত্রা করা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। অতএব তাহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ প্রতিবাসিনীর কাছে গিয়া উৎসবের বাহানায় তাহাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারগুলি চাহিয়া আনিবে ও সেগুলি নিজেদের পুত্র কন্যার গায়ে পরাইয়া দিবে এবং অবশেষে সেগুলিকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে পলাইয়া যাইবে—"এরূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে (যাত্রাপুস্তক ৩—৩২)।" তাহার পর "ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্য অনুসারে কার্য্য করিল ; ফলে মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিল ; আর (এই প্রবঞ্চনার পথকে সহজ করার জন্য) সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল"—ঐ, ১২—৩৬। এহুদীদিগের পক্ষে কোন প্রকার সুদগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু খাতক যদি বিদেশী হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করাতে একেবারেই কোন দোষ নাই (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩—১৯, ২০)। সদাপ্রভু ঘোষণা করিতেছেন—সাত বৎসর পরে সমস্ত

ঋণ মা'ফ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পরজাতীয়-দিগের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না (ঐ, ১৫—৩)। খৃষ্টান-জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলার দরকার নাই। বিশ্বপ্রেম ও মুক্ত-মানবতার বহু যুগব্যাপী বাক্যাড়ম্বরের যে বাস্তব অর্থ খৃষ্টান-ইউরোপ হিদেন-জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাই আজ দুন্য়ার শোচনীয়তম সমস্যা। পক্ষান্তরে, শূদ্রে ব্রাহ্মণে ও আর্য্যে অনার্য্যে যে নির্ম্মম অসাম্যের ব্যবস্থা হিন্দু স্মার্ত্তরা শ্রীভগবানের নামে ভারতবর্ষে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে। ঠিক এই মনোভাবের ফলে আরবের আহ্লে-কেতাব সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা তাহাদের দলস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দিত যে, উম্মী বা নিরক্ষর আরবদিগের সম্বন্ধে ন্যায় ও নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করার দরকার নাই।

"উম্মী"-শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে "নিরক্ষর" বলিয়া। উহার বহুবচন أُمِّيِّين উম্মিয়ীন। আরবগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ছিল বলিয়া, এহুদীরা তাহাদিগকে উম্মী বলিয়া আখ্যাত করিত, ইহাই সাধারণ ধারণা। আমাদের মনে হয়, এই সম্বোধনের মধ্যে আরও একটু রহস্য আছে। আরবীতে যেমন একবচনের শেষে ين বা 'ইন' যোগ করিয়া তাহাকে বহুবচন বানান হয়, হিব্রুতে সেইরূপ যোগ করা হয় يم বা 'ইম'। ফলতঃ আরবী উম্মিয়ীন ও হিব্রু উম্মিয়ীম একই শব্দ। Psalms বা গীত-সংহিতায় (২—১, ৯—৫) এই শব্দের উল্লেখ আছে। উহার অর্থ Heathen ও Wicked অর্থাৎ বিধর্ম্মী এবং দুষ্ট ও অসাধু উভয়ই হইতে পারে। * আমাদের দেশেও যেমন যবন, ম্লেচ্ছ, অসুর, দাস প্রভৃতি বিশেষণের সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই শ্রেণীর শব্দগুলিই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র-রচয়িতাদিগের মূল-মানসিকতার স্পষ্ট প্রতীক।

এহুদীদিগের এই মানসিকতা সম্বন্ধে মুছলমানকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই হইতেছে এই উক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। মুছলমান বন্ধু ভাবিয়া, বিশ্বাস করিয়া, তাহাদের কাহারও নিকট নিজেদের গুপ্তকথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছে, সুতরাং তাহা শত্রুপক্ষকে জানাইয়া দিলে অধর্ম্ম হইবে, বিশ্বাসঘাতকতা হইবে—আহ্লে-কেতাবদিগের মধ্যকার অনেকেই এইরূপ মহৎভাব পোষণে অসমর্থ। রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য সমস্ত ন্যায় নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে তাহারা একবিন্দুও কুণ্ঠা বোধ করে না। বরং এইরূপ প্রবঞ্চনাদ্বারা প্রতিপক্ষের গুপ্তরহস্যগুলি অবগত হওয়া এবং সেগুলিকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাকেই তাহারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ৭২ আয়তে অমুছলমানের উপর আস্থাস্থাপন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ঐ নিষেধের হেতুবাদটাই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

* Scott ও Henry—বাইবেলের টীকা এবং Biblica, Gentile, Heathen প্রভৃতি।

২৯৭ বিষয় কর্ম্মে সাধুতা

মুখে ধার্ম্মিকতার দাবী বা পরহেজগারীর দম্ভ করিলে অথবা শুধু কেবল রোজা রাখিয়া বা নামাজ পড়িয়া গেলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম্মের পরীক্ষা গৃহীত হয় সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে—বিষয় কর্ম্মের মধ্য দিয়া। বিষয় কর্ম্মে যে ব্যক্তি সংযমী ও সত্যপরায়ণ না হইতে পারে, আল্লার হুজুরে সে কখনই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয় না। আল্লার প্রেমভাজন তাহারাই, যাহারা নিজেদের সত্য-রক্ষার জন্য সদাতৎপর, আর বিষয় কর্ম্মে যাহারা সদাসংযত।

তাক্ওয়া বা সংযম শব্দের বিশদ তাৎপর্য্য অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পাঠকগণকে বিশেষভাবে জানাইতে চাই যে, তাক্ওয়া positive বা ভাবাত্মক শব্দ নহে, উহা একটা nagative অভাবাত্মক বা নেতিমূলক অর্থবাচক শব্দ। সহজ কথায়, যে সব কাজ করার, তাহা করার নাম তাক্ওয়া নহে—বরং যে কাজগুলি না করার, তাহা না করার নামই তাক্ওয়া। রোগী ঔষধ খাইবে, সুপথ্য গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার জন্য বিশেষ দরকারী ও উপকারী উভয়ই, অন্যথায় তাহাকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে আত্মঘাতী ও অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, ঔষধ সেবন ও সুপথ্য গ্রহণের নাম 'পরহেজ' নহে। কুপথ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকার জন্য রোগীর যে আত্মসংযম, পরহেজ বলিতে কেবল তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে, নামাজ, রোজা প্রভৃতি সাধনাগুলি অতি দরকারী ও অতি উপকারী এবাদৎ। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল নামাজ রোজা পালন করিয়া মানুষ পরহেজগার হইতে পারে না। সেজন্য দরকার—মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্ব অপহরণ, হিংসা বিদ্বেষ ও অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মার সর্ব্বনাশকারী কুপথ্যগুলি হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলার। এই শ্রেণীর কুপথ্য হইতে আত্মরক্ষা করার নামই তাক্ওয়া বা পরহেজগারী। এছলামিক সাধনার এই ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দিক দুইটার প্রতি যুগপৎভাবে সমান দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে, সমাজের দুই চরমপন্থী-দলে দুইটা বিপরীতমুখী ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একদল তাক্ওয়ার দোহাই দিয়া অবশ্য পালনীয় এবাদৎগুলিকে-পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া বসিয়াছেন, আর একদল এবাদৎকেই তাক্ওয়া বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, সত্যভঙ্গ, পরস্ব-অপহরণ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি ও কদর্য্যপাপ হইতে নিজের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণভাবে বারিত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাওয়া—ইহারই নাম তাক্ওয়া, সংযম বা পরহেজগারী। এছলামিক সাধনার এই ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক কর্ত্তব্যগুলির প্রতি যুগপৎভাবে সমান লক্ষ্য না রাখার ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে, নামাজ রোজা সম্বন্ধে মনোযোগের অভাব যাঁহাদের একটুও নাই, তাঁহারাও আবার পার্থিব স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে মিথ্যা কথা কহিতেছেন, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা করিতেছেন, পরস্ব হরণ করিতেছেন, জাল জালিয়াতে লিপ্ত হইতেছেন—ইত্যাদি। নামাজ না পড়িলে বা রোজা না রাখিলে মানুষকে এই সমাজে যেরূপ নিন্দা ও বিরাগভাজন হইতে হয়, উপরোক্ত অপকর্ম্মগুলি তাহাদের মনে সেরূপ ঘৃণা বা বিরাগের সৃষ্টি

করিতে পারে না। অথচ কোরআন ও হাদিছের নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, শেষোক্তগুলিই অপেক্ষাকৃত মারাত্মক পাপ। কারণ, এগুলি হইতেছে হকুকল-এবাদ সংক্রান্ত অপরাধ এবং আল্লাহ এগুলিকে ক্ষমা করিবেন না।

২৯৮ অঙ্গীকার ভঙ্গের দণ্ড

"আল্লার অঙ্গীকার" অর্থে—যে অঙ্গীকার আল্লার নামে বা তাঁহার হুজুরে করা হইয়াছে, অথবা যে অঙ্গীকার পালন করা আল্লার ন্যায়বিধান অনুসারে মানুষ মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। "কালিল" অর্থে—অল্প, সামান্য। ছুরা নেছায় বলা হইয়াছে—قل متاع الدنيا قليل দুন্য়ার ধনসম্পদ সমস্তই সামান্য (৭৭)। ফলে, ন্যায় ও সত্যের বিনিময়ে দুন্য়ার সমস্ত ধনসম্পদও যদি সঞ্চিত হয়, তাহাও সামান্য। "পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই"—অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের পরম লভ্য যাহা, তাহার একটু সামান্য অংশও তাহারা প্রাপ্ত হইবে না, আখেরাতের সমস্ত নে'মৎ হইতেই তাহারা বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। "আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না এবং তাহাদের পানে দৃক্‌পাতও করিবেন না"—পদটা ভাবার্থে ব্যবহৃত। উহার তাৎপর্য্য এই যে, এই সব কুকর্ম্মের ফলে নিজদিগকে তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলিবে। "তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না"—পদে খৃষ্টানদের doctrine of atonement বা প্রায়শ্চিত্তবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের সার এই যে, মানুষ সৃষ্টি করিয়া সদাপ্রভু, যে মহাসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার সমাধান তিনি করিয়া দেন যীশুরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া। অথবা আপনার একজাত পুত্র যীশুকে মানব-রূপে মর্ত্তে পাঠাইয়া এবং তাঁহার দুঃখভোগ ও আত্মবলিদানদ্বারা ভক্তজনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া। যে কোন ব্যক্তি যীশুর এই আত্মবলিতে বিশ্বাস করিবে, সদাপ্রভু পরলোকে তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া এখানে বলা হইতেছে—যাহারা দুন্য়ার সামান্য স্বার্থের জন্য নিজেদের সত্য ভঙ্গ করে, অথবা আল্লার বান্দাদের স্বত্ব, অধিকার, সম্পদ ও সাম্রাজ্যাদি হরণ করে, আল্লাহ কখনই তাহাদিগের পাপ বিনাদণ্ডে মোচন করিয়া দিবেন না। কারণ, তাহা হইলে আল্লার ন্যায়বিচারের সম্মান থাকে না।

কোরআনের বহুস্থলে মুছলমানের লক্ষণ-স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক হইবে না, অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী হইবে না (৪—১৬, ২৩—৮, ৭০—২৩, ৮—২৭)। হজরত রছুলে করিম প্রায় তাঁহার প্রত্যেক খোৎবাতেই বলিতেন—

لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهد له

বিশ্বাসঘাতকের ধর্ম্ম নাই, অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীর ঈমান নাই (মেশ্‌কাৎ)। বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতির বিভিন্ন রেওয়ায়তে মোনাফেক বা কপটদিগের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই সব রেওয়ায়তের সারমর্ম্ম একত্রে এইরূপ :—"হজরত বলিতেছেন, মোনাফেকের লক্ষণ চারিটী।

সেই চারিটা একসঙ্গে যাহার মধ্যে বিদ্যমান, সেই হইতেছে নিছক কপট, আর যাহার মধ্যে একটা লক্ষণ আছে সে ঃ অংশ কপট—যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, আর মনে করে যে সে মুছলমান। সেই লক্ষণগুলি এই ঃ—(১) কোন বস্তু তাহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, (২) কথা বলিতে গেলেই মিথ্যা বলে, (৩) অঙ্গীকার করিলে তাহা ভঙ্গ করে, (৪) আর রাগ হইলে অশ্লীল কথা বলিতে থাকে।" কবীরা-গোনাহ বা মহাপাতকের বর্ণনাকালে শের্ক বা অংশীবাদের সঙ্গে সঙ্গে হজরত রছুলে করিম মিথ্যা-দিব্য ও মিথ্যা-সাক্ষ্যকেও এই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন (বোখারী, মোছলেম)।

এই সমস্ত আয়তে আহলে-কেতাবদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এছলামের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে এই সমন্বয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ৭৩ হইতে ৭৬ আয়ত পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশ্বাসের পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে তাহাদের যে মানসিকতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রধান অন্তরায় তাহাই। মূলতঃ তাহাদের এই মনোভাবটাই কখনও কৌলিন্য গৌরবের অহঙ্কারের মধ্য দিয়া, আর কখনও বা পরস্ব হরণের হীন প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, বিশ্বমানবের মধ্যে এক সর্ব্বনাশী সংঘাত সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—ধর্ম্মের নামকরণে। ফলতঃ এই মনোভাবটাই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের পথে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে, সেই জন্য এই প্রসঙ্গে এখানে তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

২৯৯ ধর্ম্মগ্রন্থের বিকৃতি

মূলে আছে يلوون السنتهم ইহার শাব্দিক অনুবাদ ঃ—তাহারা নিজেদের জিহ্বাগুলিকে কেতাব পাঠকালে পাক দিয়া বা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ শাব্দিক অনুবাদ গ্রহণ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু لوى لسانه بكذا আরবী সাহিত্যে ইডিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উহার অর্থ হয়—الكذب و تخرص الحديث মিথ্যা বলা এবং কোন একটা কথা বা সংবাদ গড়িয়া লওয়া (রাগেব)। আলোচ্য আয়তটীকেই এমাম রাগেব এই ব্যবহারের নজিররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। লেছানুল-আরব প্রভৃতি প্রাচীন অভিধানে এই তাৎপর্য্যেরই উল্লেখ দেখা যায়। ফলতঃ যাহা সত্য নহে তাহাকে সত্যরূপে প্রকাশ করা, সত্যকে গোপন করিয়া তাহার স্থলে একটা মিথ্যাকে প্রকাশ করা, এই পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সত্যসত্যই জিহ্বায় মোচড় দিয়া কেতাব পাঠ করা উহার তাৎপর্য্য কখনই নহে। ধর্ম্মগ্রন্থের এই বিকার সাধিত হয়—এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইয়া, কোন শ্লোককে লুপ্ত করিয়া অথবা কোন একটা কল্পিত শ্লোককে তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া অথবা প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে অন্য বিকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া। দুনয়ার সকল দেশের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থাধিকারীরা আবহমান কাল হইতে নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর অনাচারে লিপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

যে পুস্তকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত, তাহার সম্বন্ধে এই কথা। ইহা ব্যতীত, তাহাদের পণ্ডিত পুরোহিতরা স্বহস্তে বহু পুথি-পুস্তক রচনা করিয়া লইয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, এই শাস্ত্রগুলিও সদাপ্রভু ও শ্রীভগবানের নিকট হইতে সমাগত। আয়তের শেষভাগে শেষোক্ত প্রকারের অনাচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের এই সব অনাচারের বহু অকাট্য প্রমাণ মোস্তফা-চরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩০ যীশুর নামে অপবাদ

আল্লার কেতাব সম্বন্ধে যে অনাচারের অভিযোগ উপরের আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, খৃষ্টানদের সম্বন্ধে তাহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য সাধু পৌলের যুগ হইতেই খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তকেরা আল্লার নামে মিথ্যা রচনা করিয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিকার ঘটাইয়া আসিতেছেন। এই শ্রেণীর জাল ও প্রবঞ্চনা তাঁহাদের পরিভাষায় "Pious fraud" বা সাধু-প্রবঞ্চনা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান সাধুরা এই জাল জুয়াচুরির কথা সগৌরবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাধু পৌল বলিতেছেন—"কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিওবা এখন পাপী বলিয়া বিচারিত হইতেছি কেন?"—বাইবেল, রোমীয় ৩—৭। বিশপ Eusebius খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তিনি নিজেই সদম্ভে ঘোষণা করিতেছেন—I have related whatever might be rebounded to the glory, and I have suppressed all that could tend to the disgrace, of our religion. অর্থাৎ, যাহা কিছুদ্বারা আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, সে সমস্তই আমি (বাইবেলে) সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি, পক্ষান্তরে যাহা কিছুদ্বারা আমাদের ধর্ম্মের গৌরব হানি হইতে পারে, সে সমস্তই আমি গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।" ক্যাসাউবন Casaubon বলিতেছেন—I am much grived to Observe, in the early ages of the *Church*, that there were very many who deemed it praisworthy to assist the divine word with their own fictions, that their new doctrine might find a readier admittance among the wise men of the Gentiles. অর্থাৎ—"অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, অখৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা যাহাতে খৃষ্টান ধর্ম্মমতকে সত্বর মন্জুর করিয়া লয়, এজন্য নিজেদের কল্পিত মিথ্যা রচনাদ্বারা স্বর্গীয় বাণীর সাহায্য করা অনেকেই গৌরবজনক কাজ বলিয়া মনে করিতেন।" "—and whenever it was found the new Testament did not at all points suits the intrest of its Priesthood, or the views of political rules in league with them, necessary alterations were made, and all sorts of pious frauds and forgeries were not only Common but justified by many

of the fathers. "—এবং যখনই দেখা যাইত যে, নূতন নিয়ম (খৃষ্টানদের বাইবেল) পুরোহিতদের স্বার্থের অথবা তাহাদের দলস্থ রাজনৈতিক শাসকবর্গের অভিমতের অনুকূল হইতেছে না, তখনই আবশ্যক মত তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইত, এবং সকল প্রকারের সাধু-প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি তখন যে শুধু সাধারণ হইয়াছিল, তাহা নহে—বরং খৃষ্টান পুরোহিতরা ইহাকে সঙ্গত বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতেন।" শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টান পাদ্রী পুরোহিতদের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনাচারও যে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, পাশ্চাত্য জগতের বহু খৃষ্টান লেখকের মুখেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ আজ দুন্‌য়াময় প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু আজ হইতে ১৪ শতাব্দী পূর্ব্বে কোরআন তাহাদের এই জাল জুয়াচুরির কথা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

এই শ্রেণীর জালজুয়াচুরি এবং শাব্দিক ও আর্থিক বিকার সাধন করার পর, তাহারা দুন্‌য়াকে বুঝাইতেছে যে, যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, স্বয়ং যীশুই এ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়তে মানুষের সাধারণ জ্ঞানবিবেকের দিক দিয়া এই দাবীর প্রতিবাদ করা হইতেছে। একজন মানুষকে আল্লাহ নিজের "বাণী" প্রদান করিলেন, সেই বাণীকে সম্পূর্ণভাবে প্রাণগত করার উপযোগী প্রজ্ঞাও তাঁহাকে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন—সেই বাণীকে বিশ্বমানবের কাছে পৌছাইয়া দিতে। এই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার পরও, কোন মানুষ—নিজের প্রজ্ঞা ও আল্লার কালামের বিপরীত—একথা কখনই বলিতে পারেন না যে, আল্লাহ্‌কে ব্যতিরেকে মানুষ পূজা করিবে তাঁহার। এরূপ কথা বলা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বা শোভনীয় নহে। ফলতঃ হজরত ঈছার পক্ষে ঐরূপ বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। প্রচলিত বাইবেলে তোমাদের উক্তির অনুকূল কিছু থাকিলে তাহা তোমাদের নিষ্ঠুর "ধার্ম্মিক জালিয়াত" ছাড়া আর কিছুই নহে।

আয়তের প্রথমে بشر বা মানুষ শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে যে, যীশু মানুষ ছিলেন, তাঁহার অবতারবাদও তোমাদের মিথ্যা-রচনা মাত্র। আয়তে বর্ণিত من دون الله পদের অর্থ হইবে—"আল্লাহ ব্যতিরেকে।" আল্লার এবাদৎ ত্যাগ করিয়া কাহারও পূজা করা যেমন ইহার অন্তর্গত, সেইরূপ আল্লার পূজার সঙ্গে সঙ্গে আর কাহারও পূজা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। "আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া" বলিয়া অনুবাদ করিলে, উহার অর্দ্ধেক তাৎপর্য্য বাদ পড়িয়া যায়।

৩০১ রাব্বানী

রাব্বানী, রব শব্দ হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—ঈশ্বরপরায়ণ, Godly, খোদা-পরস্ত, আল্লাহ-ওয়ালা। রাব্বানী ও রাব্বী শব্দ কোরআনের অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে। বাইবেলের বহুস্থানেও এই রাব্বী ও রাব্বানী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বাইবেল লেখকগণ কখনও উহার অর্থগ্রহণ করিয়াছেন my lord, my master, আমার প্রভু, আমার মনিব, অথবা শুধু প্রভু

ও মনিব বলিয়া—আবার কখনওবা পণ্ডিত পুরোহিতদের বিশেষ উপাধিস্বরূপে এই শব্দ দুইটীর ব্যবহার হইয়াছে। প্রথমটা খৃষ্টানদের অভিনব আবিষ্কার, এহুদীরা শেষোক্ত অর্থেই এই শব্দ দুইটীর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। এবরানী সাহিত্যেও উহার অর্থ—ঈশ্বরপরায়ণ বা আল্লাহ-ওয়ালা, এবং এই অর্থেই তাহারা ধার্ম্মিক ও সাধু মহাজনদিগকে রাব্বী ও রাব্বানী বলিয়া বিশেষিত করিত। কালক্রমে তাহাদের তাওহীদ-সংক্রান্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, "প্রভুপরায়ণ" ও "ভাগবৎ" প্রভৃতি শব্দগুলিকে "প্রভু" ও "ভগবান"-অর্থে বব্যহার করিয়া তাহারা অতি জঘন্য নরপূজার সূত্রপাত আরম্ভ করিয়া দিল।

নবীদিগের পক্ষে কিরূপ কথা বলা সম্ভব বা শোভনীয় নহে, আয়তের প্রথম-অংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া থাকে, আয়তের শেষভাগে ও পরবর্ত্তী আয়তে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়তে নীতির হিসাবে, নবীদিগের কথা সাধারণভাবে বর্ণিত হইলেও, হজরত ঈছার শিক্ষাই এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য। তাঁহার সমসাময়িক এহুদী-পণ্ডিতরা লোকদিগকে তাওরাৎ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিত, এবং মেদ্রাছের (মাদ্রাছার) ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকিত। এই শ্রেণীর জ্ঞান-সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তাহার প্রভুর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে, নিজকে রাব্বানী অর্থাৎ Godly বা ঈশ্বরপরায়ণরূপে গড়িয়া তুলিবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার চেষ্টা পাওয়াই যুগ-নবী হজরত ঈছার কর্ত্তব্য ছিল এবং সে কর্ত্তব্য তিনি যথাযথভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অধ্যয়নে-অধ্যাপনে ব্যাপৃত উপরোক্ত এহুদী-দিগকে নরপূজার—আত্মপূজার—আদেশ প্রদান করিবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

৩০২ ফেরেশতা-পূজা ও নবী-পূজা

ফেরেশ্‌তা ও নবীকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করার বড় নজির হইতেছে খৃষ্টানদিগের মতবাদ। নিজেদের ত্রিত্ববাদের আকিদায় তাহারা জিব্রাইল ফেরেশ্‌তাকে Holy ghost বা পবিত্রাত্মা বলিয়া, এবং হজরত ঈছাকে God the son বা পুত্র-ঈশ্বর বলিয়া, আর দুইটী পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া লইয়াছে ! আয়তে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লার সত্য-নবী হজরত ঈছা এই অসত্য ও অসঙ্গত শিক্ষা এহুদীদিগকে কখনই প্রদান করেন নাই। এ সমস্ত খৃষ্টান-পুরোহিতদিগের কৃত জাল ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৭৮ ও ৭৯ আয়ত যে পরস্পর-সংলগ্ন, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। ৭৯ আয়তে "মোছলেম"-শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া তফছিরকারগণ সাধারণতঃ মনে করিয়াছেন যে, এই আয়ত দুইটী হজরত মোহাম্মদের সম্বন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধারণার পোষকতায় দুইটী রেওয়ায়তের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। প্রথমটী হজরত এবনে আব্বাছের নামকরণে প্রচারিত। ইহার সারমর্ম্ম এই যে, নাজরান-ডেপুটেশনের খৃষ্টান-পাদ্রীরা অবশেষে হজরতকে বলিয়াছিল—খৃষ্টানরা যেরূপে যীশুকে ঈশ্বর বানাইয়া তাঁহার পূজা করিতেছে, তোমাকে আমরা সেইরূপে

ঈশ্বর বানাইয়া লই আর তোমার পূজা করিতে থাকি, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? আলোচ্য আয়ত দুইটী এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই বিবরণের ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক না তুলিয়া, দুইটী সাধারণ যুক্তির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, নাজরান-ডেপুটেশনের মেম্বররা নিজেরাই ছিল খৃষ্টান, এবং যীশুকে অন্যায়রূপে ঈশ্বর বানাইয়া লইয়া তাহারা তাঁহার পূজা করিতেছে—ইহাই ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে হজরতের প্রধান আপত্তি। হজরতের উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করার সময় তাহারই আবার নিন্দাচ্ছলে খৃষ্টানদিগের সেই যীশু-পূজার উল্লেখ করিতেছে, এ কেমন কথা! যীশু-পূজার নিন্দা-ভাজন খৃষ্টান'ত তাহারাই। দ্বিতীয়তঃ, আয়তে "মোছলেম"-শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার জন্য, তাহা যদি হজরত ঈছার সম-সাময়িক এহুদীদিগের প্রতি প্রযোজ্য না হইতে পারে, তাহা হইলে ঠিক ঐ কারণে হজরতের সমসাময়িক খৃষ্টানদিগের প্রতিও তাহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এ হিসাবে তাহারাও'ত অ-মোছলেম।

দ্বিতীয় রেওয়ায়তটী হাছান হইতে বর্ণিত। তিনি বলিতেছেন—ছাহাবাগণের মধ্যকার "কোন এক ব্যক্তি" হজরতকে বলিয়াছিলেন—আমরা পরস্পরকে যেরূপ ছালাম করি, আপনাকেও সেইরূপ ছালাম করিয়া থাকি। ইহার পরিবর্তে আমরা আপনাকে সেজদা করিতে পারি কি? এই প্রশ্নের উত্তরেই নাকি আলোচ্য আয়ত দুইটী প্রকাশিত হইয়াছিল। তফছিরের সাধারণ রেওয়ায়তগুলির ন্যায় ইহারও ঐতিহাসিক মূল্য একটুও নাই। ঘটনার দীর্ঘকাল পরে হাছানের জন্ম। তিনি কোথায় কোন্ রাবী-পরম্পরাদ্বারা বিষয়টা অবগত হইয়াছেন, তাহারও কোন আভাস দেন নাই। অন্যদিকে, দীর্ঘ দুই যুগ ধরিয়া মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষা, সাধনা ও আদর্শের সহিত নিবীড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার পর, তাঁহার কোন ছাহাবা এমন নির্ম্মমভাবে সে শিক্ষার অপচয় ঘটাইতে চাহিবেন, ইহা একেবারেই অস্বাভাবিক কথা। অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এরূপ বর্ণনায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

তফছিরকারগণের আসল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—৭৯ আয়তে বর্ণিত "মোছলেম"-শব্দকে উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু কোরআনের পাঠক মাত্রই স্বীকার স্বীকার করিবেন যে, হজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে ও তাঁহাদের অনুসরণকারী বিশ্বাসীবর্গকেও কোরআনের বহুস্থানে মোছলেম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, (দেখ :—৫১—৩৬, ৩—৬৬, ২—১২৮ প্রভৃতি)। ছুরা হজ্জের শেষ আয়তে স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছে যে, এই মোছলেম নামটী স্বয়ং আল্লারই প্রদত্ত এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের ন্যায়, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগের অনুসারী বিশ্বাসীবর্গকেও তিনি এই উপাধিভূষিত করিয়াছেন। হজরত ঈছার সমসাময়িক যে সমস্ত সাধুসজ্জন তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, এই হিসাবে তাঁহারা সকলেও মোছলেম ছিলেন। মুফতী আবদুহু বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই মতের সমর্থন করিয়াছেন (৩—৩৪৯)।

৯ রুকু
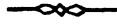
৮০ আর, আল্লাহ যখন নবীদিগের (মা'রফতে) অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন ঃ— এই যে আমরা তোমাদিগকে কেতাব ও প্রজ্ঞা প্রদান করিয়াছি (ইহার যুগ শেষ হওয়ার) পরে সেই রছুল যখন তোমাদিগের সমীপে সমাগত হইবে—তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে - তাহার সত্যতার সমর্থকরূপে, তোমরা তখন অবশ্য অবশ্য তাহার প্রতি ঈমান আনিবে আর অবশ্য অবশ্য তাহাকে সাহায্য করিবে! তিনি বলিলেন ঃ—তোমরা কি অঙ্গী-কার করিতেছ আর (তোমরা কি) আমার হুজুরে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছ ? তাহারা বলিল ঃ—"অঙ্গীকার করিলাম"। তিনি বলিলেন—তাহা হইলে সাক্ষী থাক তোমরা, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী হইয়া থাকিতেছি।

৮১ অতএব ইহার পর ফিরাইয়া

٨٠ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞

٨١ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ◎

দাঁড়ায় যে সব ব্যক্তি, ব্যভিচারী'ত তাহাঁরাই।

٨٢ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ◎

৮২ তবে কি তাহারা আল্লার (স্বাভাবিক) ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের সন্ধান করিতে চায়!—অথচ স্বর্গের ও মর্ত্তের সব কিছু তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে — ইচ্ছায় বা বিনা-ইচ্ছায়, আর তাহাদের (সকলকে) ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাঁহারই পানেঁ।

٨٣ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز

৮৩ বলিয়া দাও, (মুছলমান-) আমরা, ঈমান আনিয়াছি আল্লার প্রতি, আর আমাদের প্রতি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে - তাহাতে, এবং এবরাহিমের ও এছমাইলের ও এছহাকের ও য়্যাকুবের আর তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে - তাহাতে, আর মূছা ও ঈছা যাহা প্রদত্ত হইয়াছিলেন — তাহাতে, এবং (ইহা ব্যতীত অন্য) সমস্ত নবী তাঁহাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছেন - তাহাতে (বিশ্বাস করি); তাঁহাদিগের মধ্যকার কাহারও সম্বন্ধে কোন

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

প্রভেদ আমরা করি না, আর আমরা হইতেছি তাঁহাতেই আত্মসমর্পিত (=মোছলেম)।

٨٤ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৮৪ বস্তুতঃ এছলামকে বাদ দিয়া 'ধর্ম্মের' সন্ধানে যত চেষ্টাই করুক না কেহ, তাহার পক্ষের সে চেষ্টা (আল্লার হুজুরে) কখনই গৃহীত হইবে না, অধিকন্তু পরকালে সে হইবে সর্ব্ববিনষ্ট-দিগের একজন।

٨٥ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮৫ আল্লাহ্ কেমন করিয়া হেদায়ৎ করিবেন সেই জাতিকে, নিজে-দের (অতীত) ঈমানের পর (বর্ত্তমানের সত্যকে) যাহারা অমান্য করিল, অথচ তাহারা প্রত্যক্ষ্যভাবে জানিয়াছে যে, এই রছুল হইতেছে সত্য, আর (এই সত্যতার সমর্থনে) বহু স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণও তাহাদিগের নিকট সমাগত হইয়াছে; বস্তুতঃ অত্যাচারী জাতিকে আল্লাহ হেদায়ৎ করেন না।

٨٦ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ

৮৬ এই যে লোক সমাজ, ইহাদের (কৃতকর্ম্মের) প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লার লা'নৎ

এবং ফেরেশ্‌তাদিগের ও মানুষের সকলের (লা'নৎ)—

أَجْمَعِينَ ۙ

৮৭ সে লা'নতের মধ্যে চিরস্থায়ী তাহারা, না তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে আর না তাহাদিগকে অবসর দেওয়া হইবে—

٨٧ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۙ

৮৮ কিন্তু অতঃপর যাহারা তাওবা করে এবং (নিজেদের অবস্থার) সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে (জানা উচিত যে) আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

٨٨ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৮৯ নিশ্চয়, নিজেদের ঈমানের পর কাফের হইয়া যায় যাহারা, আর সেই কোফ্‌রকে তাহারা ক্রমশই বাড়াইয়া চলিতে থাকে, তাহাদের তওবা কখনই গৃহীত হইবে না, নিশ্চয় পথভ্রষ্ট'ত তাহারাই।

٨٩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

৯০ নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়া যায় আর (কাফের) অবস্থাতেই যাহাদের মৃত্যু ঘটে, সে অবস্থায় সারা ভূমণ্ডল ভরা স্বর্ণ তাহাদের কাহারও পক্ষ হইতে কদাচ মন্‌জুর হইতে পারে না—যদিও

٩٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِافْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۟

সে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ব্যয় করিয়া ফেলে[৩০৩]; এই'ত তাহারা, যাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত আছে) পীড়াদায়ক দণ্ড, অথচ কেহই নাই তাহাদিগের সাহায্যকারী।

টীকা:—

৩০৩ **নবীদিগের অঙ্গীকার**

এই অংশের তফছির সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল তফছিরকারের মতে, আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নবীগণের নিকট হইতে। অন্যরা বলিয়াছেন—নবীগণের অঙ্গীকার অর্থে, নবীগণের মধ্যবর্ত্তিতায় গৃহীত তাঁহাদের উম্মত সমূহের অঙ্গীকার। ইহার অনুকূল নজির কোরআনে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন, ছুরা তালাকে বর্ণিত হইয়াছে—يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ ইহার শাব্দিক অনুবাদ:—হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দিবে। কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখানে "নবী" বলিয়া তাঁহার উম্মৎ বা সমগ্র মুছলমান সমাজকে আহ্বান করা হইয়াছে। ঠিক এইরূপ, আলোচ্য আয়তে দুনয়ার সমস্ত আম্বিয়ার সকল উম্মৎকে বুঝাইতেছে। সেই প্রতিশ্রুত রছুল বলিতে যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বুঝাইতেছে, ইহাও অধিকাংশ টীকাকারের মত, এবং যুক্তিপ্রমাণের হিসাবে ইহাই সঙ্গত অভিমত। প্রত্যেক নবী ও রছুলের মারফতে আল্লার যে যে বাণী ও হেদায়ৎ সমাগত হইয়াছে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নবীর মারফতে প্রকাশিত সেই বাণীতেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন-সন্দেশ অতি স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক উম্মৎকেই তাঁহার অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করা হইয়াছে।

৩০৪ **সেই প্রতিশ্রুত নবী**

দেশ বিশেষ, যুগ বিশেষ বা বংশ বিশেষের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে সব ধর্ম্ম, সেগুলির যুগ একদিন শেষ হইয়া যাইবে, আর সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য সেই খণ্ডধর্ম্মগুলির সমবেত ভিত্তির উপর এক সর্ব্বব্যাপী চিরস্থায়ী ও পূর্ণতম বিশ্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা হইবে—ইহাই আল্লার নির্দ্দেশ। দুনয়ার সমস্ত নবীকে নিজের বাণী ও প্রজ্ঞা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

সেই ভাবীধর্ম্মের ও তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভ-সন্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখিয়াছেন, এবং নবীদিগের মারফতে তাঁহাদের উম্মতগণকে এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সেই অনাগত মহানবী যখন সমাগত হইবেন, তখন তাঁহাকে সাহায্য করা এবং একমাত্র তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ করাই পূর্ব্বকার সকল নবীর সকল উম্মতের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

সত্যনবীর যে বিশেষণ এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ও সঙ্গত বিশেষণ হইতে পারে না। কোরআন বলিতেছে—সেই প্রতিশ্রুত মহানবীর বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি জগতের কোন নবীকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিয়া এবং তাঁহাদের মারফতে প্রকাশিত কোন ধর্ম্মকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চণা বলিয়া প্রকাশ করিবেন না। বরং প্রত্যেক নবীকে ও তাঁহাদের প্রকাশিত প্রত্যেক ধর্ম্মকে তিনি আল্লার হুজুর হইতে সমাগত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, আর এই বিশ্বাসই হইবে তাঁহার ধর্ম্মের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকল নবীর প্রতিশ্রুত সেই রছুল তিনিই হইতে পারেন, অতীতের সকল নবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার মত শিক্ষা ও শক্তি যাঁহার যথেষ্ট আছে। সেই লক্ষণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাতেই পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, এ সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে, সেই প্রতিশ্রুত শেষ-নবী যে তিনিই, এ-দাবী একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই করিয়াছেন—তিনি ব্যতীত আর কোন নবীই এ-দাবী দুনয়ার সামনে উপস্থিত করেন নাই। বরং তাঁহারা সকলেই সেই প্রতিশ্রুত ও যুগযুগের অপেক্ষিত অনাগত নবীর ভাবী আগমনের শুভ-সন্দেশ নিজ নিজ উম্মৎকে দিয়া গিয়াছেন। এই দাবীর দুই-একটা প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বেদের সারভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিশ্বকোষ সম্পাদকের মতে "বস্তুতঃ উপনিষৎ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" ইহারই অন্তর্গত একখানা পুস্তকের নাম—অল্লোপনিষদ। "ইহাতে স্পষ্ট মহম্মদ সাহেবকে রসুল অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত লিখিত হইয়াছে" (সত্যার্থ প্রকাশ)। এই উপনিষদে ও অল্লসুক্তে, "রসুল মহমদ রকং বরস্য" পদটী পুনঃ পুনঃ বর্ণিত আছে। গত শতাব্দীতে কএকজন সংস্কৃতজ্ঞ মুছলমান এই শ্লোক ও সুক্তগুলি উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, হজরত মোহাম্মদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিন্দুদের উপনিষদেও বিদ্যমান আছে। ইহা লইয়া হিন্দুপণ্ডিতদিগের মধ্যে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়, এবং সর্ব্বপ্রথমে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় "সত্যার্থ প্রকাশে" এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়া বলেন যে, অল্লোপনিষদ গ্রন্থখানিই আগাগোড়া জাল, অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত উহা কখনই নহে। "অনুমান হইতেছে যে, আকবর সাহেবের সময়ে কেহ উহা রচনা করিয়াছেন। ...... যদি উহার অর্থ দেখা যায়, তবে উহা কৃত্রিম, অযুক্ত বরং বেদ ও ব্যাকরণ রীতি বিরুদ্ধ বোধ হয়।"* বিশ্বকোষ সম্পাদক বাদায়ুনীর একটী মন্তব্যের বরাত দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, অল্লোপনিষদটা শেখ ভবন নামক মুছলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত একজন ব্রাহ্মণের

* সত্যার্থপ্রকাশ, ৬২৫ পৃঃ।

কুকীর্ত্তি মাত্র। ইহার প্রমাণ এই যে, ব্রাহ্মণ ভবন যে বৎসর এছলামে দীক্ষিত হন, সম্রাট আকবর শাহ সেই সময় বাদায়ুনীকে অল্লোপনিষদের অনুবাদ করার আদেশ প্রদান করেন। অধিকন্তু শেখ ভবন অথর্ব্ব বেদের এই অংশটা লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঐ মন্ত্রবলে অনেকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এছলাম-অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আকবর বাদশাহের ন্যায় হিন্দুভাবাপন্ন সম্রাটের দরবারে, অথবা তাহার বাহিরে, মন্দমতি শেখ ভবন যখন এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও সূক্ত লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তর্ক আরম্ভ করিল, তর্কে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দিতে লাগিল এবং তাহার ফলে "অনেকে ইছলামাবলম্বন" করিতে লাগিলেন, তখন পরাজিত ও বিপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যকার একজনও এ দাবী করিলেন না যে, আলোচ্য উপনিষৎটী কোন দুষ্ট কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত। অথর্ব্ব বেদের বহু নকল নিশ্চয় ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট তখনও বিদ্যমান ছিল। এই সব পুথি বাহির করিয়া তাঁহারা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, ভবনের পুথিতে লিখিত উপনিষদটী জাল, কারণ অন্য কোন পুথিতে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। সে যাহা হউক, উপরোক্ত লেখকগণের এই উক্তিগুলি তাঁহাদের অনুমান মাত্র এবং সত্য কথা এই যে, সেগুলি আদৌ যুক্তিসহ নহে। এই কারণে পরলোকগত পণ্ডিত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ হিন্দুপণ্ডিতগণ অবশেষে প্রতিবাদের অন্য পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, আলোচ্য উপনিষদটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন যে, মহমদ ও রসুল প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত বুৎপত্তি ও উৎপত্তির সন্ধান না পাওয়াতেই অন্যরা উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাই "রসুল মহমদ রকং বরস্য" পদের অর্থ তাঁহারা করিতেছেন—"রসুলং + অহং + অদরকং—রসুলং (মহাশক্তিশালীকে) অহং অদরকং (আমিত্ব জ্ঞান হইতে শঙ্কাহীনকে)—ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বসুমতী বিদ্যামন্দির হইতে অল্লোপনিষদ প্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্বভারতের অন্য কোন পণ্ডিত আলোচ্য শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই! সে যাহা হউক, এই মতভেদ হইতে জানা যাইতেছে যে, আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতগণ অল্লোপনিষদের এই শ্লোকের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই কেহ কেহ তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা যুক্তির হিসাবে ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার পর, অন্যরা চেষ্টা করিয়াছেন, যে কোন গতিকে ঐ শব্দগুলির অন্য কোন একটা অর্থ আবিষ্কার করিয়া বেদের সেই চিরাচরিত সত্যকে চাপা দিতে। কিন্তু বেদ আজও ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া আহ্বান করিতেছে—রসুল মহমদ রকং বরস্য, **"আল্লার রছুল মোহাম্মদই তোমাদের বরণীয়"**।

(২) হজরত ছোলায়মান, সেই প্রতিশ্রুত রছুলের গুণগান করিয়া বলিতেছেন:—

חִכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים (عبرانی)

ইহার অনুবাদ :—"তাঁহার মুখ বা কথা অতীব মধুর এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে **মোহাম্মদ**। হে যিরুশালেমের কন্যাগণ, এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।" মূল এবরানীর ন্যায় আরবী তাওরাতেও محمديم শব্দ আছে। বাঙ্গলায় উহার অনুবাদ করা হইয়াছে :— "তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।" ইংরাজী অনুবাদে আছে—he is altogether lovely। কিন্তু মোহাম্মদ শব্দের অর্থ মনোহরও নয়, lovelyও নয়, উহার প্রকৃত অর্থ প্রশংসিত। হজরত ছোলায়মানের উক্তির মর্ম্ম এই যে, তাঁহার সেই প্রিয়, তাঁহার সেই সখা "মোহাম্মদ" নামে পরিচিত হইবেন, বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে মোহাম্মদ বা প্রশংসাভাজন। ফলতঃ তাওরাতেও নাম ধরিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আগমনের সুসমাচার প্রচার করা হইয়াছে।

মানব সভ্যতার প্রথম ও মধ্যযুগে নবী ও রছুলগণ সেই সেই সময়ের উপযোগীরূপে শরিয়ৎ দিয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাই তখনকার নবুয়ৎ সীমাবদ্ধ হইয়াছিল এক-একটা জাতি বা দেশের গণ্ডীর মধ্যে। সেই অবিকশিত সভ্যতার যুগে দেশ ও জাতিগণের মধ্যে পরস্পর কোন পরিচয় ছিল না, তখন তাহা সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু সে সময়েও সকল ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য ও সাধ্য একই ছিল, এবং সেগুলি সকলে মিলিয়া সেই অনাগত যুগের বিশ্ব-নবীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যাইতেছিল। ধর্ম্মের লক্ষ্য, প্রথমতঃ আল্লাহ, তাহার পর মানুষ। আল্লার ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি, এই বিষয়টাকে কর্ম্মগত, জ্ঞানগত ও আত্মাগত করাইয়া দেওয়াই ধর্ম্মের প্রধানতম সাধনা। রছুল ও কেতাব এই সাধনার অপরিহার্য্য উপলক্ষ মাত্র। এই সাধনাকে মানব জাতির অন্তরের অন্তস্তলে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়ার জন্যই সার্ব্বজনীন বিশ্বধর্ম্মের আবশ্যক। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আল্লার চিরন্তন নিয়ম অনুসারে, যখন তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া আসিল, যখন দেশ ও জাতিগণের পরিচয় সহজসাধ্য হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ ধর্ম্মই যখন মানব জাতির পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘাত-প্রত্যাঘাতের প্রধান উপকরণে পরিণত হইতে লাগিল—সার্ব্বজনীন বিশ্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, মানবতার রক্ষাকর্ত্তা ('Saviour of Humanity'*) মহামানবের মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভ-আবির্ভাব হইল—সকল মানবের প্রতি সমান করুণাশালী, সকল বিশ্বের স্বামী রাব্বুল-আলামীন—আল্লার সত্য পরিচয় মানবকে জানাইয়া দিতে, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মসমস্যার স্বর্গীয় সমাধানকে তাঁহার বিশ্বে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে।

বর্ত্তমান ইউরোপের অন্যতম মনীষী জর্জ বার্ণার্ড-শ কিছু দিন পূর্ব্বে হজরত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"I belive that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness."

* জর্জ বার্ণার্ডা-শ।

অর্থাৎ—“আমি বিশ্বাস করি যে, মোহাম্মদের মত একজন মানুষ যদি আধুনিক জগতের ডিক্টেটর বা নিয়ন্ত্রকের পদ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন—যাহাতে বিশ্বমানব তাহার অতি-আবশ্যক সুখ শান্তি অর্জ্জন করিয়া লইতে পারিত।” দুঃখের বিষয়, বার্ণার্ড-শ-এর মত মনীষীরাও এক্ষেত্রে হজরতের ঠিক্ স্বরূপটাকে ধরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বিশ্বমানবের চরম ও চিরন্তন ডিক্টেটররূপে এখনও সমান তেজে, সমান প্রেমে পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। লোকান্তরিত হইয়াছে তাঁহার দেহ মাত্র। আত্মার হিসাবে, অর্থাৎ ভাবে, জ্ঞানে ও কর্ম্মের আদর্শে তিনি চিরজীবন্ত, তাঁহার প্রচারিত স্বর্গীয়-সমাধান সদা শাশ্বত। প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী মানবকে আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বমানবের সকল সমস্যার সমাধান, সকল সুখ শান্তির উপাদান একমাত্র তাঁহারই শিক্ষায় সন্নিহিত। এবং মুক্তিকামী শান্তিপ্রয়াসী বিশ্বমানব আজ, নিজেদের গোচরে বা অগোচরে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াছে বা করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। একবাল যথার্থই বলিয়াছেন :—

هر کجا بینی جہان رنگ و بو   آنکہ از خاکش بروید آرزو
یا ز نور مصطفی او را بہاست   یا ہنوز اندر تلاش مصطفی ست

৩০৫ ফিরিয়া দাঁড়ান

নবুয়ৎ বা স্বর্গের বাণীকে কোন এক দেশের, জাতির বা বংশের সঙ্কীর্ণ সীমার গণ্ডীভূত করিয়া, এবং শেষ ও সার্ব্বজনীন নবী মোহাম্মদ মোস্তফাকে অস্বীকার করিয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকারীরা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। ইহাকেই বলা হইয়াছে, পরাঙ্মুখ হওয়া বা ফিরিয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাহাদের এই সব সঙ্কীর্ণ সংস্কার ধর্ম্ম কখনই নহে। বরং প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছে ধর্ম্মের ব্যভিচার।

৩০৬ আল্লার (প্রাকৃতিক) ধর্ম্ম

নানাবিধ প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ দ্বারা আল্লার মহিমা ও অস্তিত্ব প্রতিপাদন করার পর, ছুরা রূমের ৩০ আয়তে বলা হইতেছে :—

فاقم وجهك للدين حنيفا ' فطرت الله التي فطر الناس عليها ' لا تبديل لخلق الله '
ذالك الدين القيم ' ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

শাব্দিক অনুবাদ :—

অতএব সর্ব্বনিরপেক্ষ হইয়া নিজকে তুমি “দিনের” জন্য সুদৃঢ়ভাবে নিয়োজিত কর ; (তুমি অনুসরণ কর) আল্লার প্রকৃতির—সমগ্র মানবকে তিনি যাহার উপর সর্জ্জন করিয়াছেন, আল্লার সৃষ্টিতে কোন পরিবর্ত্তন নাই ; ইহাই সুদৃঢ় ধর্ম্ম (=দিন), কিন্তু অধিকাংশ লোকই (এই সত্যটী) অবগত নহে।” এই আয়তে “ফেৎরাতুল্লাহ” বা আল্লার প্রকৃতি—পদের তাৎপর্য্য করা

হইয়াছে—এছলাম, এবং "খল্‌কুল্লাহ" বা আল্লার সৃষ্টি-পদের অর্থ করা হইয়াছে 'আল্লার দিন' বলিয়া। তফছিরকারগণ সকলে সমবেতভাবে এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন (জরীর ২১—২৭)। বোখারীর একটী হাদিছে দেখা যায়, হজরত বলিতেছেন:—"প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ঠ হয় ফেৎরাত বা স্বভাব-ধর্ম্মের উপর; অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি রূপে পরিণত করিয়া দেয়।"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ছুরা রূমের এই আয়তটীর আবৃত্তি করিলেন।" সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য আয়তের "দিনুল্লাহ" আর ছুরা রূমের "খল্‌কুল্লাহ" একই বস্তু এবং তাহা হইতেছে সৃষ্টি-নিয়ম বা স্বভাব-ধর্ম্ম। ৮৪ আয়তে এই স্বভাব-ধর্ম্মকেই এছলাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সেই স্বভাব-ধর্ম্ম বা সৃষ্টি-নিয়ম সমগ্র জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মূলতঃ সমানভাবে ব্যাপক হওয়া চাই। কারণ, এই সৃষ্টি-নিয়মটা হইতেছে বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্ত্তারই নিয়ম, আর তিনি হইতেছেন—রাব্বুল-আলামীন। সমগ্র জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে পালন-পোষণ করিয়া পূর্ণতার চরম স্তরে পৌছাইয়া দেন যিনি, একমাত্র তিনিই ঐ পদবাচ্য হইতে পারেন। সুতরাং দুনয়ার দেশ বিশেষকে বা বংশ বিশেষকে এই পালন-পোষণের নিয়মের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া এবং অন্য সকলকে তাহা হইতে বাদ দিয়া ফেলা রব্বুল-আলামীন—আল্লার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। এই তাৎপর্য্যে ক্রম-বিকাশ ও পূর্ণতালাভ বলিয়া দুইটী তত্ত্ব জানা যাইতেছে। পূর্ণতালাভই লক্ষ্য আর ক্রম-বিকাশ হইতেছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অবলম্বন। আমাদের মানবীয় স্বরূপের এই বিকাশ নানা দিকে ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যকার প্রধান হইতেছে—মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ও আত্মার উদ্বর্ত্তন। এই বিকাশ ও উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আলামীন ও তাহার রবের সহিত মানুষের পরিচয় ঘনিষ্টতর হইয়া যাইতে থাকে, এবং তখনই দরকার হয়—সেই রব্বুল-আলামীনের নির্দ্ধারিত এক বিপুল ও ব্যাপক বিশ্বধর্ম্মের। এছলামই সেই বিশ্বধর্ম্ম, এবং আলোচ্য রুকুর আয়তগুলিতে তাহার সেই বিশ্বজনীন রূপের একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

আয়তের শেষার্দ্ধে বলা হইতেছে—স্বর্গের ও মর্ত্তের সব কেহই—স্বেচ্ছায় বা বিনা ইচ্ছায়—আত্মসমর্পণ করিয়াছে একমাত্র তাঁহাতে, আর তাহাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহারই পানে। এই আত্মসমর্পণই হইতেছে সৃষ্টি-নিয়মের অলঙ্ঘ্য ধারা। এই ধারার অনুশীলনে জানা যায় যে, বৃহত্তম গ্রহ-উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত, সৃষ্টির সমস্ত অবদান-উপকরণই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সম্পন্ন—অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া চলা তাহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সৃষ্টির অস্তিত্ব ও উদ্বর্ত্তনের কার্য্য-কারণ-পরম্পরার একটা গম্ভীরতম রহস্য এই নিয়মের মধ্যে লুকাইয়া আছে। বিশ্বমানবের মন ও মস্তিষ্কের জ্ঞানগত ও আত্মাগত সমস্ত সাময়িক বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যকে দূর করিয়া, সমগ্র আলমকে রব্বুল-আলামীনের নির্দ্ধারিত সেই আকর্ষণ-নিয়মের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছে যে ধর্ম্ম, তাহারই নাম এছলাম।

সৃষ্টির সমস্ত উপাদান-উপকরণের মধ্যকার এই যে আকর্ষণ, ধর্ম্মীয় পরিভাষায় ইহারই নাম --প্রেম। এই আকর্ষণ বা প্রেমের কেন্দ্র হইতেছেন আল্লাহ। তাই বলা হইতেছে—স্বর্গ মর্ত্তের সমস্ত কিছু তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কেন্দ্রের এই প্রেমালিঙ্গনের মধুর পরিণাম, সৃষ্টির আত্মসমর্পণ। একদিকের এই আলিঙ্গন-আকর্ষণ, অন্যদিকের আত্মসমর্পণ—ফলে আল্লার মিলন-লাভ। আল্লার পানে ফিরিয়া যাওয়ার অর্থ ইহাই।

আয়তের طوعا و كرها পদের অনুবাদ করা হয় "ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়" বলিয়া। আমি "অনিচ্ছায়"-শব্দের পরিবর্ত্তে "বিনা-ইচ্ছায়" অনুবাদ করিয়াছি। জড়-পদার্থগুলির "ইচ্ছা" নাই, সুতরাং অনিচ্ছার সম্ভাবনাও সেগুলির নাই। তাহারা সৃষ্টি-নিয়মের অনুগত হইয়া চলে বিনা-ইচ্ছায়। সৃষ্টি-ধারার অন্তর্গত কতকগুলি ব্যাপার এরূপ আছে, যাহাতে মখলুকের নিজস্ব ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের সংশ্রব একটুও নাই। জড়-জগতের সমস্ত ব্যাপারই এই শ্রেণীভুক্ত। জীবজগৎ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির মধ্যকার কতকটাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত—যেমন, তাহার নিজের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি। পক্ষান্তরে জীবের কতকগুলি কাজ আবার তাহার ইচ্ছা-প্রসূত—যেমন, আমাদের খাদ্যগ্রহণ করা বা না করা। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বলিতে এইরূপ সকল শ্রেণীর ব্যাপারকেই বুঝাইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উভয়ই মূলতঃ আল্লার শাশ্বত সৃষ্টি-নিয়মেরই অন্তর্গত।

৩০৭ সকল নবীতে ঈমান

উপরের আয়তে আল্লার নির্দ্ধারিত যে সৃষ্টি-নিয়ম বা স্বভাব-ধর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহারই একটা বাস্তব স্বরূপ এই আয়তে প্রকাশ করা হইতেছে। এখানে হজরত রছুলে করিমের মধ্যবর্ত্তিতায় সমস্ত মুছলমানকে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বলা হইতেছে--তোমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমরা সকলে আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। তিনি দুন্‌য়ার কোন দেশ বা জাতির প্রতি পক্ষপাতীও নহেন, অত্যাচারীও নহেন, পক্ষান্তরে সকলের প্রতি সমান করুণাপ্রদর্শনে অসমর্থও নহেন। অন্যথায় তাঁহার ন্যায়বান, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় স্বরূপকে—সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বকেই—অস্বীকার করা হয়। সর্ব্বপ্রথমে "আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি" বলার বিশেষ তাৎপর্য্য ইহাই।

বংশগত বা দেশগত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কারের জয়ঘোষণা, ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্য নহে। বস্তুতঃ সমস্ত ধর্ম্মসাধনার মূলসাধ্য হইতেছেন—আল্লাহ। মুছলমান তাঁহাকে প্রথমে চিনিয়াছে—করুণাময় কৃপানিধান ও রব্বুল-আলামীন বলিয়া। সুতরাং জগতের অন্য প্রান্তে, অন্য জাতির মধ্যে, অন্যান্য যুগে, তাঁহার যে সব বাণী সমাগত হইয়াছে, সেগুলিকে তাহারা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারে না। এই ভূমিকার পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কএকজন বিশিষ্ট নবীর নামও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইতেছে। যেহেতু আলোচনা হইতেছিল প্রত্যক্ষভাবে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে, তাই প্রথমে তাহাদের মাননীয় নবীগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু নামের তালিকা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া

হইতেছে যে, ইঁহারা ব্যতীত দুন্য়ার আর আর সমস্ত নবীরা তাঁহাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে যে সব বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতেও আমরা বিশ্বাস করি, সেই নবী ও রছুলগণের মধ্যকার কাহারও সম্বন্ধে কোন তারতম্য আমরা করি না।

বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমনের পূর্ব্বে, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যে সব নবী-রছুলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে সব বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সম্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে সহজে জানা যাইবে যে, তখনকার অবস্থা অনুসারে ঐ নবীরা একএকটা প্রদেশ বা খণ্ডজাতির সাময়িক মঙ্গলের জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এই সব মহাপুরুষের নিকট প্রেরিত আল্লার বাণী এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শগুলি নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট বা অবোধ্যরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে, বহু জাল পুথি-পুস্তককে ঐশিক বাণী বলিয়া তাঁহাদের নামকরণে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান রাখার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদিগকে আমরা আল্লার বাণী পাওয়ার অধিকারী বলিয়া ওছুল বা principle হিসাবে স্বীকার করি, স্বদেশ, স্বগোত্র বা স্বযুগের জন্য তাঁহারা সাময়িক-ভাবে নবুয়ৎ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহাদিগের প্রতি প্রকাশিত বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করার তাৎপর্য্য এই যে, নবী ও রছুলগণের মধ্যকার কেহই নিজের কল্পিত কোন রচনাকে আল্লার নামে চালাইয়া দেন নাই, বরং আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াই তাহা প্রচার করিয়াছিলেন—আমরা মুছলমান হিসাবে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগের প্রচারিত খণ্ডধর্ম্মগুলির যুগ যে শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে নবীগণের নামকরণে প্রচারিত ধর্ম্মপুস্তকগুলি যে জাল ও বিকৃত, এ সত্যটীও কোরআন যুগপৎভাবে পুনঃপুন প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

৩০৮ এছলাম ব্যতীত ‘ধর্ম্ম’ নাই

পূর্ব্ব আয়তগুলিতে, বিশেষতঃ এই ছুরার ১৮ আয়তে, বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত আম্বিয়ার প্রতিশ্রুত ধর্ম্ম, সমগ্র সৃষ্টির স্বভাব-ধর্ম্ম এবং বিশ্বমানবের উপযোগী শাশ্বত, সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতেছে—এছলাম (৩৪০ টীকা)। পক্ষান্তরে দুন্য়ার প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মগুলি একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও বিশ্বমানবের অধিকাংশের প্রতি অত্যাচারজনক, অন্যদিকে সেগুলি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ও মানুষের মুক্তজ্ঞানের সব সিদ্ধান্তের বিপরীত কুশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তাই কোরআন বলিতেছে—এছলাম ব্যতীত ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, আর কিছু হইতেই পারে না। এছলাম ব্যতীত অন্য কোন ‘ধর্ম্ম’ আল্লার হুজুরে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ সে সমস্তই অসত্য ও অসঙ্গত।

প্রচলিত ধর্ম্মগুলি, এছলামের মোকাবেলায় আসার পর হইতে আপনা-আপনিই কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং মুছলমান জাতির সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও এছলামধর্ম্ম জগতের দিকে দিকে কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, বর্ত্তমান-জগতের ধর্ম্মীয় পরিস্থিতি

সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যাইতে পারে। খৃষ্টান-ইউরোপই আজ খৃষ্টানধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দুর্ব্বার ও দুর্ব্বহ আক্রমণের ফলে ইউরোপে খৃষ্টানধর্ম্মের নাভিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতারা, সাময়িক অবস্থার তাকিদে, হিন্দুধর্ম্মের বিধিব্যবস্থাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য বৎসর বৎসর ব্যবস্থাপক সভার শরণ লইতে বাধ্য হইতেছেন, শাস্ত্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠতম মানবকে পুনঃপুন প্রাণপণ ব্রত অবলম্বন করিতে হইতেছে, হিন্দু সম্মেলনের বড় বড় নেতারা আজ নিজমুখে নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে "বর্ত্তমান জগতে অচল" এবং "অন্ধকার যুগের অসভ্য মানুষের জন্য রচিত" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন *। আবার নিজ নিজ ধর্ম্মব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া যে সমস্ত নূতন ব্যবস্থা-বিধানকে হিন্দু ও খৃষ্টান ভ্রাতারা গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহার মধ্যকার প্রত্যেক সত্য ও সঙ্গত বিষয়টী স্পষ্টতঃ এছলামেরই শিক্ষা। হিন্দু ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে একেশ্বরবাদের নূতন প্রাদুর্ভাব, এছলামের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব বা সংঘর্ষেরই সুফল। ফলতঃ কেহ স্বীকার করুন বা নাই করুন, এছলামই আজ জগতের একমাত্র সত্যধর্ম্মরূপে বিশ্বমানবের কর্ম্ম ও চিন্তাধারার উপর নিজের স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহার মোকাবেলায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মই নিজের অচলতাকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এখানে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মুছলমানকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে এছলামকে আর মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলিকে, অভিন্ন বলিয়া দাবী করা চলে না। কোরআন অনুসারে, এছলামের অনুসরণ করিয়া চলে যাহারা, তাহারাই মুছলমান। কিন্তু বর্ত্তমান সময়, মুছলমানরা যে সব বিশ্বাস পোষণ ও অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, তাহারই নাম দাঁড়াইয়াছে এছলাম!

৩০৭ আল্লার হেদায়ৎ

নিজেদের ঈমানের পর আবার যাহারা কোফরকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের হেদায়ৎ লাভের সম্ভাবনা নাই—এই সত্যটী এখানে প্রকাশ করা হইতেছে। সুতরাং আয়তের মর্ম্ম গ্রহণের জন্য ঈমান ও হেদায়ৎ শব্দের তাৎপর্য্য মোটামুটিভাবে জানিয়া লওয়া দরকার। মূলতঃ ঈমান শব্দের অর্থ, التصديق بالجنان কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া অন্তরে অনুভব করা। এই অনুভূতিকে কথা ও কাজের দ্বারা প্রকাশ করা, ইহার—অংশ না হইলেও—আশু ও অবশ্যম্ভাবী ফল। আজকাল সাধারণতঃ ঈমান শব্দের অনুবাদ করা হয় বিশ্বাস বলিয়া। আবার কালপ্রভাবে, "বিশ্বাস" বলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী faith, এমন কি belief পর্য্যন্ত, অনেকের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। অথচ ঈমান ও faith এক জিনিষ কখনই নহে। Faith আদৌ জ্ঞানমূলক ও জ্ঞান সাপেক্ষ নহে, মানুষের সাধনার কোন স্থানও তাহাতে

* হিন্দু-সম্মেলন—ঢাকা।

নাই। * কিন্তু এছলামের ঈমান যুক্তিপ্রমাণ নিরপেক্ষ ধারণা অথবা মানুষের জ্ঞানসাধনার বাহিরের কোন জিনিষ নহে। অন্তরের সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অনুভূতির নামই ঈমান। কিন্তু সে অনুভূতির অন্যতম উপকরণ হইতেছে মস্তিষ্কের উপলব্ধি, এবং সে উপলব্ধি যে عقل و بينات বা জ্ঞান ও স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যেই সমাগত হয়, কোরআনের বহু আয়তে তাহা খুব স্পষ্ট রূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেদায়ৎ শব্দের অর্থ—পথকে আলোকিত করিয়া দেওয়া, কাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া অথবা পথে পরিচালিত করিয়া কাহাকে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। প্রত্যেক স্থানের উপক্রম উপসংহার অনুসারে, আনুসঙ্গিক বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ইহার মধ্যকার সঙ্গত তাৎপর্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, প্রথম অর্থে হেদায়ৎ সকল সময় সকলের জন্য সর্ব্বতোভাবে সাধারণ ও অবারিত।

আয়তের বক্তব্য এই যে, সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অমান্য করে যাহারা, তাহাদিগকে হেদায়ৎ করিতে বা পথে আনিতে পারা যায়—সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া। কিন্তু, অন্য স্বার্থ বা প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও সত্যকে অমান্য করিয়া চলিতে পন্ধপরিকর হয়, সে'ত বিপথগামী হইতেছে জ্ঞাতসারে।

এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, তাঁহাদের প্রতি প্রকাশিত আল্লার কালামকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। শেষনবী ও বিশ্বনবীর আগমন সংবাদ এই নবীরা দিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতি প্রকাশিত কেতাবগুলিতে সেই শেষনবীর লক্ষণ ও বিশেষণ, এমন কি তাঁহার মোহাম্মদ ও আহমদ নাম পর্য্যন্ত, স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে মতে, এ যাবৎ তাহারা সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্ত্তার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। লক্ষণে, বিশেষণে এবং অন্যান্য সকল প্রকার যুক্তিপ্রমাণে তাহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এই মোহাম্মদ মোস্তফাই সেই প্রতিশ্রুত মহানবী (৩০৪ টীকা প্রভৃতি)। নিজেদের নবী ও কেতাবের প্রতি তাহাদের যে ঈমান, তাহার নির্দ্দেশ ছিল এই নবীকে স্বীকার করিয়া লওয়া। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বসিল! "ঈমানের পর অমান্য করা"—ইত্যাদি পদে এই বিষয়টা বুঝান হইতেছে।

আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে—'অত্যাচারী জাতিকে আল্লাহ হেদায়ৎ করেন না।' বস্তুতঃ ইহা হইতেছে হেদায়ৎ না করার হেতুবাদ। তাহাদিগকে হেদায়ৎ করার জন্যই আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে ত্রাণকর্ত্তা শেষনবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং হেদায়তের প্রধান অবলম্বন হইতেছেন তিনি। হেদায়তের প্রধান অবলম্বনকে অগ্রাহ্য করিয়া দেয় যাহারা, তাহারা হেদায়ৎ পাইবে কি করিয়া ?

* New Standard Dictionary.

৩০৯ লা'নৎ

লা'নৎ শব্দের মূল অর্থ— الطرد و الابعاد من الخير কাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া এবং কোন কল্যাণ হইতে দূরে রাখা (জওহরী)। আরবী ভাষায় বলা হয় لعنه اهله ' طرده و ابعده তাহার পরিজনেরা তাহাকে লা'নৎ করিল অর্থাৎ তাড়াইয়া দিল এবং (নিজেদের সংশ্রব হইতে) দূরে রাখিল (حقيقة الاساس)। আল্লাহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে, লা'নৎ শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে (বেহার, রাগেব)। আল্লার লা'নৎ—পরকালে পাপের প্রতিফল এবং ইহকালে তাঁহার করুণা হইতে দূরে অবস্থান (রাগেব)। মানুষ সম্বন্ধে লা'নৎ শব্দের অর্থ, মোটামুটিভাবে—নিন্দা ও তিরস্কার। সত্যদ্রোহরূপ যে মহাপাতক, তাহার স্বাভাবিক প্রতিফলে, মানুষ নিজকে আল্লার নৈকট্য ও করুণা হইতে দূরে অপসারিত করিয়া ফেলে। এই অনাচারের দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজদিগকে সত্যাশ্রয়ী মানবের ও আল্লার ফেরেশ্‌তাগণের নিন্দা ও তিরস্কারভাজন করিয়া লয়।

কর্ম্মের পরিমাণ অল্প বা অধিক হওয়ার জন্য কর্ম্মফলের পরিমাণ অল্প বা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পাপ যদি অবিরামভাবে করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিফলও অবিরামভাবে ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য চির-পাপাচারের প্রতিফলও চিরকালের জন্য আসিয়া থাকে। অবশ্য খলুদ্ বা চিরকাল অর্থে অনন্তকাল নহে। পক্ষান্তরে যদি তাহারা এই শোচনীয় পরিস্থিতি হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া লইতে চায়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। সে অবস্থার উল্লেখ পরবর্ত্তী আয়তে করা হইয়াছে।

৩১০ অনুতাপ ও আত্ম-শোধন

ছুরা বকরার ১৫৯ হইতে ১৬২ আয়ত পর্য্যন্ত, এই ছুরার ৮৬—৮৮ আয়তের প্রায় অনুরূপ। পাঠকগণ সেখানকার টীকাগুলি দেখিয়া লইলে বাধিত হইব। সংক্ষেপে—এছলাম পাপীর মুক্তির পথ চিরস্থায়ীভাবে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। মানুষ যত বড় মহাপাতকী হউক না কেন, তাহার মন যদি পাপকে পাপ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকে, সে-পাপের জন্য তাহার মনে যদি অনুতাপ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যতে সে যদি সেই পাপ হইতে আত্মসম্বরণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আল্লার হুজুরে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি গফুর ও রহিম বা ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান উভয়ই। অন্যত্র পাপীদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করা হইতেছে—হে আমার বান্দাগণ, নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছ যাহারা! তোমরা যেন আল্লার করুণালাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িও না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করেন, নিশ্চয় একমাত্র তিনিই'ত হইতেছেন ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান'। (৩৯—৫৩)।

৩১১ ব্যর্থ তাওবার লক্ষণ

তাওবা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ভিতরের জিনিষ। অন্তরে অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে, মানুষের ভাবী কর্ম্মধারার মধ্যে তাহার শুভপ্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারা যাইবে। যাহারা মুখে তাওবার আড়ম্বর করে, অথচ যে কোফ্‌র ও অনাচার সম্বন্ধে এই আড়ম্বর, তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ—কম হওয়ার পরিবর্ত্তে—বাড়িয়া যাইতে থাকে, তাহাদের তাওবা তাওবাই নহে, বরং প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেছে নিজ-আত্মার ও তাহার মালেক আল্লার প্রতি অনাচারী মানব-মনের একটা জঘন্য বিদ্রূপ মাত্র। সুতরাং এহেন তাওবা আল্লার হুজুরে গৃহীত হইতে পারে না। মুছলমান--আমরাও শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় তাওবা তাওবা বলিয়া নানাপ্রকার বাচনিক আড়ম্বরে লিপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু না থাকে তাহার পশ্চাতে পাপের কোন অনুভূতি ও তজ্জনিত আত্মগ্লানি, আর না থাকে তাহার সঙ্গে পাপবর্জ্জনের কোন সঙ্কল্প। 'তাওবা করিলে গোণাহ্‌ মা'ফ হয়'–তাই তাওবা করি, আর অতীতের বোঝা হালকা করিয়া ভাবী-তাওবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লই! এছলামের তাওবা ইহা কখনই নহে।

৩১২ ভূমণ্ডল ভরা স্বর্ণ

নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য মানবমনের তীব্র অনুতাপ ও ভবিষ্যৎসঙ্কল্পের নামই তাওবা, মুখের শব্দই তাওবা নহে—পূর্ব্ব আয়তে ইহা বলার পর এখানে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, শব্দের ন্যায় স্বর্ণও এ ক্ষেত্রে অনর্থক। পাপী যদি গোটা ভূমণ্ডল ভরা স্বর্ণের অধিকারী হয়, তাহা হইলেও তাহার পাপ পাপই। অনুতাপশূন্য অবস্থায় মানুষ যদি, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও ব্যয় করিয়া ফেলে, তাহাও সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইবে। সৎকর্ম্মে ধনদানের সার্থকতা কোরআন কুত্রাপি অস্বীকার করে নাই, বরং ইহাকে এছলামের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দুন্‌য়ায় বহু লোক এরূপ আছে, যাহারা কিছু স্বর্ণরৌপ্য দানখয়রাত করিয়া মনে করে যে, ইহাদ্বারা তাহাদের পাপের বিনিময় বা ফিদ্‌য়া হইয়া গেল। এখানে এই ভ্রান্তবিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হইতেছে।

---

১০ রুকু'

৯১ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ◎

৯১ পরম পুণ্যকে তোমরা কখনই পাইতে পারিবে না—যাবৎ না সেই সমস্ত (ধন-দওলৎ) হইতে ব্যয় করিতে (অভ্যস্ত হইতে) পার, যাহা তোমাদের প্রিয় ; আর যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত।[৩১৩]

৯২ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ◎

৯২ এছরাইল[৩১৪] যাহাকে নিজের প্রতি নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল, তাহা ব্যতীত (মুছলমানদিগের ব্যবহৃত) খাদ্য সমস্তই—তাওরাৎ অবতীর্ণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত — বনি-এছরাইলের জন্য বৈধ ছিল ; বল ঃ—তোমরা যদি (নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে) সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাৎ লইয়া আইস এবং তাহা পড়িয়া দেখ[৩১৫]।

৯৩ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ◎

৯৩ অতএব ইহার পরেও আল্লার নামে মিথ্যা রচনা করিবে যাহারা, অত্যাচারী'ত তাহা-রাই।[৩১৬]

৯৪ বল ঃ—সত্যকে আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দিলেন, অতএব সকলে তোমরা সত্যাশ্রয়ী এবরাহিমের ধর্ম্ম-পথের অনুসরণ করিয়া চলিতে থাক; বস্তুতঃ মোশ্‌রেক-দিগের অন্তর্গত সে (কখনই) ছিল না[৩১৭]।

৯৪ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৯৫ নিশ্চয় বিশ্ব-মানবের মঙ্গলহেতু-প্রতিষ্ঠিত প্রথম-গৃহ হইতেছে সেইটি—যাহা বক্কাতে অবস্থিত, (যাহা স্বর্গের) শাশ্বত কল্যাণে পরিপূর্ণ এবং (যাহা) সকল জগতের পক্ষে মুক্তিমার্গের নির্দ্দেশক[৩১৮]—

৯৫ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ج

৯৬ তাহাতেই (অবস্থান করিতেছে) স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ — (যেমন) মকামে-এবরাহিম, আর (যেমন) যে কোন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়, আর (যেমন) সেখানে যাওয়ার উপায় যাহারা করিয়া উঠিতে পারে, তাহাদের সকলের প্রতি কেবল আল্লার উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্জ সমাধা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া আছে; ইহা সত্ত্বেও কেহ যদি (এই সত্যকে) অমান্য করে, তবে (জানা উচিত যে) আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্ব হইতে বেনায়াজ[৩১৯]।

৯৬ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৭ বল ঃ—হে ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকারিগণ! তোমরা আল্লার নিদর্শনগুলিকে[৩২০] অমান্য করিতেছ কি জন্য? অথচ, যাহা কিছু তোমরা করিয়া থাক, আল্লাহ্'ত সে সমস্তেরই প্রত্যক্ষদর্শী।

٩٧ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ ق وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۞

৯৮ বল ঃ—হে ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকারিগণ! যে সমস্ত লোক ঈমান আনিতেছে,তাহাদিগকে তোমরা আল্লার পথ হইতে বারিত রাখিতেছ—কিসের জন্য? সেই পথকে তোমরা বক্ররূপে প্রদর্শন করিতে চাহিতেছ — অথচ তোমরা (তাহার সত্যতার নিদর্শনগুলির) প্রত্যক্ষদর্শী; (স্মরণ রাখিও যে) তোমাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কখনই অসতর্ক নহেন[৩২১]।

٩٨ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

৯৯ হে মো'মেনগণ! কেতাবপ্রদত্ত হইয়াছে যাহারা—তোমরা যদি তাহাদের কোনও একদলের অনুগত হইয়া চল, (তবে) তোমাদের ঈমানের পর আবার তাহারা তোমাদিগকে কাফের বানাইয়া দিবে[৩২২]।

٩٩ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۞

১০০ আর তোমরা কাফের হইতে পার কিরূপে—অথচ, তোমাদের অবস্থা এই যে, আল্লার আয়তগুলির আবৃত্তি তোমাদিগের নিকট করা হইতেছে, আর তাঁহার রছুল তোমাদিগের মধ্যে (বিদ্যমান)[৩১৩]; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করিয়া নিরাপদ হইতে চায় যে ব্যক্তি, সরল ও সুদৃঢ় (ধর্ম্ম) পথ সে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া গেল।

১০০ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايت الله وفيكم رسوله ط ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ع

টীকা :—

৩১৩ পুণ্য—বের

আয়তে "বের" শব্দ আছে। ইহার অর্থ পুণ্য, পুণ্যকর্ম্ম, মহাপুণ্য বা পরমপুণ্য। ঈমান ও সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ যে পুণ্যফল লাভ করে, সে সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ছুরা বকরার ১৭৭ আয়তে পুণ্য ও পুণ্যবানের পরিচয় খুব স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নাউওয়াছ-এবনে-ছামেআন নামক ছাহাবী হজরতকে পুণ্য ও পাপের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত তাঁহার উত্তরে বলিলেন :—

البر حسن الخلق و الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس

চরিত্রের সততাই পুণ্য, এবং যাহা তোমার অন্তরে অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া দেয় আর সে বিষয়টা লোক সমাজে প্রকাশ পাওয়া তোমার অনভিপ্রেত হয়—সেইটাই পাপ (মোছলেম)। বলা বাহুল্য যে, ইহা পাপ ও পুণ্যের শাব্দিক তাৎপর্য্য নহে, বরং তাহার বাস্তব লক্ষণ ও পরিচয়।

পূর্ব্ব রুকু'র শেষ আয়তে ঈমান-হীন দানের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, এখানে সার্থকদানের ও তাহার প্রাণবস্তু ঈমানের পারস্পরিক অপরিহার্য্য সম্বন্ধের বিষয় অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হইতেছে।

ঈমানের সেই প্রাণ-বস্তু হইতেছে—আল্লার-প্রেম। এছলামের সব বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সারৎসারই হইতেছে এই প্রেম। ছুরা বকরার ১৭৭ আয়তেও এই প্রসঙ্গে সমস্ত আমল বা কর্ম্মের মূল স্বরূপে সর্ব্বপ্রথমে على حبه "তাঁহার প্রেম-বশতঃ"—এই শর্ত্তটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়তের সার শিক্ষা এই যে—মানুষ যেদিন তাহার প্রেমময় মালেক-আল্লাহকে দুনয়ার সমস্ত বিষয় ও বস্তু হইতে অধিকতর ভালবাসিতে সমর্থ হইবে, তাহার পুণ্যলাভের সাধনাগুলি সার্থক হইবে সেইদিন।

আমরা দুনয়ার বহু বিষয় ও বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকি। অর্থ, যশ, সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তান-সন্ততি, এসমস্তই আমাদের ভালবাসার পাত্র। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের ভালবাসার 'ক্রমে' যথেষ্ট তারতম্যও করা হইয়া থাকে। অর্থ ও সন্তান উভয়কেই আমরা ভালবাসি বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অর্থের মায়ায় আমরা সন্তানকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না, বরং সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতে একটুও ক্লেশ অনুভব করি না। তাহা হইলে দেখা গেল যে, আমরা অর্থ ও পুত্র উভয়কে ভালবাসিলেও, অর্থ অপেক্ষা পুত্রের প্রেমই আমাদের অন্তরকে সমধিক পরিমাণে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলতঃ অধিক ভালবাসার বস্তুর জন্য অপেক্ষাকৃত কম ভালবাসার বস্তুকে আমরা সর্ব্বদাই 'কোরবান' করিয়া আসিতেছি, এবং ইহাই স্বাভাবিক।

এই সব বিষয় ও বস্তুর প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে, আল্লাহকেও আমরা ভালবাসিয়া থাকি। আল্লার ও গ'য়রুল্লার এই যে প্রেম, তুলনায় ইহার মধ্যে কোনটা অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহার পরীক্ষা হয় কর্ম্মক্ষেত্রে। আমরা যদি সত্যসত্যই আল্লাহকে গ'য়রুল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে, আবশ্যক হওয়া মাত্রই, আল্লার জন্য গ'য়রুল্লাহকে কোরবান করিতে আমাদের একটুও দ্বিধা হইতে পারে না। তাই আয়তে বলা হইতেছে যে, এইরূপে আল্লাহকে প্রিয়তম, শ্রেয়তম ও চরমকাম্যরূপে গ্রহণ করার যে সার্থকসাধনা, কোরআনের বিচারে তাহাই হইতেছে—পরম পুণ্য, অর্থাৎ পুণ্যের মহত্তম ও উচ্চতম চরম স্তর।

আয়তে "ব্যয়" বলিতে কেবল অর্থব্যয়কে বুঝাইতেছে না, বরং সর্ব্বমুখী ও সর্ব্বব্যাপী ত্যাগই আয়তের উদ্দেশ্য। আল্লার কাজের জন্য আবশ্যক হইলে, ধনসম্পদের ন্যায়, তোমাকে নিজের সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সব মান-অভিমান এবং জীবন মরণের সব উপাদান উপকরণকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তোমার এছলাম বা আত্মসমর্পণের প্রথম ও প্রধান কথা ইহাই।

اینک اینک سر و اینک سو و اینک شمشیر
راضیم هر چه تو خواهی برضاے تو قسم

৩১৪ এছরাইল

বাইবেল অনুসারে হজরত য়্যাকুবের দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী নাম হইতেছে 'এছরাইল।' সদাপ্রভু এক রাত্রি এক পুরুষের রূপ ধরিয়া নামিয়া আসেন। সারা রাত্রে ধরিয়া য়্যাকুবের

সহিত তাঁহার মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু সদাপ্রভু কিছুতেই তাহাকে জয় করিতে না পারায় অবশেষে "তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরু-ফলক স্থানচ্যুত হইল!" কিন্তু ইহাতেও যাকোব (য়্যাকুব) তাঁহাকে ছাড়িলেন না। এদিকে সকাল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সদাপ্রভু অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন যাকোব মুক্তিপণ স্বরূপ সদাপ্রভুর নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ আদায় করিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর সদাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি? তিনি (যাকোব) উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি বলিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল নামে আখ্যাত হইবে; কেন না তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।" সদাপ্রভুর উপরোক্ত আঘাতের ফলে এছরাইল জন্মের মত খোঁড়া হইয়া গেলেন "এই কারণে ইস্রায়েল সন্তানগণ অদ্যাবধি শ্রোণিফলকের উপরস্থিত মাংসপেশী ভক্ষণ করে না"—আদিপুস্তক, ৩২ অধ্যায়। বিস্তারিত আলোচনা ৩১৫ টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩১৫ এহুদীদিগের উপস্থাপিত সংশয়

এই ছুরার সপ্তম রুকু'তে, বিশেষতঃ তাহার ৬৭ আয়তে, বলা হইয়াছে যে, মুছলমানরাই হজরত এবরাহিমের ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিয়া থাকে। কোরআনের এই দাবীকে অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য, হজরতের সমসাময়িক এহুদীরা দুইটী সংশয় উপস্থিত করে। তাহারা বলে:—

(১) এহুদীদিগের ধর্ম্মে যে সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করা অবৈধ বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, তাহার মধ্যকার কতকগুলিকে তোমরা বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। যেমন উটের মাংস, গোমেষাদির মেদ, ইত্যাদি।

(২) দুনয়ার প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির হইতেছে বায়তুল-মোকাদ্দছ। হজরত এবরাহিম ও তাঁহার বংশের নবীরা সকলেই উহাকে কেব্লারূপে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। তোমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কা'বাকে কেব্লা বানাইয়া লইয়াছ।

সুতরাং হজরত এবরাহিমের অবলম্বিত ধর্ম্মপথের অনুসরণ করার যে দাবী তোমরা উপস্থাপিত করিয়াছ, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

এহুদীদিগের দ্বিতীয় সংশয়টীর উত্তর ৯৫ ও ৯৬ আয়তে দেওয়া হইয়াছে। এখানে প্রথম সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাহাদের ধর্ম্মে অবৈধ বলিয়া যে সব খাদ্যের উল্লেখ এহুদীরা করিতেছে, তাহাদের ধারণা ও স্বীকারোক্তি অনুসারে সেগুলি হারাম বা অবৈধ হইয়াছে, তাওরাতের আদেশক্রমে, হজরত মূছার সময় (লেবীয় ৭—২২, ১১—৪; ২য় বিবরণ, ১৪শ অধ্যায়)। অথচ হজরত মূছার আবির্ভাব হইয়াছে, হজরত এবরাহিমের বহু শতাব্দী পরে। হজরত এবরাহিমের সময় হইতে হজরত মূছার সময় পর্য্যন্ত ঐ খাদ্যগুলি বৈধ বলিয়া পরিগণিত ছিল বলিয়াই'ত নূতন আদেশদ্বারা সেগুলিকে অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। সুতরাং

মুছলমানদিগের ব্যবহৃত তোমাদিগের আপত্তিজনক এই খাদ্যগুলি যে, হজরত এবরাহিমের সময় অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত, এরূপ দাবী করা সঙ্গত হইবে না।

হজরত য়্যাকুব যে, খোঁড়া হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা উভয় পক্ষের স্বীকৃত। কিন্তু বাইবেল বলিতেছে যে, খোদার সঙ্গে কুস্তি লড়িয়া ও তাঁহার প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই যাকোব খোঁড়' হইয়া যান (৩১৪ টীকা)। কিন্তু পক্ষান্তরে হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন যে, হজরত য়্যাকুব عرق النساء, Sciatica * বা শ্রোণীবাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং এই রোগের জন্য কুপথ্য মনে করিয়া পেশীর মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করেন (বায়হাকী, হাকেম প্রভৃতি—মন্‌ছুর)। তিরমিজিতে ও বোখারীর তারিখে, এই সঙ্গে উটের দুধ ও মাংস বর্জ্জন করার সংবাদও পাওয়া যায়। হজরত য়্যাকুব এই কুপথ্যগুলিকে বর্জ্জন করায়, অন্ধ অনুকরণকারীরা কালক্রমে উহাকে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং ঐগুলিকে অবৈধ খাদ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। 'এছরাইল নিজের প্রতি যাহা নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল' পদে এই বিষয়টীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩১৬ আল্লার নামে মিথ্যা-রচনা

এহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক হইতেই তাহাদের উপস্থাপিত সংশয়ের অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সমস্ত যুক্তিপ্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বলে যে, মুছলমানদিগের ব্যবহৃত বহু বস্তুকে আল্লাহ হজরত এবরাহিমের প্রতি অবৈধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সুতরাং অত্যাচারী। প্রাসঙ্গিক হিসাবে ইহাই এখানকার বিশেষ তাৎপর্য্য। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআনের কোন আয়ত, বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে প্রকাশিত হইলেও তাহার আদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ ব্যাপকভাবে বলবৎ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেখানে, যে সময় বা যে অবস্থায় যে কেহ এইরূপে আল্লার নামে মিথ্যা রচনা বা তাহার রটনা করিবে, কোরআনের ন্যায়দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অত্যাচারী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

আল্লার নামে মিথ্যা রচনা করার তাৎপর্য্য—যে বস্তু বা বিষয়কে আল্লাহ বৈধ কিম্বা অবৈধ বলিয়া কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই, সেইরূপ বিষয় বা বস্তুকে ধর্ম্মের হিসাবে বৈধ বা অবৈধ বলিয়া বিশ্বাস করা, অথবা, নিজেদের রচিত পুথিপুস্তক বা বিধিব্যবস্থাকে আল্লার কালাম ও আল্লার হুকুম বলিয়া প্রচার করা। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই শ্রেণীর মিথ্যা-রচনাগুলি জগতের সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপন্থীদিগের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ।

৩১৭ সত্যই মূল লক্ষ্য

এই আয়তে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, এবরাহিমকে অনুসরণ করার অর্থ—নরপূজা নহে। এবরাহিমের লক্ষ্য ছিল সত্য, আর তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে সত্যাশ্রয়ী। সত্যকে লাভ করার জন্য তাঁহার আশৈশবের সেই ব্যাকুল সাধনা, সত্যের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন—

* আরবী তাওরাতেও ঠিক এই عرق النساء শব্দটাই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহাই'ত হজরত এবরাহিমের মিল্লতের মূল কথা, অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ ও ধর্ম্মপন্থার প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব তাঁহার জীবন-আদর্শ ও ধর্ম্ম-পথের অনুসরণ করিতে চায় যাহারা, তাহাদেরও প্রথম কাম্য ও প্রধান সাধ্য সেই সত্যই হওয়া উচিত। গরুর চর্ব্বি বা উটের মাংসের বৈধতা বা অবৈধতার তর্ক, তাহার অনেক পরের কথা।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে—'এবরাহিম মোশ্‌রেকদিগের অন্তর্গত ছিল না।' অর্থাৎ, মোশ্‌রেকদিগের মানসিকতা তাহার মধ্যে ছিল না, তাহাদের বিচার ধারার অনুসরণও সে করিত না। অতএব শের্ক বা অংশীবাদের মহাপাতক তাহাকে কোন দিক দিয়াই স্পর্শ করিতে পারে নাই। মোশ্‌রেকী-মানসিকতার একটা বড় অভিশাপ হইতেছে, নিজেদের বর্ত্তমান পরিবেষ্টনের সব কিছুকে বিনাবিচারে সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া। এই বিশ্বাসের ফলে তাহাদের বিচারবুদ্ধি এমন শোচনীয়ভাবে পঙ্গু হইয়া পড়ে যে, আল্লার কালামকে, রছুলের বাণীকে এবং নিজেদের জ্ঞান ও বিবেকের নির্দ্দেশগুলিকে প্রণিধান করার শক্তি সামর্থ্য হইতে তাহারা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ফেলে। গত ছয় শত বৎসর হইতে এই রোগটী মুছলমানের জাতীয় জীবনকে নানারূপে ও নানা সূত্রে জর্জ্জরিত করিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয়, কতকটা দুন্‌য়ার বর্ত্তমান আবহাওয়ার গুণে আর কতকটা বাহিরের নানা আঘাত ও আক্রমণের ফলে, সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে আজ একটা নূতন চিন্তা, নূতন আশা ও নূতন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বাহিরের রূপ বা প্রকাশভঙ্গিটা সব সময় সংযত বা উপস্থিত হিসাবে প্রীতিকর না হইলেও, উহাতে জাতির মঙ্গল-ভবিষ্যতের সূচনারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

২১৮ **কা'বাই প্রথম ধর্ম্ম-মন্দির**

এই আয়তে ও ইহার পরবর্ত্তী আয়তে এহুদীদিগের দ্বিতীয় সংশয়ের উত্তর দেওয়া হইতেছে। আয়তের প্রথমে বলা হইতেছে যে, বক্কার এই গৃহটী স্থাপিত হইয়াছে সর্ব্বপ্রথম ও ও সমগ্র মানবের মঙ্গলের জন্য। রাজী বলিতেছেন—'প্রথম গৃহের' অর্থ ইহা নহে যে, কা'বা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দুন্‌য়ায় আর কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। বরং আয়তের স্পষ্টতর নির্দ্দেশ এই যে, কা'বাই সর্ব্বমানবের জন্য নির্ম্মিত আদি-গৃহ। আরবী সাহিত্যে প্রথমপ্রাপ্ত বস্তুমাত্রকে 'আউওয়ল' বা প্রথম বলা হয়, উহার দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী কিছু থাকুক বা নাই থাকুক (৩—৭)। ছুরা বকরার ১২৫ আয়তে এবং অন্য কএক স্থানে কা'বাকে "আল্লার ঘর" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে 'আল্লার ঘর'-অর্থে, আল্লার এবাদৎ বা পূজা-আরাধনা করার ঘর (১১৪)। সুতরাং কা'বা সম্বন্ধে বর্ণিত এই আয়ত দুটীর অর্থ যথানিয়মে একত্রে গ্রহণ করিলে, আলোচ্য পদের তাৎপর্য্য এইরূপ দাঁড়াইবে:—বিশ্বমানবের হিতার্থে প্রতিষ্ঠিত আল্লার প্রথম আরাধনা মন্দির হইতেছে সেইটী, যাহা বক্কায় প্রতিষ্ঠিত।

অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হইলেও, বক্কা ও মক্কা মূলতঃ অভিন্ন। আরবী সাহিত্যে বে ও মীমের এইরূপ পরস্পর অদল বদল সচরাচর ঘটিয়া থাকে (রাগেব, বোল্‌দান)। এখানে

মক্কার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত 'বক্কা'–শব্দ ব্যবহার করার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এহুদী ও খৃষ্টান সমাজ যে-বাইবেলকে আল্লার কালাম ও নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে এই বক্কা ও তাহার ধর্ম্মমন্দির কা'বার উল্লেখ স্পষ্ট ভাষায় করা হইয়াছে (জবুর বা গীতসংহিতা ৮৩—৪ হইতে ৬ পদ)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে, আয়তে বর্ণিত কা'বার বৈশিষ্ট্যটা কেবল তাহার প্রাচীনত্বেই সীমাবদ্ধ নহে। সমগ্র মানবসমাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লার এবাদতের জন্য প্রতিষ্ঠিত—এই দুইটীও কা'বার বিশেষণরূপে সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। জগতের অন্যান্য "ধর্ম্ম মন্দির"গুলির অবস্থার সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, দুন্‌য়ার সকল দেশের সকল জাতির সকল মানবের জন্য তাহার কোনটাই নির্ম্মিত হয় নাই, অথবা পৌত্তলিকতার জঘন্যতম ঈশ্বরদ্রোহকে চিরস্থায়ীরূপে জয়যুক্ত করিয়া রাখার জন্যই সেগুলির প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে সময়ের হিসাবেও তাহার কোনটাই কা'বা অপেক্ষা প্রাচীন নহে।

ছুরা বকরার ১২৭ আয়তে বলা হইয়াছে যে, কা'বা গৃহ স্বয়ং হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার প্রমাণ ৯৬ আয়তে দেওয়া হইয়াছে। বাইবেলের Chronology অনুসারে, হজরত এবরাহিমের মৃত্যু হইয়াছে সৃষ্টিসনের ২১৫১ সালে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৫৩ সনে। এছরাইল-বংশীয়রা মিসরে অধিবাসস্থাপন করেন সৃষ্টিসনের ২২৯৮ সালে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭০৬ সনে। সুতরাং হজরত এবরাহিমের মৃত্যুর ১৪৭ বৎসর পরে এছরাইলীয়রা মিসরে গমন করিয়াছিলেন। "এছরাইল-সন্তানেরা ৪৩০ বৎসর কাল মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন" (যাত্রা ১২—৪০)। "মিসর দেশ হইতে এছরাইল-সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার ৪৮০ বৎসরে ...... শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন" (১ রাজাবলি ৬—১)। "আর সাত বৎসরে ঐ গৃহের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়" (ঐ, ৩৮ পদ)। সুতরাং হজরত এবরাহিমের মৃত্যুর (১৪৭ + ৪৩০ + ৪৮০ + ৭ =) ১০৬৪ বৎসর পরে হজরত ছোলায়মান কর্ত্তৃক বায়তুল-মোকাদ্দছ বা যেরূসিলম-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর অন্ততঃ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে হজরত এবরাহিম কা'বার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাইবেল অনুসারে কা'বা নির্ম্মিত হইয়াছিল বায়তুল-মোকাদ্দাছের পূর্ণ ১১ শত বৎসর পূর্ব্বে। এই হিসাব অনুসারে বায়তুল-মোকাদ্দাছের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১০৪ সালে। ইহার সঙ্গে ১৯৩৪ সাল যোগ করিতে হইবে। সুতরাং আজ হইতে (১০৪ + ১৯৩৪ + ১১০০ =) ৩১৩৮ বৎসর পূর্ব্বে হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক কা'বা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কা'বা-মন্দিরের প্রাচীনত্ব অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রেও সপ্রমাণ হইয়াছে। বিখ্যাত গ্রিক-ঐতিহাসিক (Herodotus) হিরোদোতাসের জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৪ সালে। আরব দেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি তাহাদের প্রধান বিগ্রহ اللات লাতের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, লাৎ কা'বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদিগের অন্যতম। আর একজন স্বনামখ্যাত গ্রিক্‌-ঐতিহাসিক (Diodorus Siculus) যীশুখৃষ্টের এক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

আরবদেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"...... there is, in this country, a temple greatly revered by the Arabs." অর্থাৎ, আরব্যদেশে একটী মন্দির আছে, আরবজাতি যাহার অত্যন্ত সম্ভ্রম করিয়া থাকে। সার উইলিয়ম মুয়র এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন :— These words must refer to the Holy House of Mecca, for we know of no other which ever commanded such universal homage.* অর্থাৎ, এই শব্দগুলি নিশ্চয়ই মক্কার পবিত্র ধর্ম্মমন্দির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। কারণ, কা'বার ন্যায় সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছে—এরূপ অন্য কোন মন্দিরের কথা আমরা অবগত নহি।

কা'বার মহিমা স্বয়ংসিদ্ধ, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রদীপ্ত এবং কোরআন ও হাদিছের বহু প্রমাণদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার জন্য মিথ্যা-গল্পগুজব রচনার দরকার কখনও ছিল না, এখনও নাই। তত্রাচ ভক্তি-ব্যবসায়ী একদল কথক, ভক্তি-বিলাসী জনসাধারণের জন্য কা'বার বহু অভিনব 'ফজিলৎ' নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। এছলামবৈরী খৃষ্টান-লেখকগণ এই গল্পগুজবগুলিকে অতিশয় অন্যায়ভাবে এছলামের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সুযোগে তাহার প্রতি বেশ কতকটা ঠাট্টা বিদ্রূপও করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ওমর-উমাইয়ার জম্বিলের অথবা আলাউদ্দিনের প্রদীপের গল্প আরবী ভাষায় লিখিত হইলেও, এছলামের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে, কথকদিগের স্বরচিত গল্পগুজবগুলি, কোরআন নহে, হাদিছ নহে, ইতিহাসও নহে। সুতরাং এছলামধর্ম্মের সহিত সেগুলির সম্বন্ধ-সংশ্রব কিছুই নাই। মুছলমানরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, পাখীরা কখনই কা'বার উপর দিয়া উড়িয়া যায় না। এমাম রাজীর ন্যায় মহাপণ্ডিত তফছিরকারও এই ব্যাপারকে কা'বার 'ফজিলৎ' হিসা'বে উল্লেখ করিয়াছেন (কবির ৩—১০)। অথচ ইহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উপকথা, এই লেখক তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। এইরূপ গল্পগুজব আরও অনেক আছে, ধর্ম্মের দিক দিয়া সেগুলির সহিত কোন সম্পর্ক মুছলমানের নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের পাদ্রী-বন্ধুরা এই সব বাজে গল্পগুজবকে লইয়া মুছলমানের উপর আক্রমণ চালাইতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র হইয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং তাঁহাদের বাইবেলই যে এই গল্পগুলিকেও হারাইয়া দিয়াছে, আক্রমণের সময় সে বিষয়টী একবারও তাঁহাদের মনে আসে না। এই প্রসঙ্গে "সদাপ্রভুর হস্তচালনক্রমে রচিত" যেরূশেলম-মন্দিরের 'প্ল্যান'টার কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখিতে তাঁহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি (১ বংশাবলি, ২৮ অধ্যায়, ১১—১২—১৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

৩১৯ কা'বার নিদর্শনত্রয়

কা'বা-গৃহের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটী "স্পষ্ট নিদর্শনের" উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করা

---

* Life of Mohammad, Wm. Muir, Introduction C iii,

হইয়াছে। কা'বা যে হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এই নিদর্শনগুলি হইতে তাহাও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে প্রথম নিদর্শন হইতেছে—"মকামে এবরাহিম।"

"মকামো-এবরাহিম"-পদের মকাম-শব্দের বুৎপত্তি লইয়া বিনা কারণে নানা প্রকার মতভেদ করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, এখানে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া হজরত এবরাহিম শেষ বয়সে কা'বার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, কা'বার প্রাচীর গাঁথার সময়—যখন তাহা উঁচু হইয়া উঠিল এবং মাটিতে দাঁড়াইয়া গাথুনীর কাজ অসম্ভব হইয়া গেল, তখন হজরত এবরাহিম একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইয়া গাথুনীর কাজ সমাধা করিয়াছিলেন। ঐ পাথরখানিই মকামে এবরাহিম নামে পরিচিত। কিন্তু, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কা'বার উচ্চতা ২৪।২৫ হাতের কম নহে। একখানা ক্ষুদ্র পাথরের উপর দাঁড়াইয়া তাহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করা কোনমতেই সম্ভব নহে। কাহার কাহার মতে, বিবি হাজেরা হজরত এবরাহিমকে ঐ পাথরখানির উপর বসাইয়া তাঁহার মাথা ধুইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নাম হইয়াছে মকামে-এবরাহিম। কিন্তু "মকাম" শব্দের অর্থ দাঁড়াইবার স্থান, বসিবার স্থান নহে। এই গল্পটী সত্য হইলে সেজন্য মকাম না বলিয়া 'মজলিসে-এবরাহিম' বলাই সঙ্গত হইত। সে যাহা হউক, এই সমস্ত উক্তির কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ কেহ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই গল্পগুলিকে আমরা সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারি।

আমাদের মতে মকাম-শব্দের বুৎপত্তি তাহার ধাতুর মধ্যেই নিহিত আছে। মকাম, কিয়াম-শব্দের জর্ফ বা অধিকরণ, উহার অর্থ—কিয়াম করার স্থান। আভিধানিক হিসাবে কিয়াম শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ—দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন নামাজের কিয়াম, মৌলুদের কিয়াম ইত্যাদি। কোন স্থানে বাস করাকেও কিয়াম বলা হয়। এই জন্য মোছাফেরের মোকাবেলায় বলা হয়—মকিম। বলবৎ হওয়া, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, একজনের স্থলে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী হইয়া থাকা অর্থেও ঐ ধাতুর ব্যবহার হইয়া থাকে (রাগেব, মিছবাহ প্রভৃতি)। কায়েমী সম্পত্তি, ওয়ারেছ কায়েম করা ইত্যাদি আমরাও ব্যবহার করিয়া থাকি। কা'বা-প্রাঙ্গণের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম যে স্মরণাতীত কাল হইতে মকামে-এবরাহিম বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ নামকরণের হেতুবাদ সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই, কোরআন বা হাদিছেও সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ হেতুবাদটা আবিষ্কার করার জন্য 'তফছির'-লেখকের মাথা ঘামাইবার কোন দরকারই নাই। তবে, মকাম-শব্দের সাহিত্যিক ব্যবহার আর তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গতভাবে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মক্কায় অবস্থান করার সময় হজরত এবরাহিম এই স্থানে বাস করিতেন, এখানে দাঁড়াইয়া আল্লার এবাদত করিতেন এবং এই অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্নের দ্বারা কা'বার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংস্রব

সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্মরণীয় হইয়া আছে বলিয়া, আল্লার ও তাঁহার বান্দাদিগের ভাষায় এই স্থানটী মকামে-এবরাহিম নামে চিরকালই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।
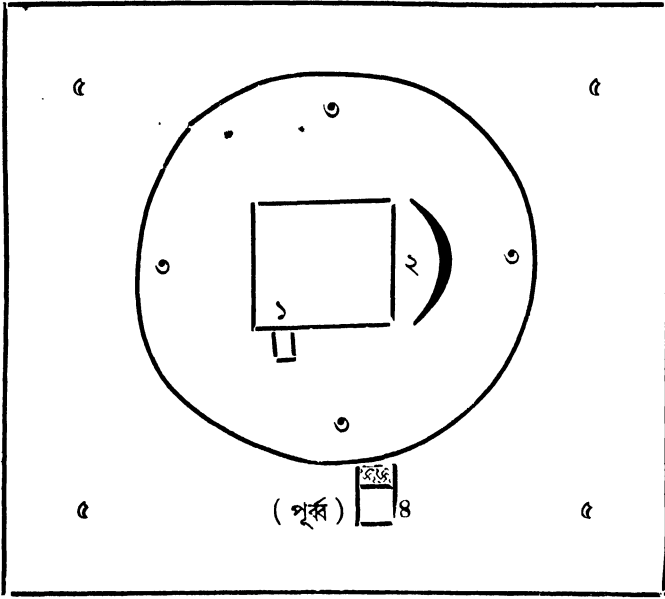
১নং কা'বার দরওয়াজা, ২নং মীজাব, ৩নং তওয়াফ করার বৃত্তাকার স্থান, ৪নং মকামে এবরাহিম, ৫নং মুক্ত প্রাঙ্গণ। মকামে এবরাহিম ছয়টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। ইহার চিহ্নিত অংশটা সুন্দর রেলিং দ্বারা বেষ্টিত, সাদা অংশটা খোলা। তওয়াফ শেষ করার পর এখানে দুই রেকা'ত নফল পড়িতে হয়। প্রাগ-এছলামিক যুগের আরবরা মনে করিত যে, এখানকার একখানা পাথরের উপর হজরত এবরাহিমের পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, পরে বহু লোকের স্পর্শের ফলে সেই চিহ্নটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই কিংবদন্তির সহিত এছলামধর্ম্মের সম্বন্ধ সংশ্রব কিছুই নাই। আজকাল বহু স্থানে "কদম রছুলের" জিয়ারৎ করান হয় এবং বহু পুণ্যার্থী অজ্ঞ মুছলমান সেগুলিকে হজরত রছুলে করিমের পদচিহ্ন মনে করিয়া ভক্তি-ভরে চুম্বন করিয়া থাকে। অথচ এছলামের দৃষ্টিতে এগুলি অতি জঘন্য পাথরপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বর্ত্তমানে যে স্থানকে মকামে-এবরাহিম বলা হয়, আরবজাতি স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাকেই মকামে-এবরাহিম বলিয়া সমবেতভাবে স্বীকার ও প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। হজরত রছুলে করিম ও তাঁহার ছাহাবাগণও যে, ঠিক এই স্থানটীকে মকামে-এবরাহিম বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, বহু বিশ্বস্ত হাদিছ হইতে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বোখারী, বায়হাকি, তিবরানী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত হাদিছ গ্রন্থে এই মর্ম্মের বিভিন্ন হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে (মনছুর ১—১১৮-২০)। তাওয়াফ করার পর মকামে-এবরাহিমে দুই রেকআৎ

নফল নামাজ পড়িতে হয়, স্বয়ং হজরত পড়িয়া গিয়াছেন। ছাহাবী জাবের বলিতেছেন—হজরত মক্কায় আসিয়া তওয়াফ সম্পন্ন করার পর—

اتی المقام فقال و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و صلی رکعتین

'মকামে' উপস্থিত হইলেন এবং "মকামে এবরাহিমকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর"—এই আয়ত" পাঠ করিলেন ও দুই রেকআৎ নামাজ পড়িলেন (মোছলেম, মালেক, তিরমিজি, নাছাই প্রভৃতি)। এই সব হাদিছ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে মকামে-এবরাহিম বলিয়া পরিচিত স্থানটীই কোরআনের নির্দ্ধারিত মকামে-এবরাহিম। এ অবস্থায়, তফছিরের যে সব রাবী মকামে-এবরাহিমের স্থান-নির্দ্দেশ লইয়া মতভেদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ৩১৫ টীকায় এহুদীদিগের যে দুইটী সংশয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, ৯২ ও ৯৫ আয়তে যথাক্রমে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কা'বা হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এই দাবীর উপরই দ্বিতীয় উত্তরের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, ইহাও পাঠক দেখিয়াছেন। কা'বা যে বস্তুতঃ হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ৯৭ আয়তে তাহার প্রমাণ হিসাবে মকামে-এবরাহিমের উল্লেখ করা হইয়াছে।

কা'বার দ্বিতীয় নিদর্শন সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, আরবের সর্ব্বসাধারণ স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছে যে, হজরত এবরাহিম আল্লার আদেশে কা'বাকে 'হরম' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য কা'বা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলিয়া মনে করে। অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক বিপ্লব ও অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের ফলে তাহাদের মধ্যকার কেহ কস্মিনকালে এই হরমের সম্মানহানি করে নাই, হরমের মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত অতিবড় শত্রুরও তাহারা কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। একটা গোটা দেশের সমগ্র অধিবাসীর পরম্পরাগত যুগযুগান্তরের এই যে বিশ্বাস, কার্য্যক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসের এই যে ধারাবাহিক ও ব্যতিক্রমহীন অভিব্যক্তি, ইহাই হইতেছে ইতিহাসের প্রধান অবদান - হজরত এবরাহিমের সহিত কা'বা নির্ম্মাণের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ইহা হইতে স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় নিদর্শন—কা'বার চিরাচরিত হজ-ব্রত। এই হজ্জের যতগুলি অনুষ্ঠান আছে, তাহার প্রত্যেকটীকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পরস্পর বিরোধী আরবগণ স্মরণাতীত কাল হইতে, হজরত এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বলিয়া, পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। মকামে-এবরাহিমের ন্যায় ওয়াদী-এবরাহিম, ছাফা-মারওয়া, মেনা-মোজদালেফা ও আরাফাত প্রভৃতি স্থানগুলির সহিত হজরত এবরাহিমের সাধনা ও পরীক্ষার স্মৃতি শাশ্বতরূপে বিজড়িত হইয়া আছে।

এই তিনটী নিদর্শনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কা'বা বস্তুতই হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সুতরাং ৯২, ৯৫ ও ৯৬ আয়তের যুক্তিপ্রমাণদ্বারা এহুদীদের উপস্থাপিত সংশয় দুইটী

সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে। সার উইলিয়ম মুয়র ও ডঃ মারগোলিয়থ প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ ইহার বিরুদ্ধে যে সব সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, মোস্তফা-চরিতে বহু অকাট্য যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাহার অসঙ্গতি চরমভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। *

৩২০ আল্লার নিদর্শন

ছুরার প্রথম হইতে এ যাবৎ যে সব যুক্তি, প্রমাণ ও সত্য আহলে-কেতাবদিগের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই "আল্লর নিদর্শন"—পদবাচ্য।

৩২১ আল্লার পথ হইতে বারিত রাখা

আল্লার পথ অর্থে, আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম-পথ, অর্থাৎ এছলাম। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের চিরকালের অভ্যাস এই যে, নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া এছলামের সহজ, সরল ও সুন্দর শিক্ষাগুলিকে তাহারা দুনয়ার সম্মুখে 'বক্ররূপে' বা বিকৃত-আকারে উপস্থিত করে, জগতের সত্যাগ্রহী নরনারী যেন তাহার ফলে এছলাম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। আমাদের খৃষ্টান বন্ধুরা কএক শতাব্দী হইতে এ সম্বন্ধে যে সব অসাধু প্রচেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, নজির হিসাবে এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আয়তের শেষভাগে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই শ্রেণীর প্রচারণার নায়কদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক নহেন। অর্থাৎ এই শ্রেণীর দুরভিসন্ধিগুলিকে তিনি সফল হইতে দিবেন না। আল্লার এই প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই সফল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টান লেখক ও প্রচারকদিগের এই সব প্রোপ্যাগেণ্ডা সফল'ত হয়ই নাই। বরং তাঁহাদিগের অসাধু-প্রচেষ্টার উপাদান-উপকরণগুলিকে অবলম্বন করিয়াই এছলাম আজ খৃষ্টান-জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিজের প্রভাব ক্ষিপ্র ও দুর্ব্বার গতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছে।

৩২২ আহলে-কেতাবদিগের আনুগত্য

আয়তে বলা হইতেছে যে, আহলে-কেতাবদিগের কোন দলের আনুগত্য স্বীকার করা মুছলমানদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আল্লার এই নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে, অর্থাৎ এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন দলের আনুগত্য স্বীকার করিলে, মুছলমানকে তাহারা এছলাম হইতে বঞ্চিত করিয়া দিবে, আবার তাহাদিগকে কাফের বানাইয়া ছাড়িবে। এতাআৎ অর্থে তাআৎ স্বীকার করা। তাআতের অর্থ সম্বন্ধে রাগেব বলিতেছেন—

الطوع الانقياد ... و الطاعة مثله ' لكن اكثر ما تقال فى الارتسام فيما رسم

"তাওউন"—শব্দের অর্থ বশ্যতা ও আনুগত্য, তাআতের তাৎপর্য্যও ঐরূপ। কিন্তু অধিকাংশ

* ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ। বিশেষতঃ ১৫১—১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্থলে, 'যাহা আদেশ করা হয়, তাহা পালন করা এবং যে কোন রীতি ও প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহাকে অবলম্বন করা'—এই অর্থে উহার ব্যবহার হইয়া থাকে।" সুতরাং তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইতেছে যে, মুছলমানজাতি নিজকে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে দিবে না, যাহাতে তাহারা এহুদী বা খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাবদিগের আদেশ মান্য করিয়া চলিতে অথবা তাহাদের প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি ও প্রথাপদ্ধতির অনুকরণ করিতে বাধ্য বা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আল্লার এই নিষেধ অমান্য করিয়া চলিলে, মুছলমানকে তাহারা কাফের বানাইয়া ক্ষান্ত হইবে। এখানে আহলে-কেতাব বলিতে সকল শ্রেণীর আহলে-কেতাবকে এবং এতাআৎ বলিতে ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, ভাবে, চিন্তায়, শিক্ষায়, সভ্যতায় ও আচারে ব্যবহারে সকল প্রকারের এবাদৎকে বুঝাইতেছে। এই শব্দ দুইটীকে কোন বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করার কোনই হেতু নাই।

মদীনার আনছারগণ প্রধানতঃ সেখানকার আওছ ও খজরজ গোত্রের লোক। এছলামের পূর্ব্বে এই দুই গোত্রের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের অবধি ছিল না, পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহ দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এহুদীরা এই উভয় গোত্রকেই যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করিত,—ফলে অল্পসংখ্যক হইয়াও উভয় গোত্রের উপর সকল প্রকারে আধিপত্য করিত তাহারাই। এমন কি, এই সুযোগে মদীনায় স্থায়ী এহুদী-রাজ্য স্থাপনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এছলামের আবির্ভাবে আওছ ও খজরজ গোত্রের সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের অবসান হওয়ায় এহুদীদের এই ষড়যন্ত্র পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু এহুদীরা তত্রাচ নিজেদের "স্কিম"টা ভুলিয়া যায় নাই। একদা উভয় গোত্রের আনছারগণ বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময়, এক ধূর্ত্ত এহুদী বন্ধুভাবে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিল। সে সুযোগমত আওছ ও খজরজদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্বকাহিনী এমনভাবে বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল যে, তাহা লইয়া আনছার-দিগের মধ্যে বিতণ্ডা আরম্ভ হইল এবং অচিরাৎ উভয় গোত্রের কতিপয় লোক তরবারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া হজরত স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উপদেশে আনছারগণ শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ও নিজেদের মারাত্মক ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তফছিরের পরবর্ত্তী রাবীরা বলিতেছেন, আয়তটী এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমাদের মতে, "আয়তটী এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার" দাবী অপ্রামাণিক হইলেও ঘটনাটীর উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই আনুগত্য ও তাহার সমস্ত অভিশাপ আজ মুছলমানকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে।

৩২৩ মুছলমানের 'রক্ষা-কবচ'

অন্যলোকের প্রবঞ্চনায় প্রচারণায় সেই শ্রেণীর লোকদিগের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকিতে পারে—কোন পূর্ণ, নিখুঁৎ ও চিরস্থায়ী আলোক যাহারা লাভ করিতে পারে নাই, সে আলোকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার কোন দরদী সাথী যাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া ওঠে নাই

মুছলমানের অবস্থা যে অনুরূপ। আল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোরআনের আয়তগুলি তাহাদের মধ্যে নিয়ত অধীত হইতেছে। ইহাই জগতের চরম পরম ও পূর্ণতম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষার বাস্তব আদর্শ মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা দরদী সাথীরূপে তাহাদের মধ্যে চিরবিদ্যমান। মহানবীর ভৌতিক দেহটী আজ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই, সত্য। কিন্তু তিনি'ত মহানবী দেহের হিসাবে নন। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষা, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শের মধ্য দিয়া আমার মোস্তফা'ত অমৃত, অমর। এহেন স্বর্গীয় শিক্ষা ও অমর শিক্ষক তাহাদের মধ্যে চিরবিদ্যমান থাকিতে, খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাবদিগের প্ররোচনায় নিজেদের ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়া, মুছলমানের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে !

১১ রুকু'

১০১ হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে—তাঁহার উপযোগীভাবে — সতর্ক হইয়া চলিও,[৩২৪] আর (সাবধান!) মরিও না—কিন্তু মোছলেম অবস্থায়।

১০১ يـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِــهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝

১০২ এবং, আল্লার রজ্জুকে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিও—সকলে সমবেতরূপে, এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িও না,— আর তোমাদিগের প্রতি (প্রকাশিত) আল্লার সেই (সময়কার) নে'মতের কথা স্মরণ করিতে থাকিও, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু,সে অবস্থায় তিনি তোমাদিগের অন্তঃকরণগুলির মধ্যে সখ্যস্থাপন করিয়া দিলেন, ফলে তাঁহার সেই নে'মতের কল্যাণে তোমাদের (জাতীয়-জীবনের) প্রভাত আরম্ভ হইল ভাই ভাইরূপে,[৩২৫]—বস্তুতঃ তোমরা (অবস্থিত) ছিলে অগ্নিপূর্ণ এক গহ্বরের কিনারায়, পরে তোমাদিগকে তিনি সেই ধ্বংস

১০২ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْـلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُـرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْــدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًـا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَـا حُفْرَةٍ

مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

হইতে উদ্ধার করিলেন; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদিগের কল্যাণের জন্য নিজ-আয়তগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন — যেন তোমরা সৎপথপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পার।

١٠٣ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى
الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৩ আর, তোমাদিগের মধ্যে একটী মণ্ডলী এরূপ থাকা বিশেষ আবশ্যক — যাহারা আহ্বান করিতে থাকিবে কল্যাণের পানে এবং (যাহারা) সঙ্গতের জন্য আদেশ দিতে ও অসঙ্গত হইতে বারিত করিতে থাকিবে; বস্তুতঃ এই যে লোক সমাজ, সফলকাম হইতে পারিবে ইহারাই।

١٠٤ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا
وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝

১০৪ আর (দেখিও!), তোমরাও যেন সেই সমস্ত লোকের মত হইয়া যাইও না — যাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং (আল্লার কেতাবের) স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদিগের নিকটে সমাগত হওয়ার পরও যাহারা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটাইয়াছে; বস্তুতঃ এই যে লোক সমাজ, ইহাদিগের জন্য নির্দ্ধারিত আছে মহাদণ্ড—

১০৫ —সেই আগামী দিবসে, যেদিন, কতকগুলি মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে (সিদ্ধির পরমানন্দে), আর কতকগুলি মুখ মলিন হইয়া পড়িবে (ব্যর্থতার মনস্তাপে), সেমতে মলিন হইয়া পড়িবে যে সব লোকের মুখ, (তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ—) নিজেদের ঈমানের পর তোমরা কি (কোফ্‌র) অমান্য করিয়াছিলে ? অতএব যে অমান্য করিয়া আসিয়াছ তাহার প্রতিফলে (এই) দণ্ড ভোগ করিতে থাক !

١٠٥ يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ج فاما الذين اسودت وجوههم قف اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ◎

১০৬ কিন্তু উজ্জ্বল হইয়াছে বদন যাহাদের, আল্লার রহমতে (অবস্থিত) তাহারা, তাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী।

١٠٦ واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ط هم فيها خلدون ◎

১০৭ আল্লার আয়ত এ-গুলি, যাহাকে আমরা তোমার সমীপে সত্য-সহকারে আবৃত্তি করিতেছি ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসীদিগের কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না।

١٠٧ تلك ايت الله نتلوها عليك بالحق ط وما الله يريد ظلما للعلمين ◎

১০৮ আর, যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু মর্ত্তে (অবস্থিত আছে)

١٠٨ ولله ما في السموت وما

সে সমস্তই আল্লারই অধিকার-ভুক্ত, আর সমস্ত ব্যাপার প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে (সেই) আল্লারই পানে।

فِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ع

টীকা:—

৩২৪ আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্কতা

আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চল-অর্থে, আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাদের সম্বন্ধে মানুষ-হিসাবে তোমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে সব আছে, সেগুলি পালনে যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া চল। যথাযথভাবে কর্ত্তব্যপালন করার অর্থ—যথাসাধ্যভাবে কর্ত্তব্য-পালনের চেষ্টা করিয়া যাওয়া। "আল্লাহ কোনও ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য করেন না"—ইহা কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষা (২—২৮৬)। ছুরা তাগাবোনের ১৬ আয়তে তাই বলা হইতেছে—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ, "আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিও, তোমাদের সাধ্যানুসারে।" ফলতঃ যথাযথভাবে সতর্ক হওয়া, আর যথাসাধ্যভাবে সতর্ক হওয়া, এই উক্তি দুইটীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই। দুঃখের বিষয়, একদল লেখক ছুরা তাগাবোনের আয়তটীর দ্বারা আলোচ্য আয়তকে মন্‌ছুখ বা রহিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট তফছিরকারগণের মত ইহার বিপরীত (কবির ৩—২৩, আবদুহু ৪—১৮)।

মুছলমানের জাতীয়-জীবন কি উপায়ে, কোন্ উপাদানে এবং কোন্ শ্রেণীর সাধকদিগের দ্বারা গঠিত হইবে; কোন্ শিক্ষার সাধনা ও কোন্ আদর্শের প্রেরণা জাতির সে জীবনধারাকে চিরসুন্দর, চিরসার্থক ও চিরসচল করিয়া রাখিতে পারিবে, আর পক্ষান্তরে কি পাপে, কোন্ অভিশাপে, মুছলমানের জাতীয়-জীবন বিনষ্ট, বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, এই রুকু' হইতে তাহার বর্ণনা বিশেষভাবে আরম্ভ হইতেছে।

মোছলেম-জীবনের সমস্ত কল্যাণ তাহার জ'মাআৎ-গত শক্তি ও চেতনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কারণ, জ'মাআৎই হইতেছে জাতীয়-জীবনের একমাত্র বাহন ও অবলম্বন। মোছলেম-ব্যেষ্টিগণের সমবায়ে এক বিশ্বব্যাপী অখণ্ড জ'মাআৎ গঠন করাই, কোরআনের শিক্ষা ও হজরতের আদর্শগুলির প্রধানতম লক্ষ্য, এবং ইহাই হইতেছে মুছলমানের জাতীয়তা। কিন্তু ব্যক্তিগণের সমষ্টিগত রূপের নামই জাতি। অতএব কোরআনের শিক্ষা অনুসারে জাতিগঠন

করিতে হইলে প্রথমে দরকার হইবে ব্যক্তিগঠনের। তাই রুকু'র প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্তিগঠনের উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

জ'মাআৎ বা সঙ্ঘসাধনার ও তাহার সাফল্যের জন্য প্রথম দরকার হয় তিনটী জিনিষের—জ'মাআতের একটা সাধারণ সাধ্য বা লক্ষ্যের, একটা সাধারণ সূত্রের ও সাধারণ সাধন-ক্ষেত্রের। সাধারণ ক্ষেত্রের পূর্ণ-পরিণতরূপ কা'বার বিশাল মুক্তপ্রাঙ্গণ। সাধারণ সূত্রের কথা পরবর্ত্তী আয়তে বলা হইয়াছে। সাধারণ লক্ষ্যের কথা এখানে বলা হইতেছে। সে লক্ষ্য হইতেছেন—আল্লাহ। আল্লাহ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুছলমান সদা-সচেতন সদা-সতর্ক হইয়া থাকিবে, তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে মুছলমান হিসাবে তাহার যে সব গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, জ্ঞানে বা কর্ম্মে, কোনরূপে তাহার কোন প্রকার অপচয় না ঘটিতে পারে, সেদিকে তাহাকে সাবধান দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। ক্রমাগত সঙ্কল্প ও সাধনার ফলে, সাধনমার্গের নানা পরীক্ষার অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতের কল্যাণে ব্যক্তিগণের মন ও মস্তিষ্ক যখন এই ভাবে আল্লাহময় ও আল্লাহগতরূপে গঠিত হইয়া যাইবে, মুছলমানের জাতীয়-জীবন গঠিত হইয়া উঠিবে তখনই এবং তাহাদিগের সমবায়ে। কাঁচা ইঁট দিয়া পাকা এমারৎ গঠন করা সম্ভবপর হয় না, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

৩২৫ **আল্লার রজ্জু**

হাব্‌ল-শব্দের মূল অর্থ—রজ্জু। লক্ষণায়—প্রেমবন্ধন, সখ্যবন্ধন বা সন্ধিসূত্র প্রভৃতি। এখানে, হাব্‌লুল্লাহ বা আল্লার রজ্জু অর্থে কোরআনকেই বুঝাইতেছে, স্বয়ং হজরত রছুলে-করিমের মুখে আমরা এই তাৎপর্য্য জানিতে পারিতেছি (আহমদ, তিবরানী প্রভৃতি, মনছুর ২—৬০)। সুতরাং অন্য কাহারও দেওয়া কোন তাৎপর্য্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও কোন আবশ্যক আমাদের নাই। মুছলমানের জাতীয়-জীবনের সাধারণ সূত্র হইতেছে, কোরআন। আল্লার দেওয়া এই রজ্জুকে ধারণ করিতে হইবে যুগপৎভাবে—"দৃঢ়তার সহিত" ও "সকলে সমবেতভাবে"। শিথিল হস্তে বা বিক্ষিপ্তভাবে ধারণ করার সার্থকতা কিছুই নাই। বর্ত্তমানে এই দুইটী গুণ হইতে আমরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমাদের জাতীয়-জীবনে একটী গুরুতর অভিশাপের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ধর্ম্মগত সম্প্রদায় বা মজহাবের আবির্ভাবে। মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, হয়ত মঙ্গলজনকও। কিন্তু বিপদ ঘটিয়া বসে মতভেদে পথভেদের সৃষ্টি হইলে, মতভেদকে অবলম্বন করিয়া জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপের বিষ প্রবেশ করিলে, এই অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজের পরিবর্ত্তে জাতি শতধা বিভক্ত ও বিভিন্ন শত্রুসমাজের সমষ্টিতে পরিণত হইলে। এই অভিশাপের ফলে, বিশ্বজনীন মোছলেম-জাতীয়তার কল্পনা করাও আজকাল অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে, মোছলেম জাতীয় জীবনের সাধারণ সূত্র বা আল্লার রজ্জু কোরআন। অন্যান্য নানা বিষয়ে শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, দুনয়ার সকল যুগের সকল

সম্প্রদায়ের সমস্ত মুছলমান কোরআনকে আল্লার সত্য, সনাতন ও শাশ্বত বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, ইহাকেই এছলামের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। দুন্‌য়ার সকল দেশের ও সকল মতের মো'মেনবর্গকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন—তোমরা সকলে নিজেদের মতভেদের উপকরণগুলিকে আমার কোরআনের হুজুরে লইয়া আইস এবং তাহার শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের মাপকাঠি দিয়া সেগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাহার মধ্যকার যেগুলি কোরআনের অনুরূপ হয়, তাহা গ্রহণ কর, এবং তাহার বিপরীত হয় যেগুলি, সেগুলিকে দূরে ফেলিয়া দাও!

আলোচ্য আয়তে মো'মেনদিগকে বলা হইতেছে—তোমরা আল্লার কোরআনকে দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিবে সকলে সমবেতভাবে, আর দেখিও যেন দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িও না। অর্থাৎ দল ও বিভাগের সৃষ্টি, কোরআন ত্যাগ করারই কুফল। মুছলমানের দীন, ধর্ম্ম বা মজহাবের নাম হইতেছে, এছলাম (৩—১৮), আর এছলামের অনুসারীদিগের একমাত্র নাম হইতেছে, মোছলেম। ছুরা হজ্জের শেষ আয়তে বলা হইতেছে—

هو سمكم المسلمين من قبل و فى هذا - الاية

"তিনিই (আল্লাই) তোমাদের নাম রাখিয়াছেন—মোছলেম, পূর্ব্বযুগে ও বর্ত্তমানে ......।" এখন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুছলমান-আমরা যদি কোরআনকে সত্যকারভাবে নিজেদের বিচারকরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে শীআ ছুন্নী, হানাফী আহলেহাদিছ প্রভৃতি বিশেষণগুলি এক মুহূর্ত্তেই আমাদিগের সমাজ-জীবন হইতে দূর হইয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই সব দলগত নাম বা বিশেষণগুলি দূর হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গণ্ডীগত সীমারেখাগুলি আপনা-আপনিই মুছিয়া যাইবে এবং বিশ্বজনীন জ'মাতের কল্পনা আবার সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে।

৩২৬ মুছলমান—ভ্রাতৃসমাজ

কোরআনের বাণী প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, মানুষের সহিত মানুষের ঐক্য-বন্ধনের কোন সাধারণসূত্র বিশ্বমানবের কর্ণগোচর হইতে পারে নাই। তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় ইতিহাসের সমবেত সাক্ষ্য এই যে, তখনকার ঐক্য ছিল বংশ হিসাবে, বর্ণ হিসাবে, গোত্র হিসাবে, ব্যবসায় হিসাবে, বড় জোর দেশ হিসাবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐক্যগুলিই দুন্‌য়াজোড়া মহা অনৈক্যের ও শোচনীয় সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এই সময় আল্লার নে'মৎ আসিল কোরআনের আলোকরূপে। এই আলোকে তাহারা আল্লাহকে চিনিল, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিকেও চিনিয়া লইতে পারিল। তখন তাহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইল যে, মানুষে মানুষে এই অপ্রেমের হেতু বা সঙ্গতি কিছুই নাই। প্রেমময় আল্লার হুজুরে সকল মানুষই সমান, সকলেই তাঁহার এবং তিনি সকলেরই। সুতরাং আল্লার কালাম ও হেদায়ৎ পাওয়ার তাহারা সকলে সমান অধিকারী। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপের সমস্ত শয়তানী ব্যবধানকে পদদলিত করিয়া, বহু শতাব্দীর সর্ব্বনাশকর

সংঘাত-সংঘর্ষকে বিস্মৃত হইয়া, সমস্ত আরব এক অখণ্ড ভ্রাতৃ-সমাজে পরিণত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন মোছলেম-জাতীয়তার এই ঝঙ্কার আরবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া তুন্‌য়ার প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনি তুলিল—

انما المؤمنون اخوة

"তুন্‌য়ার সমস্ত মুছলমান পরস্পরের ভাই—ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না" (৪৯—১ম রুকু')। আল্লার এই নে'মৎকে দূরে ফেলিয়া, ভাই ভাইয়ের পরিবর্ত্তে মুছলমানকে পরস্পরের শত্রুরূপে দাঁড় করাইতে চায় যাহারা, তাহারা মুছলমানের শত্রু – এছলামের শত্রু, এবং মুছলমানের জাতীয় জীবনের অধঃগতির প্রধান কারণ তাঁহারাই। বস্তুতই :—

هر نفسے ازین طائفۂ بو الهوس
بهر تخریب دو کونین بس !

২২৬ অগ্নিপূর্ণ গহ্বর

আয়তে "তোমরা" বলিয়া মুখ্যতঃ প্রাথমিক যুগের মুছলমানদিগকে সম্বোধন করা হইতেছে। ইঁহাদিগকে বলা হইতেছে যে, এছলামের পূর্ব্বে তোমরা একটা অগ্নিপূর্ণ গহ্বরের ধারে অবস্থান করিতেছিলে। অগ্নিপূর্ণ গহ্বরের ধারে অবস্থান করে যাহারা, আগুনের তাপে তাহাদের শরীর সর্ব্বদাই ঝলসিয়া যাইতে থাকে। নিজেদের একটু পদস্খলন হইলে অথবা বাহিরের কেহ একটা ধাক্কা দিলে, সেই গর্ত্তে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণার সহিত পুড়িয়া মরার আশঙ্কাও তাহাদের সকল সময়ই লাগিয়া থাকে। আল্লাহ এছলাম-রূপ নে'মতের সাহায্যে মুছলমানকে সেই আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

"অগ্নিপূর্ণ গহ্বর" বলিতে এখানে নরকের অগ্নিকুণ্ডকে বুঝাইতেছে। মুছলমান না হইয়া মরিয়া গেলে আরবরা সব নরকে প্রবেশ করিত। খোদাতাআলা সেই পরিণতি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তফছিরকারগণের সাধারণ মত ইহাই। ফলতঃ তাঁহাদের মতে নার (অগ্নি) বলিতে দোজখের আগুনকে বুঝাইতেছে। ছুরা মায়দার ৬৩ আয়তের বরাৎ দিয়া মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব তাঁহার ইংরাজী ও উর্দ্দু অনুবাদের বিভিন্ন টীকায় 'নার-অর্থে যুদ্ধ' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নারুল্-হর্ব্ব (সমরানল) বলিলে যুদ্ধকে বোঝায় —এই হেতুবাদে, নার (অনল) অর্থে হর্ব্ব (সমর) এরূপ কথা বলা একেবারেই সঙ্গত হইবে না। কোরআনে বা আরবী সাহিত্যের কুত্রাপি যুদ্ধবিগ্রহ অর্থে নার-শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে উপক্রম ও উপসংহারের ন্যায় আয়তের এই অংশটাও জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে জানা যাইবে যে, হজরত রছুলে করিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব-কালে আরবজাতির চিরাচরিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। এক দিকে রোমান, অন্য দিকে

পার্সিক সম্রাট আরব-দেশকে নিজেদের পদানত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার মদিনায় এহুদী-রাজ্য স্থাপনের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন তখন বিশেষ সফলতার সহিত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। সেই পরাধীনতার অনুভূতি অথবা তাহাতে বাধা দিবার সামর্থ্য তখনকার আরবজাতির আদৌ ছিল না। এই পরাধীনতার উপক্রমকে অগ্নিপূর্ণ গহ্বরের ধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোরআনের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষার ফলে আরবজাতি সেই আসন্ন দাসত্বের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, এছলামের সর্ব্ববিজয়ী সঙ্ঘ-শক্তির মোকাবেলায় অল্প কএক বৎসরের মধ্যে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল, পারস্য সম্রাটের মণিমুকুট ও স্বর্ণসিংহাসন মোছলেম-মোজাহেদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া গেল। ১৩ রুকু' হইতে ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, ১১ ও ১২ রুকু' তাহারই উপক্রম স্বরূপ।

৩২৭ প্রচারক মণ্ডলী

সত্য প্রচারের আবশ্যকতার বিষয় এখানে বর্ণনা করা হইতেছে। তোমাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক এরূপ থাকা চাই—না বলিয়া, এখানে বলা হইতেছে যে, তোমাদিগের মধ্যে একটী 'উম্মৎ' এরূপ থাকা চাই, যাহারা সকলের সাহায্যে ও সকলের হইয়া ধর্ম্ম-প্রচারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে। কারণ কতকগুলি লোকের সমষ্টিমাত্রের নাম উম্মত বা জমাআৎ নহে, এজন্য সকলের একটা বন্ধনসূত্র ও সাধারণ লক্ষ্য থাকাও আবশ্যক।

সেই প্রচারক মণ্ডলীর কাজ হইবে মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকিয়া আনা, তাহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা। পরবর্ত্তী রুকু'র প্রথম আয়তে বলা হইতেছে—

كنتم خير أمة أخرجت للناس

"তোমরাই হইতেছ (সেই) শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী, যাহাকে আবির্ভূত করা হইয়াছে সমগ্র মানবের মঙ্গলের জন্য।" সুতরাং বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যে মুছলমান-জাতির আবির্ভাব এবং ইহাই যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান উপকরণ, এই আয়ত হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে। কিন্তু বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধন সুসম্পন্ন হইবে যে যে উপায়ে ও যে যে অবস্থায়, সকল মুছলমানের পক্ষে সেগুলিকে অবলম্বন করা সকল সময় সম্ভব হইবে না, অনেক সময় সঙ্গতও হইবে না। সুতরাং জাতির মধ্যকার যে সব ব্যক্তি এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত, প্রচারক-সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে তাঁহাদিগের দ্বারা। আর সকলে অন্যান্য উপায়ে এই মণ্ডলীকে সাহায্য করিতে থাকিবেন।

আয়তে খ'এর, মা'রূফ ও মুনকার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথাক্রমে উহার অনুবাদ করিয়াছি কল্যাণ, সঙ্গত ও অসঙ্গত বলিয়া। যাহাদ্বারা মানুষের কোন প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ সকল বস্তু ও বিষয়কেই খ'এর বলা হয়। কোরআন এই শ্রেণীর সমস্ত কল্যাণের

আকর, এই হিসাবে ছুরা বকরার ১০৫ আয়তে তাহাকে খ'এর বলা হইয়াছে। "মানুষের সংজ্ঞান ও সুষ্ঠু মন যাহাকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে, মা'রূফ বলিতে সাধারণতঃ তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে, ইহার বিপরীত, 'মুন্‌কার'।" -আবদুহু ৪—২৭। রাগেব বলেন :—জ্ঞানের অথবা শরিয়তের দ্বারা যে সব কার্য্যের সৌন্দর্য্য জানিতে পারা যায়, তাহার প্রত্যেকটাই মা'রূফ এবং জ্ঞান বা শরিয়ৎ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় যাহা, তাহাই মুন্‌কার।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, এই কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিবে যাহারা, সফলকাম হইতে পারিবে তাহারাই। বলা বাহুল্য যে, জাতিগত সফলতার কথাই এখানে বর্ণনা করা হইতেছে। মুছলমান যদি (خير أمة) খএর-উম্মৎ হিসাবে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে চায়, দুন্‌য়ায় যদি জাতির হিসাবে সফল হইয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে কোরআনের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচারক-মণ্ডলী গঠন করা তাহার প্রথম কর্ত্তব্য।

৩২৮ বিভাগ ও দলাদলির কুফল

১০২ আয়তে মুছলমানদিগকে দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতে সাধারণভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। এখানে আবার বলা হইতেছে যে, এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি যে সব ধর্ম্ম-সমাজ দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে (হে মুছলমান!) তোমরাও যেন তাহাদিগের ন্যায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না এবং কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষা ও নিদর্শনগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িও না।

১০৩ আয়তে প্রচারক মণ্ডলী গঠনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এছলাম প্রচার করার জন্য। কিন্তু সম্প্রদায় ও মজহাবের দলাদলির মধ্যে এই এছলাম প্রচার অসম্ভব। কারণ, বিভিন্ন দল, বিভাগ ও মজহাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবেন যাঁহারা, তাঁহারা এছলামকে দর্শন করিবেন নিজেদের সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ গণ্ডীগত দৃষ্টি দিয়া। কাজেই পূর্ণ এছলামকে দর্শন ও প্রকাশ করার শক্তি তাঁহাদিগের থাকিবে না। পক্ষান্তরে এই বিভাগ ও বিচ্ছেদের ফলে ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া যাইবে পরস্পরকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করার চেষ্টায়। অমুছলমানের নিকট এছলামের পায়গাম পৌঁছাইবার সময় ও সামর্থ্য তাঁহাদিগের আদৌ থাকিবে না। মোছলেম-বঙ্গের গত এক শত বৎসরের ইতিহাস এই উক্তির একটা শোচনীয় প্রমাণ। এই এক শতাব্দী ধরিয়া হানাফী-মোহাম্মদীর বাহাছ-বিতণ্ডায় বাঙ্গলা প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য কত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, কত উৎসাহ উত্তেজনা দেখান হইয়াছে এবং কত কলহ বিবাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সময় যুযুধান "নাএবে নবী"দিগের মধ্যকার একজনও অমুছলমানদিগের নিকট এছলামের পায়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় যে হাজার হাজার মুছলমান, মিশনরীদিগের প্ররোচনায় এছলামকে বর্জ্জন করিয়া ত্রিত্বের ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল, সেদিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্তও

করিলেন না। বহু কষ্টে স্থাপিত বাঙ্গলার "এছলাম মিশন" পণ্ড হইয়া গেল প্রধানতঃ এই দলাদলির অভিশাপে।

কোরআন মুছলমান সমাজকে উদাত্তস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, আমাকে অবলম্বন করিয়া তোমরা সকলে এক হইয়া থাক। সাবধান! যেন দলে দলে, ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িও না—আর সেই কোরআনের অনুগত উম্মৎ বলিয়া দাবীদার মুছলমান আজ ঢক্কা নিনাদে ঘোষণা করিতেছে, মুছলমান ভাই সকল হুশ্য়ার! কাহারও কথা শুনিও না, এই দলে দলে বিভক্ত হওয়াই হইতেছে খাঁটি এছলাম। যদি ছুন্নৎ জ'মাতের অন্তর্গত হইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে আমাদের নির্দ্ধারিত একটা গণ্ডীর মধ্যে তোমাকে আশ্রয় লইতেই হইবে।

কি ভীষণ অধঃপতন!

৩২৯ দলাদলির অপরিহার্য্য দণ্ড

পাঠকগণকে ১০৪ ও ১০৫ আয়তের অনুবাদ আর একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই আয়ত দুইটী পরস্পর সংলগ্ন। এখানে বলা হইতেছে যে, ১০৪ আয়তের নিষেধকে অমান্য করিয়া মুছলমানরা যদি দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, এই দলাদলি ও আত্মবিচ্ছেদের অপরিহার্য্য স্বাভাবিক দণ্ড তাহাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে। "সেই দিবস" বলিতে দুন্য়ার ভবিষ্যৎ সময়, পরকালের কিয়ামৎ বা উভয়কেই বুঝাইতে পারে। জাতি গঠনের যে ধারার এখানে বর্ণনা করা হইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, আল্লার কেতাব সমাগত হওয়ার পর মুছলমানদিগের যে দলাদলির নিন্দা ১০৪ আয়তে করা হইয়াছে, ১০৫ আয়তে তাহাকে "কোফর" বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। বস্তুতঃ এছলামকে স্বীকার করার পর এই দলাদলির ও আত্ম-বিচ্ছেদের ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহিতা আর কিছুই হইতে পারে না।

৩৩০ আল্লার ন্যায়বিধান

উপরে যে সফলতা, বিফলতা এবং দণ্ড ও পুরস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তই মানুষের কর্ম্মফল প্রসূত। সেই সব কর্ম্ম ও তাহার ফলাফলের কথা এই আয়তগুলিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল। এখন বিশ্ববাসীদিগের মধ্যে যাহারা সেগুলিকে মান্য করিয়া চলিবে, তাহাদের জীবন সফল হইবে এবং তাহারাই সে পুরস্কার লাভ করিবে। পক্ষান্তরে সেগুলিকে অমান্য করিয়া চলিবে যাহারা, তাহাদের জীবন বিফল হইয়া যাইবে এবং নিজেদের এই কুকর্ম্মের কুফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। বিশ্ববাসীদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আল্লার অবিচার নাই, অতএব মুছলমানের প্রতিও তাঁহার কোনও পক্ষপাত নাই। ঈমানের পরেও সে যদি আল্লার এই বিধানগুলিকে অমান্য করিয়া চলে, তাহা হইলে আল্লার ন্যায়বিচারে তাহাদিগের জাতীয় জীবন বিফলতায় ও অপমানে অভিশপ্ত হইয়া পড়িবে। আবার অমুছলমান

যদি তাঁহার এই নির্দ্দেশগুলি মান্য করিয়া চলে, তাহা হইলে ইহার সুফল তাহারা এই জীবনে লাভ করিবে।

মুছলমানের চারি পার্শ্বে, দুন্য়ার দিকে দিকে, এই বাণীর সত্যতা নিত্য নূতন আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার জাতীয় মনে তবুও চেতনার উদ্রেক হইতেছে না। তাহার কণ্ঠ 'শেক্ওয়ার' আর্ত্তনাদে মুখরিত, কিন্তু আত্মা ঈমান বর্জ্জিত, কর্ম্মবিমুখ। অন্য জাতিকে তাহার কর্ম্মফল হইতে বঞ্চিত করিয়া আল্লাহ্ মুছলমানের পক্ষপাতী হউন—তাহার অকর্ম্মণ্যতা ও ধর্ম্মদ্রোহকে পুরস্কৃত করুন, কাপুরুষের মত ইহাই তাহার আকাঙ্খা। কারণ—তাহারা 'মুছলমান!' এই মিথ্যা সম্মোহের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করিয়া আয়তে বলা হইতেছে যে, এইরূপ পক্ষপাত ও অবিচার আল্লার পক্ষে অসম্ভব।

১২ রুকু'

১০৯ তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী, যাহাকে আবির্ভূত করা হইয়াছে বিশ্বমানবের হিতকল্পে—তোমরা সঙ্গতের আদেশদান করিতে ও অসঙ্গত হইতে নিষেধ করিতে থাকিবে, আর আল্লার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া চলিবে; বস্তুতঃ আহ্‌লে-কেতাবগণ ঈমান আনিলে, তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক হইত; তাহাদিগের মধ্যকার কতক লোক হইতেছে মো'মেন, আর তাহাদিগের অধিকাংশই অনাচারী (ফাছেক)।

১১০ কিঞ্চিৎ ক্লেশদান ব্যতীত, তোমাদিগের (অন্য) কোন ক্ষতি তাহারা কখনই করিতে পারিবে না; আর তোমাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগকে তোমাদের মোকা-বেলায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শনই করিতে হইবে, তৎপর (কোন দিকের) কোন সাহায্যই তাহারা পাইতে পারিবে না।

١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

١١٠ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

١١١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ق

১১১ তাহাদিগকে (দুন্‌য়ার) যে কোন স্থানে পাওয়া যা'ক না কেন (দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই) তাহারা অপমান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে—তবে, আল্লার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির সাহায্যে এবং মানুষের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির সাহায্যে[৩৩৫]—এবং নিজদিগকে তাহারা আল্লার ক্রোধভাজন করিয়া লইয়াছে, আর তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে (এক বিশেষ) দৈন্যের দ্বারা,[৩৩৬] ইহার কারণ এই যে, ইহারা আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিয়া ও নবীগণকে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়া আসিতেছে; (এই শ্রেণীর পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার) কারণ এই যে, তাহারা অবাধ্য হইয়া ও সীমালঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে।[৩৩৭]

١١٢ لَيْسُوْا سَوَآءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ

১১২ সকলে তাহারা সমান নহে;[৩৩৮] আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে (এরূপ) একটি ন্যায়নিষ্ঠ মণ্ডলী আছে, যাহারা আল্লার-আয়ত-গুলির আবৃত্তি করিতে থাকে

يَسْجُدُوْنَ ۝

রজনীর (নিশিথ-) যামে— সাষ্টাঙ্গ প্রণত অবস্থায়।

١١٣ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১৩ তাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর পরবর্ত্তী দিবসে, আর সঙ্গতের আদেশদান ও অসঙ্গত হইতে নিষেধ করিয়া থাকে এবং সমস্ত সৎকর্ম্মেই তাহারা দ্রুত-তৎপর হয় ; বস্তুতঃ ইহারা হইতেছে সাধু-সজ্জনগণের অন্তর্গত[৩৩৯]।

١١٤ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

১১৪ আর যে সব সৎকর্ম্ম তাহারা সম্পাদন করে, (আল্লার হুজুরে) তাহা কখনই অস্বীকৃত হইবে না ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন— সংযমশীল-লোকদিগের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত[৩৪০]।

١١٥ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১১৫ নিশ্চয় অমান্য করিয়াছে যাহারা, তাহাদিগের ধন-দওলৎ অথবা তাহাদিগের সন্তানসন্ততি কিছুই তাহাদিগকে আল্লার (ন্যায় দণ্ড) হইতে নির্ভাবনা করিতে পারিবে না ; বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে নরকের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী।

১১৬ এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে তাহারা যাহা কিছু ব্যয় করিয়া থাকে, তাহার উদাহরণ[৩৬১]—যেমন, কঠোর শৈত্যপূর্ণ এক বাত্যা-প্রবাহ, যাহা উপনীত হইল এমন একজাতির শস্যক্ষেত্রে-যাহারা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, ফলতঃ ঐ বাত্যাপ্রবাহ সেই শস্যক্ষেত্রকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল[৩৬২]; (চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এইরূপে) আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, পরন্তু বস্তুতঃ নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহারা নিজেরাই।

١١٦ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ◎

১১৭ হে মোমেনগণ! নিজেদের লোক ব্যতীত (এমন) কাহাকেও অন্তরঙ্গরূপে[৩৬৩] গ্রহণ করিও না—তোমাদিগের ক্ষতিসাধনের[৩৬৪] কোন ত্রুটীই যাহারা করে না; তোমাদের গুরুতর ক্ষতি যাহাতে তাহাদের অভিপ্রেত তাহাই, বিদ্বেষভাব'ত তাহাদের মুখের (কথা) হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের

١١٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ صلے وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ◎

অন্তরের গুপ্ত (অভিসন্ধি) গুলি আরও গুরুতর ; বস্তুতঃ তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য আয়তগুলি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিলাম —যদি তোমরা জ্ঞানবান হও !

١١٨ هٰاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ج وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ق وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ◎

১১৮ সেই'ত তোমরা—তাহাদিগকে তোমরা ভালবাসিয়া থাক, কিন্তু তোমাদিগকে তাহারা ভালবাসে না, অথচ (আল্লার) কেতাবে— তাহার সবগুলিতে — তোমরা বিশ্বাস করিয়া থাক,—অবস্থা এই যে, তাহারা যখন তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন বলে ঃ— আমরা ঈমান আনিয়াছি ; আবার যখন নিভৃতে (নিজেদের অন্তরঙ্গ লোকের নিকট) গমন করে, তখন— তোমাদিগের প্রতি কঠোর ক্রোধ বশতঃ — নিজেদের আঙ্গুলগুলি কামড়াইতে থাকে ; বল ঃ— মর !— নিজেদের ক্রোধ লইয়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ (মানুষের) অন্তরের ভাবগুলি সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত।

١١٩ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا

১১৯ কোন মঙ্গল যদি তোমাদিগকে স্পর্শও করিয়া যায়, তাহাও

بِهَا ؕ وَاِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ۚ

তাহাদের মন্দ লাগে, আর তোমাদিগের যদি কোন অমঙ্গল ঘটে তাহাতে তাহারা আনন্দিত হয়; বস্তুতঃ তোমরা যদি (এ অবস্থায়) ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযত হইয়া চল, তাহা হইলে উহাদের দুরভিসন্ধিগুলি তোমাদিগকে একটুও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের সমস্ত কর্ম্মকেই ব্যাপন করিয়া আছেন।[৩৪৮]

টীকা:—

৩৩১ **উম্মৎ—মণ্ডলী**

যে কোন প্রকারের কোন একটা বিষয়কে সাধারণসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া যে সব দল গঠিত হয়, তাহাকে উম্মৎ বলা হয়। এ হিসাবে পশু পক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন দল বা সমাজকেও উম্মৎ বলা হয়। এক সত্য বা আদর্শকে সাধারণসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন মানব সন্তান যখন একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়, মানুষ সম্বন্ধে উম্মৎ-শব্দের প্রয়োগ হইলে, সেই শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ মণ্ডলীকে বোঝায় (কবির, রাগেব)। আল্লার রজ্জু বা কোরআনকে নিজেদের সঙ্ঘবন্ধনের সাধারণ-সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, দুন্য়ার বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও বংশের মানুষদিগকে লইয়া, যে মোছলেম-উম্মৎ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়াই এই আয়তটী উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব রুকু'র প্রথমে (১০১ আয়তে) সমগ্র মো'মেন সমাজকে সাধারণভাবে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি আদেশ ও উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে এখানে বলা হইতেছে—তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী। অতএব, এখানকার "তোমরা" বলিয়া পূর্ব্বকথিত মো'মেনগণকে সমগ্রভাবেই সম্বোধন করা হইতেছে। হজরত রছুলে করিমের একটী উক্তি হইতেও জানা যায় যে, তাঁহার সমগ্র উম্মৎই শ্রেষ্ঠতম-উম্মৎ (আহমদ)। ছুরা বকরার ১৪৩ আয়ত হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই বিশেষণটাকে মুছলমানদিগের কোন বিশেষ লোকসমাজের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে না।

৩৩২ শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলীর লক্ষণ

প্রথমে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ মুছলমানকে শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলীরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন বিশ্বমানবের হিতকল্পে। অর্থাৎ, মোছলেম মণ্ডলী বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুছলমান যদি এই সাধনা সম্বন্ধে অবহেলা করে, অথবা তাহার অস্তিত্ব যদি বিশ্বমানবের পক্ষে অহিতেরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অস্তিত্বের দরকার বা সার্থকতা আর কিছুই থাকিল না। সুতরাং সে অবস্থায়, তাহার শ্রেষ্ঠতম উম্মৎ হওয়ার দাবীটাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়।

৩২৭ টীকায় 'মা'রূফ' ও 'মুনকার' শব্দের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। এই আয়তে শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলীর দুইটী প্রধান কর্ত্তব্যের কথা বলা হইয়াছে। সত্য ও সঙ্গত যাহা কিছু, তাহা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হয়; আদেশে উপদেশে, প্রচারে আলোচনায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করা—এবং অসত্য ও অসঙ্গত যাহা কিছু, মানবসমাজকে তাহা হইতে নিবারিত রাখার যথাসম্ভব প্রয়াস পাওয়া, এই দুইটা সাধনা হইবে মণ্ডলী হিসাবে তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই দুইটী কর্ত্তব্যপালনের সময় এই মণ্ডলীর ব্যক্তিগণ সকলে সত্যকার ঈমানের সকল কল্যাণে নিজের মন ও মস্তিষ্ককে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদেশ-নিষেধ প্রচারের কর্ত্তব্যপালন করিতে যাইবে যাহারা, তাহারা নিজেরাই যদি আল্লাতে সত্যকারভাবে বিশ্বাসবান না হয়, অথবা অসত্য ও অসঙ্গত সংস্কার দ্বারা সেই ঈমানকে আড়ষ্ট ও অবসন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করা তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইবে না। এমাম রাজী বলিতেছেন—"ওছুলশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কোন একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সংক্রান্ত যে গুণ বা বিশেষণগুলির বর্ণনা করা হয়, সেই গুণ বা বিশেষণগুলি সেই সিদ্ধান্তের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। এখানে, মুছলমান-দিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মৎ বলিয়া নির্দ্ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার তিনটী গুণ বা কর্ত্তব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, এই গুণ তিনটীই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।" অতএব মুছলমান যখন এই গুণ তিনটী হইতে যে পরিমাণ দূরে সরিয়া যাইবে, শ্রেষ্ঠ উম্মৎ হওয়ার অধিকার হইতেও সে তখন সেই পরিমাণ বঞ্চিত হইয়া পড়িবে।

অমুছলমানদিগের হিতসাধনা করিতে হইবে কি প্রকারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে কাফ্‌ফাল বলিতেছেন—যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুছলমান বানাইয়া লইতে হইবে। এমাম রাজীও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুফতী আবদুহু তাঁহার তফছিরে বহু অকাট্য যুক্তিপ্রমাণদ্বারা এই মতের অসমীচীনতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন (৪—৬১)। জবরদস্তিদ্বারা কাহাকে মুছলমান করিয়া লওয়া যে অন্যায়, ছুরা ইউনছের ৯৯ আয়তে এবং ছুরা বকরের ২৫৬ আয়তে তাহা খুব স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছে। ২৮৯ টীকায় হাদিছ হইতে এই মতের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কাফ্‌ফালের মত যে, কোরআনের নির্দ্দেশ এবং হজরতের কার্য্য ও আদেশ উভয়ের বিপরীত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩৩৩ আহলে-কেতাবদিগের অবস্থা

আহলে-কেতাবদিগের যে সব লক্ষণ এই রুকু'র ১১০ ও ১১১ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে 'আহলে-কেতাব' বলিতে এহুদীদিগকে বুঝাইতেছে। মোটের উপর, আয়তে বলা হইতেছে যে, আহলে কেতাব বা এহুদীগণ সত্যকার ভাবে ঈমান আনিলে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য মঙ্গলজনক হইত। কিন্তু অবস্থা এই যে, তাহাদিগের অল্পসংখ্যকমাত্র সত্যকারভাবে বিশ্বাসী এবং, মুখে ঈমানের দাবী করা সত্বেও, তাহাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে ঈমানের চতুর্সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

এহুদীদিগের মধ্যে সত্যকারভাবে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মপরায়ণ লোক যে একেবারে নাই, এমন কথা কোরআন কখন বলে নাই। এই আয়তে এবং ইহার পরবর্ত্তী ১১২—১১৩ আয়তে খুব স্পষ্টভাষায় স্বীকার করা হইতেছে যে, আহলে-কেতাব বা এহুদীদিগের মধ্যেও ঈমানদার ও সৎকর্ম্মশীল সাধুসজ্জনদিগের অভাব নাই। কিন্তু তত্রাচ জাতির হিসাবে তাহারা আল্লার অভিশাপভাগী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, কোন একটা জাতি সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে বিচার করিতে হইলে, সেই সমষ্টির অধিকাংশ ব্যেষ্টির সাধারণ অবস্থাই আলোচ্য হইয়া থাকে। "আহলে-কেতাবগণ ঈমান আনিলে"—পদদ্বারা সন্দেহ হইতে পারিত যে, তাহাদিগের মধ্যে ঈমানদার লোক একেবারে নাই। তাই সেই সন্দেহের অপনোদন করার জন্য তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এই আয়তে 'আহলে-কেতাবগণ' বলিতে তাহাদের এই অধিক সংখ্যক ফাছেকদিগকে বুঝাইতেছে।

"আহলে-কেতাবদিগের মধ্যে কতক লোক মো'মেন"—এই আয়তে মো'মেন বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইতেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তফছিরকারগণ সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, আবদুল্লাহ-বেন-ছালাম এবং নাজ্জাশী প্রভৃতি যে সব এহুদী ও খৃষ্টান হজরতের সময় এছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখানে মো'মেন বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। ৩৩৯ টীকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৩৪ এহুদীদিগের অনিষ্ট

এহুদীরা হজরত রছুলে করিমকে এবং তাঁহার ভক্ত-মুছলমানদিগকে সর্ব্বদাই নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদের শত্রুতা ভীষণ আকার ধারণ করে। হজরতকে ও মুছলমান-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলার জন্য তাহারা একদিকে মদিনার কপটদিগের এবং অন্যদিকে মক্কার কোরেশ-দলপতিগণের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ওহোদ যুদ্ধের পূর্ব্বে, তাহাদের ষড়যন্ত্র এমন মারাত্মকরূপে প্রকাশ পায় যে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই তখন মুছলমানদিগের ছিল না। এইরূপ কঠোর সঙ্কটের মধ্যে মুছলমান যখন চতুর্দ্দিক হইতে

পরিবেষ্টিত, সেই সময় তাওহীদের শক্তিকেন্দ্র হইতে অভয় আসিল—মুছলমান! তোমরা বিচলিত হইও না, সাময়িকভাবে সামান্য ক্লেশদান ব্যতীত এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তোমাদিগের কোন গুরুতর অনিষ্ট কখনই করিতে পারিবে না। আর, এই যে তাহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং পূর্ব্বের ষড়যন্ত্র অনুসারে বিশ্বাস করিতেছে যে, মক্কা ও মদিনার এছলাম-বৈরীরা সে উত্থানের সময় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহাদের এ কল্পনাও সফল হইতে পারিবে না। বলা আবশ্যক যে, ধনবলে, জনবলে ও রণসম্ভারের হিসাবে মুছলমানদিগের অবস্থা তখন এতই হীন ছিল যে, দুনয়ার হিসাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার কোন হেতুই তখন দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু আত্মসত্যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এতটা গভীর ও অটুট বিশ্বাস ছিল যে, সেই সঙ্কটের মধ্যে আল্লার এই অভয় বাণীকে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া দিতে তাঁহার অন্তরে অকটুও দ্বিধার সৃষ্টি হইল না। মুছলমান সমাজও সন্দেহশূন্য মনে এই বাণীতে বিশ্বাস ও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন। আল্লার এই সত্যবাণী কিরূপে বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়ার জন্য হজরতের জীবন-চরিত আলোচনা করা উচিত।

৩৩৫ আল্লার ও মানুষের প্রতিশ্রুতি

হীন মানসিকতার ফলে এই হতভাগ্য জাতির অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, নিজেদের শক্তি ও অধিকারের উপর নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে কুত্রাপি সম্ভবপর হয় নাই। দুনয়ার যে কোন প্রান্তে তাহারা অবস্থান করুক না কেন, জাতির হিসাবে কোন নিজস্ব শক্তি বা সম্মান তাহারা পাইবে না। সর্ব্বত্রই তাহারা পরাশ্রয়ী ও পরাধীন।

আল্লার পক্ষ হইতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবলম্বন করিয়া-অর্থে, মুছলমান জাতির বা এছলামধর্ম্মের বশ্যতা স্বীকার করিয়া। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতিশ্রুতি বলিতে অমুছলমান রাজ্যের বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার এবং তাহার ফলে এহুদীদের নাগরিক অধিকার লাভকে বুঝাইতেছে।

বিধর্ম্মী ও পরজাতির এই অধীনতাকে এহুদীদিগের জাতীয় জীবনের নিকৃষ্টতম অভিশাপরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মুছলমান জাতিও ক্রমে ক্রমে এহুদীদিগের মানসিকতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার অপরিহার্য্য স্বাভাবিক ফলে এই অভিশাপটা তাহাদিগের জাতীয় জীবনকেও একটু একটু করিয়া গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মানচিত্র খুলিয়া দেখিলে এই অভিশাপের বহু শোচনীয় নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যাইবে। অথচ কোরআনে এহুদীদিগের উপাখ্যানগুলি এত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ অভিশাপ হইতে মুছলমানকে রক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে!

৩৩৬ মাছ্‌ক'নাৎ—দৈন্য

ছুরা বকরার ৬১ আয়তে মাছ্‌ক'নাৎ-শব্দের অনুবাদ করিয়াছিলাম 'দারিদ্র্য' বলিয়া। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—দৈন্য। দারিদ্র্য না থাকিলেও দৈন্য আসিতে পারে। জেল্লৎ বা অপমান বাহির হইতে আসে, আর দৈন্যের উদ্ভব হয় ভিতর হইতে। ছুরা বকরার ঐ আয়তে বলা হইতেছে—"হেয়তা ও দৈন্যের দ্বারা তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।" এখানে জেল্লৎ (হেয়তা বা অপমান) ও মাছ্‌ক'নাৎ (দৈন্য) শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যটা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়ার দরকার। "যে অবস্থায় মানুষ নিজের অধিকারকে চিনিতে পারে এবং সেই অধিকার লাভ করার ইচ্ছাও তাহার থাকে, কিন্তু অন্যকর্তৃক সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়া—প্রতিকারের সামর্থ্যের অভাবে—সেই পরিস্থিতিকে সে সহ্য করিয়া লয়, ذلت জেল্লৎ বলিতে মানুষের মনের সেই অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু

المسكنة حالة للشخص منشؤها استصغاره لنفسه حتى لا يدعي لها حقا

নিজকে ছোট বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যখন এমন মানসিক অবস্থায় উপনীত হইয়া যায় যে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই তখন আর তাহার থাকে না—সেই অবস্থাকে মাছ্‌ক'নাৎ বলা হয় (আবদুহু ৪—৬৯)। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, মুছলমান সমাজও আজ দৈন্যের এই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

৩৩৭ পতিতজাতির মানসিকতা

পতিতজাতির মানসিকতা কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় অথবা কোন্ প্রকার মানসিকতার জন্য একটা জাতির অধঃপতন ঘটে, এই শ্রেণীর আয়তসমূহে তাহার লক্ষণ ও নিদানগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা:—

(১) তাহারা হেয়তা বা অপমানদ্বারা আচ্ছাদিত হয়—অর্থাৎ নিজের অধিকার অবগত থাকা সত্ত্বেও, অপহরণকারীদিগের হাত হইতে সে অধিকারকে উদ্ধার করার শক্তি তাহাদের থাকে না।

(২) দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ হেয়তা ও অপমান সহ্য করিতে করিতে তাহাদিগের জাতীয় জীবন এমন শোচনীয় ভাবে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, আর তাহার ফলে জাতির ব্যক্তিরা নিজদিগকে এত অপদার্থ বলিয়া মনে করিতে থাকে, যে, সেই অধিকারের সঙ্গতি ও অস্তিত্বকে অনুভব করাও তাহাদের পক্ষে তখন আর সম্ভব হইয়া ওঠে না।

(৩) আল্লাহ মানুষকে যে সব অধিকার দিয়াছেন এবং সেই অধিকারকে অর্জ্জন ও রক্ষা করার যে সব উপায় তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ। আল্লার এই নির্দ্দেশকে এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত উপায়-উপকরণগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে জাতিকে তাহার কুফলভাগী হইতে হয়, নিজেদের

এই কর্ম্মদোষে। আল্লার গজব-অর্থে এই প্রতিফল। 'ক্রোধ' গজবের আভিধানিক অর্থ, এ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে (রাগেব, খাজেন, বায়জাভী)।

আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য করা এবং নবীদিগকে অন্যায়রূপে হত্যা করার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ৭৩ ও ২৪৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩৮ আহলে-কেতাবগণ সকলে সমান নহে

১০৯ আয়তে বলা হইয়াছে যে, "আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের কতক লোক মো'মেন।" এখানে বলা হইতেছে যে, "আহলে-কেতাবগণ সকলে সমান নহে।" অর্থাৎ উপরে আহলে-কেতাবদিগের, বিশেষতঃ এহুদী জাতির চরিত্র ও মানসিকতার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ অবস্থা। তাহাদের মধ্যে এমন সাধুসজ্জনও আছেন, যাঁহারা আল্লার ধ্যান-ধারণায় ও পূজা-আরাধনায় তন্ময় হইয়া থাকেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে ঈমান রাখেন, সঙ্গতের আদেশপ্রদান ও অসঙ্গত হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন এবং সকল প্রকার সৎকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তাঁহারা সদাই তৎপর।

এই দুইটী আয়তকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা অনাবশ্যক তর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রাচীন তফছিরকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে, যে-সকল এহুদী ও খৃষ্টান হজরতের সময় মুছলমান হইয়াছিলেন, এখানে মো'মেন ও সাধুসজ্জন ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, আহলে-কেতাবদিগের সাধুসজ্জনেরাও হজরত রছুলে করিমকে 'রছুল' বলিয়া স্বীকার করে না, অথচ ইহা ঈমানের একটা প্রধান অংশ। সুতরাং তাহাদিগকে মো'মেন বলা যাইতে পারে না।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আয়তে স্পষ্টতঃ আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত "মো'মেন"দিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব আহলে-কেতাব বিশেষণের অন্তর্গত নহে যাহারা, আয়তের বর্ণিত মো'মেন-শব্দ তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, কোরআনের (عرف) পরিভাষায় মুছলমানকে আহলে-কেতাব বলিয়া কখনও উল্লেখ করা হয় নাই (আবদুহু)।

আমাদের বিবেচনায় এই মত দুইটীর মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ সঙ্গত বা সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে। মূল কথা—ঈমান শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া। সাধারণ তফছিরকারগণ ঈমান শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা ঈমানের একটী তাৎপর্য্য, একমাত্র তাৎপর্য্য নহে! মুছলমানদিগের ধর্ম্মীয় পরিভাষা অনুসারে আলেমগণ ঈমানের যে তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহাই ঠিক। কিন্তু কোরআনে মধ্যে মধ্যে অন্য তাৎপর্য্যের জন্যও ঈমান-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই হিসাবে—

يقال لكل واحد من الاعتقاد و القول الصدق و العمل الصالح ايمان

প্রত্যেক বিশ্বাসকে, প্রত্যেক সত্যকথা ও সৎকর্ম্মকে ঈমান বলা হয়। 'হায়া' বা লজ্জাকেও ঈমানের অন্তর্গত করা হইয়াছে। اماطة الاذى বা কষ্টদায়ক পদার্থগুলিকে পথ হইতে সরাইয়া দেওয়াও ঈমানের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (রাগেব)। ছুরা নেছার ৫১ আয়তে আহলে-কেতাবদিগের সম্বন্ধে বলা হইতেছে— يؤمنون بالجبت و الطاغوت তাহারা ঠাকুর বিগ্রহ ও ভূত-প্রেতের প্রতি "ঈমান আনিয়া" থাকে। সংক্ষেপে এই আলোচনার সার এই যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের যে সব সাধুসজ্জনকে এখানে মো'মেন বলা হইয়াছে, আমাদের বিশেষ পরিভাষা অনুসারে তাহারা মো'মেন নহে, ইহা খুবই সত্য। কিন্তু এখানে তাহাদিগকে মো'মেন বলা হইয়াছে সাধারণ আভিধানিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে। পরবর্ত্তী আয়তে বলা হইতেছে—"তাঁহারা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করিয়া থাকে"। এই ঈমানের হিসাবেই তাহাদিগকে মো'মেন বলা হইয়াছে।

৩৩৯ সাধুসজ্জনগণের লক্ষণ

এই আয়তে সাধুসজ্জনগণের পাঁচটী লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা :—

(১) আল্লার প্রতি তাহারা যথাযথভাবে ঈমান রাখিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ঈমানের দৃঢ়তা ও পূর্ণতাই হইতেছে সমস্ত সাধনার প্রধান অবলম্বন।

(২) তাহারা পরকালে বিশ্বাসী। পরকালে বিশ্বাস-অর্থে পরজীবনের কর্ম্মফলে বিশ্বাস। কর্ম্মফল বলিয়া কিছু না থাকিলে সৎ-অসৎ এবং পাপ-পুণ্য বলিয়া ধারণাগুলি দুনয়া হইতে উঠিয়া যাইবে।

(৩) তাহারা রজনীর নিশিথযামে লোকলোচনের অগোচরে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া আল্লার আয়তগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে। এই নিভৃত সাধনাকেই এছলামের পরিভাষায় 'তাহাজ্জোদ' বলা হয়।

(৪) কেবল নিজদিগকে লইয়াই তাহারা ব্যস্ত থাকে না। বরং সমাজের জনসাধারণকে তাহারা সঙ্গত কাজগুলি পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে এবং সমস্ত অসৎ ও অসঙ্গত কাজ হইতে তাহাদিগকে বারিত রাখার চেষ্টা পায়।

(৫) অন্যকে সৎকর্ম্ম করার আদেশ দিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইয়া বসে না। বরং সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রত্যেক সৎ ও মহৎকর্ম্মে অংশগ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। আমরা ওয়াজ করিব, আর উম্মীলোকেরা আমল করিবে, তাহাদের নীতি ইহা নহে।

৩৪০ সৎকর্ম্মের পুরস্কার সকলেই পাইবে

এখানে এই সন্দেহ হইতে পারিত যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা যে সব সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার কোন সুফল বা পুরস্কার তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহারা মুছলমান নহেন। এই সন্দেহ দূর করার জন্য এখানে স্পষ্ট করিয়া

বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহাদিগের সৎকর্ম্মগুলি আল্লার হুজুরে অস্বীকৃত হইবে না। অর্থাৎ নিজেদের সৎকর্ম্মের পুণ্যফল তাহারা নিশ্চয়ই লাভ করিবে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল আহলে-কেতাবদিগের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু কোরআনের শিক্ষা অনুসারে, আল্লার এই ন্যায়বিধান সকল মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

ان الله لا يضيع اجر المحسنين

"নিশ্চয় সৎকর্ম্মশীল লোকদিগের পুণ্যকর্ম্মগুলিকে আল্লাহ্ কখনই ব্যর্থ করিয়া দেন না" (তওবা ১২০ প্রভৃতি)। ছুরা জেল্‌জালে বলা হইতেছে :—

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره

মর্ম্মানুবাদ :—"মানুষ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র যে কোন সৎ বা অসৎকর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে তাহার ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।" হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে অমান্য করিবে যাহারা, তাহার দণ্ডও তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিতে হইবে।

৩৭১ অপব্যয়ের ব্যর্থতা

আহলে-কেতাবদিগের মধ্যকার অমান্যকারী ও ফাছেক যাহারা, ধনবলে ও জনবলে তাহারা যতই বলীয়ান হউক না কেন, আল্লার ন্যায়দণ্ড হইতে তাহারা কোন উপায়েই রক্ষা পাইতে পারে না। লোকে জমি চাষ করে, তাহাতে বীজবপন ও জলসেচন করে, অসময়ে ফসল পাওয়ার আশায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, হঠাৎ তুষারপাত হইয়া নিমিষের মধ্যে সমস্ত ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার ফলে কৃষকের যত্ন, আগ্রহ, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়। লাভ হওয়া'ত দূরে থাকুক, কৃষকের মূলধনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে এবং এছলামধর্ম্ম ও মুছলমানজাতিকে ধ্বংস করার জন্য মক্কা ও মদিনার কাফেরগণ যে অর্থব্যয় করিতেছে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে পণ্ডশ্রম ও ব্যর্থ-অপব্যয় মাত্র। ছুরা আন্‌ফালের ৩৬ আয়তে বলা হইতেছে :—

ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ' فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون -

"লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে বারিত করার জন্য কাফেরগণ নিজেদের ধনদওলৎ ব্যয় করিতে যাইতেছে ; অবিলম্বে তাহারা করিবেও তাহাই, কিন্তু অতঃপর ইহা তাহাদিগের জন্য মনস্তাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে—তাহারা পরাজিত হইয়া যাইবে।" এই ব্যর্থতার কথাই এখানে বলা হইতেছে।

৩৭২ অমুছলমানকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ

ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা ১২০ আয়ত হইতে স্পষ্টভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধের অব্যাহিতপূর্ব্বে মদীনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি মুছলমানদিগের পক্ষে যেরূপ বিপদ সঙ্কুল হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল, আয়তের তফছির করার সময় প্রথমে তাহা স্মরণ করিয়া লইতে হইবে। বদরযুদ্ধের পরাজয়ের পর, মক্কার কোরেশ-দলপতিরা আরবের সমস্ত পৌত্তলিক-গোত্রকে লইয়া মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আরবের সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর ও ধর্ম্মোন্মত্ত যোদ্ধা তাহাদের দলে যোগ দিয়াছে। মদিনা অঞ্চলের অকৃতজ্ঞ এহুদীজাতি নিজেদের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও দুষ্টপ্রতিভা লইয়া তাহাদের সঙ্গে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছে। মুছলমানের গৃহশত্রু কপট বা মোনাফেকগণ তাহাদের ভিতরের খবরগুলি শত্রুপক্ষকে জানাইয়া দিতেছে, তাহাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ আনিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায়, কোরেশদিগের আসন্ন আক্রমণের পূর্ব্বে, মুছলমানদিগকে আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা কোন অমুছলমানকে নিজেদের 'বেতানাঃ'রূপে গ্রহণ করিবে না। বেতানাঃ-শব্দের আভিধানিক অর্থ —বস্ত্রের ভিতরকার পিঠ, যাহা শরীরের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। বাহিরের পিঠকে 'জেহারা' বলা হয়।

و تستعار البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن امرك

নিজের আভ্যন্তরিন ব্যাপারগুলি অবগত করার জন্য যাহাকে তুমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও, তাহাকে ভাবার্থে বেতানাঃ বলা হয় (রাগেব)। ফলতঃ এখানে মুছলমানদিগকে নিষেধ করা হইতেছে, যেন তাহারা অমুছলমানদিগের মধ্যকার কাহাকেও এরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, যাহাতে জাতির ভিতরকার অবস্থা, গুপ্তমন্ত্রণা বা রাজনৈতিক রহস্যগুলি শত্রুপক্ষের লোকেরা অবগত হইয়া যাইতে পারে।

এখানে একটী তর্ক আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ১১৭ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত তিনটী আয়তে তাহাদের কতকগুলি বিশেষণও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল টীকাকার বলিতেছেন যে, এই বিশেষণ ও মানসিকতা সম্পন্ন যে সব অমুছলমান, আয়তে কেবল তাহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ফলতঃ এই নিষেধাজ্ঞা সকল অমুছলমানের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য নহে। পক্ষান্তরে আর একদল তফছিরকার বলিতেছেন যে, উল্লিখিত তিনটী আয়তে যে মনোভাবের কথা বলা হইয়াছে, মুছলমানদিগের প্রতি সেই শ্রেণীর মনোভাব সকল অমুছলমানই সাধারণভাবে পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞাটী তাহাদের সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে (জরির, কবির, আবদুহু প্রভৃতি)। এমাম এবনে-জরির ও মুফতী আবদুহু প্রমুখ বিখ্যাত তফছিরকারগণ প্রথমোক্ত মতের সমর্থন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত করিয়াছেন।

মন্ত্রগুপ্তি, আত্মরক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। এ সম্বন্ধে অবহেলা করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। মানুষ হিসাবে মুছলমান অমুছলমান সকলের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করা, সদ্ব্যবহার করা এবং সঙ্গতকার্য্যে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করা ও তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা, স্বতন্ত্র কথা। এই সদ্ভাব এবং পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা আদৌ নিষিদ্ধ নহে। কোরআনের

আয়তে (৬০ –৮, ৯), হজরতের জীবনচরিতে ও এছলামের ইতিহাসে ইহার অনেক নজির দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের সাধারণ মঙ্গলের জন্য হজরত, এহুদী প্রভৃতি অমুছলমানজাতিগুলির সহযোগিতায় মদিনায় সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিতেছেন, একটী বন্ধু-পৌত্তলিক গোত্রকে অত্যাচারীদের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য মুছলমান বাহিনী লইয়া মক্কা আক্রমণ করিতেছেন, হুনেন যুদ্ধের জন্য মক্কাবাসী পৌত্তলিকদিগের নিকট হইতে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সাহায্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন*—এইরূপ নজিরের আদৌ অভাব নাই। আবার ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে সব সময় সমস্ত মুছলমানকেও "ভিতরের রহস্য" জানিতে দেওয়া হইত না। ফলতঃ মন্ত্রগুপ্তির সহিত উদারতা-অনুদারতার কোন সম্বন্ধ নাই।

৩৪৩ **খাবাল**

খাবাল-শব্দের অনুবাদ করিয়াছি 'ক্ষতিসাধন" বলিয়া। কিন্তু ইহাতে শব্দের সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ পাইতেছে না। সাহিত্যিক পণ্ডিতরা বলেন—জীবদেহে উপনীত এমন একটা বিকার, যাহা তাহার মস্তিষ্কে সংক্রমিত হইয়া পড়ে, 'খাবাল' বলিতে সেই শ্রেণীর ক্ষতিকে বুঝাইয়া থাকে (রাগেব, আবছুহু)। এই তাৎপর্য্য অনুসারে আয়তের মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যে সব কার্য্য বা মন্ত্রণাদ্বারা মুছলমানের মস্তিষ্কে অর্থাৎ জ্ঞানে ও চিন্তায় বিকার উপস্থিত হইয়া যায়, অমুছলমানরা তাহার আশ্রয় লইয়া মুছলমান জাতির জ্ঞান বিভ্রম ঘটাইতে সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ক্রুটী করিবে না, সেই জন্য তাহাদের সংশ্রব সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বন্দুক তরবারীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও জাতির পুনরুত্থানের আশা থাকে। কিন্তু বিজাতীয় কাল্‌চারের কাছে পরাজয় স্বীকার ও আত্মসমর্পণের পর, তাহার ভবিষ্যতের আশা চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়। এই বিপদটা শোচনীয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে।

মুছলমানের প্রতি অমুছলমানদিগের বিদ্বেষ-ভাব তাহাদের কথা হইতে জানা যাইতেছে। কিন্তু মুছলমানকে ধ্বংস করার যে কঠোর সঙ্কল্প তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়া আছে, তাহা আরও গুরুতর। অতএব সে সম্বন্ধে সদা-সতর্কভাবে অবস্থান করাই মুছলমানের কর্ত্তব্য।

৩৪৪ **মুছলমান অমুছলমানে পার্থক্য**

আলোচ্য পদের পূর্ব্বে ও পরে, মুছলমানদিগের প্রতি অমুছলমান জাতি সমূহের সাধারণ মনোভাবের বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এখানে বলা হইতেছে—মুছলমানের ধর্ম্মগত প্রকৃতি এই যে, মুছলমান-অমুছলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তাহারা ভালবাসে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও মুক্তিকামনা করে। কোফ্‌র বা ধর্ম্মদ্রোহকে প্রীতির চক্ষে দর্শন

* মোস্তফা-চরিত ৭২৬।

করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু পাপকে অপছন্দ করা আর পাপীকে ঘৃণা করা, এক কথা নহে। রোগকে আমরা অপছন্দ করি। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য তাহাকে ঘৃণা বা বিদ্বেষভরে দূরে তাড়াইয়া দেই না। বরং রোগ যতই প্রবল ও ভয়ঙ্কর হয়, রোগীর প্রতি আমাদের দরদ ও সেবার ভাবও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ঠিক এই ভাবে, আল্লার বান্দাদিগের মনের ও আত্মার রোগ যতই প্রবল ও যতই কদর্য্য হউক না কেন, সমস্ত হৃদয়ের প্রেম ও সহানুভূতি দিয়া তাহার সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করাই মুছলমানের সহজাত প্রকৃতি। এমাম এবনে-জরির প্রভৃতি তফছিরকারগণও এই তাৎপর্য্যকে আয়তের একমাত্র সঙ্গত তাৎপর্য্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (জরির, মনছুর, আবহুহু)।

সরল ও অকপট প্রেম-প্রবণ-প্রকৃতি, বস্তুতই মোছলেম জাতীয় জীবনের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তাহা সম্পূর্ণতঃ এছলামেরই শিক্ষা প্রসূত। এখানে মুছলমানকে শুধু সাবধান থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেন এই সরলতার সুযোগ লইয়া অন্য ধর্ম্মের লোকেরা তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া না ফেলে। নিজের প্রকৃতি বদলাইয়া প্রতিপক্ষের মত হীন মনোবৃত্তির আশ্রয় লইতে আদেশ দেওয়া হয় নাই।

৩৪৫ **অকারণ শক্রতা**

মুছলমানের প্রতি অমুছলমানদিগের এই যে হিংসা-বিদ্বেষ ; ইহার সঙ্গত কারণ কিছুই নাই। আরবের পৌত্তলিক, এহুদী ও খৃষ্টান জাতি ধর্ম্মবিশ্বাসের ও রাজনৈতিক স্বার্থের হিসাবে পরস্পরে প্রাণে বৈরী, অথচ মুছলমানের বিরুদ্ধাচরণ করার সময় তাহারা অভিন্ন। অন্যদিকে আল্লার বান্দা বলিয়া মুছলমান তাহাদিগকে ভালবাসে, সাধারণতন্ত্র গঠন করে তাহাদের সকলকে লইয়া, সকলকে সমান স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়া। সকলের পয়গম্বর ও কেতাবকে তাহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করে—কিন্তু অমুছলমানরা তবুও মুছলমানকে বিষচক্ষে দর্শন করে।

৩৪৬ **আঙ্গুল কামড়ান**

অত্যন্ত রাগ হইলে, অথবা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারায় অভিমানে মন অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলে, মানুষ অনেক সময় নিজের ঠোঁট বা হাতের আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে। ভাবার্থে, ইহাদ্বারা প্রতিপক্ষের হিংসা ও ক্রোধের চরম অবস্থাকে বোঝান হইতেছে। কিন্তু এই মনোভাব তাহাদের নিজেদের পক্ষে একটা ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র। এই হিংসার আগুণে তাহারা নিজেরাই পুড়িয়া মরিবে, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাদের অই অকারণ হিংসাবিদ্বেষ কখনই চরিতার্থ হইবে না।

৩৪৭ **অন্তরের গুপ্তরহস্য**

পূর্ব্ব আয়তের শেষভাগে আল্লাহ্‌কে অন্তর্যামী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্তর্যামী-আল্লাহ এখানে এছলাম-বৈরীদিগের অন্তরের গুপ্তরহস্যটী ব্যক্ত করিয়া দিতেছেন। কল্যাণ যদি

মুছলমানকে স্পর্শও করিয়া যায়—অর্থাৎ, কোন দিক দিয়া মুছলমানের যদি সামান্য একটু ভাল হয়, তাহাদের পক্ষে সেটুকুও অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুছলমানের কোন গুরুতর বিপদ ঘটিলে, তাহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। এছলাম-বৈরীদিগের এই ভীষণ শত্রুতার মধ্যে পরিবেষ্টিত মুছলমানকে অভয় দিয়া আয়তের শেষে বলা হইতেছে যে, তোমরা যদি বিপদের বিভীষিকায় ধৈর্য্যহীন হইয়া না পড়, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে যদি আত্মসংযম করিয়া চলিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে শত্রুদিগের এই হিংসা-বিদ্বেষে তোমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষতি একটুও হইবে না। আল্লার দৃষ্টি ও শক্তি তাহাদের দুরভিসন্ধি ও অপকর্ম্মগুলিকে সকল দিক দিয়া ব্যাপ্ত করিয়া আছে। তিনি যথাসময়ে সেগুলিকে ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন। ইহার পরেই 'ওহোদ'যুদ্ধের বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে। এই সব উপদেশ ও আদেশ-নির্দ্দেশের অনেক তথ্য এই প্রসঙ্গে জানিতে পারা যাইবে।

১৩ রুকু'

১২০ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১২০ এবং সেই সময়, যখন তুমি প্রত্যুষে নিজ-পরিবার হইতে বহির্গত হইয়া, মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করিতেছিলে[৩৪৮];—আর আল্লাহ্ (ছিলেন) সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞাতা ;—

১২১ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا لا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১২১ —যখন, তোমাদিগের মধ্যকার দুইটী দল ভীরুতা প্রকাশের পরিকল্পনা করিতেছিল—অথচ তাহাদের সহায় ছিলেন আল্লাহ্; বস্তুতঃ কেবল আল্লার উপর নির্ভর করাই'ত মো'মেনদিগের কর্ত্তব্য[৩৪৯]।

১২২ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২২ এবং অবস্থা এই যে (এই ঘটনার পূর্ব্বে) বদরের সমরক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন — অথচ তখন তোমরা ছিলে (সংখ্যা ও রণ-সম্ভারের হিসাবে) অতি হীন[৩৫০], অতএব আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিও, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতে পারিবে।

১২৩ সেই সময়, যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে ঃ— তিন হাজার ফেরেশ্‌তা নাজেল করিয়া আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে, তোমাদের পক্ষে তাহা কি যথেষ্ট হইবে না? [৩৩১]

١٢٣ اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الاف من الملئكة منزلين ۖ

১২৪ নিশ্চয়ই, তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযত হইয়া চল, আর তাহারা যদি তোমাদিগের উপর আপতিত হয় নিজেদের এই সমস্ত বিক্রম ও উদ্দীপনা সহকারে (সে অবস্থায়) আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন, পাঁচ হাজার আক্রমণকারী ফেরেশ্‌তাদিগের দ্বারা! [৩৩২]

١٢٤ بلى ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملئكة مسومين ۝

১২৫ এবং আল্লাহ্ ইহা (প্রকাশ) করিলেন — তোমাদের জন্য কেবল আনন্দ-সংবাদরূপে এবং (কেবল এই জন্য যে) তোমাদিগের অন্তরগুলি ইহাদ্বারা যেন নিরুদ্বেগ হইতে পারে; বস্তুতঃ জয়'ত (আসিয়া থাকে) একমাত্র প্রবল-প্রজ্ঞাময় আল্লার হুজুর হইতে,— [৩৩৪]

١٢٥ وما جعله الله الا بشرى لكم و لتطمئن قلوبكم به ۚ و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ۙ

১২৬ — যেমতে অমান্যকারীদিগের অংশবিশেষকে তিনি বিনষ্ট করিয়া দিবেন, অথবা এমনভাবে তাহাদিগকে খর্ব্ব করিয়া দিবেন যাহাতে তাহারা ফিরিয়া যাইবে ব্যর্থ-মনোরথ অবস্থায়।	١٢٦ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ ◎
১২৭ এ ব্যাপারে কোন অধিকারই তোমার নাই[৩৫৫]—তিনি তাহাদিগের তওবা কবুল করুন, অথবা তাহাদিগকে শাস্তিদান করুন — যেহেতু তাহারা অত্যাচারী।	١٢٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ◎
১২৮ এবং স্বর্গস্থ সবকিছু ও ভূমণ্ডলস্থ সবকিছু আল্লারই অধিকারভুক্ত; যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাহাকে ইচ্ছা শাস্তিদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন—ক্ষমাশীল-করুণানিধান।	١٢٨ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ◎

টীকা:—

৩৪৮ **ওহোদ যুদ্ধের শিক্ষা**

পূর্ব্ব রুকু'র ১১৭ আয়তে এক শ্রেণীর অমুছলমানকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। রুকু'র শেষ আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযত হইয়া চল, তাহা হইলে বিধর্ম্মীদিগের দুরভিসন্ধি

তোমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করার ফলে ওহোদ যুদ্ধে মুছলমানদিগকে যে শোচনীয় দুর্দ্দশায় উপনীত হইতে হইয়াছিল, রুকু'র প্রথম ও দ্বিতীয় আয়তে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু বদর যুদ্ধের সময় লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়া মুছলমানদিগের অবস্থা হীনতর ছিল। তবু তাহারা বিরাট শত্রুবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। কারণ, এই ওহোদ যুদ্ধের ক্রটী ও দুর্ব্বলতাগুলি তখন মুছলমানদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১২২ আয়তে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিন সহস্র সুসজ্জিত পদাতিক ও অশ্বসাদী দুর্দ্ধর্ষ ও ধর্ম্মোন্মত্ত আরববীরকে লইয়া কোরেশদলপতিরা মদিনা আক্রমণের জন্য অদূরবর্ত্তী ওহোদ পর্ব্বতপ্রান্তরে উপস্থিত। সাধারণ-তন্ত্রের পরামর্শ সভায় অধিকাংশের মতানুসারে স্থির হইল যে, নগরের বাহিরে গিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে। কপটদলের সর্দ্দার আবদুল্লা-এবনে-ওবাই বাহ্যতঃ মুছলমান-রূপেই নিজেকেই প্রকাশ করিত। মুছলমানদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিয়া সেও নগরের বাহিরে যাওয়ার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তরুণ যুবকদিগের প্রস্তাবের অনুকূলে অধিক ভোট হওয়ায়, হজরত বাহিরে যাওয়ার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

মাত্র এক হাজার সঙ্গী লইয়া হজরত ওহোদ অভিমুখে যাত্রা করেন। আবদুল্লা-এবনে-ওবাইও সঙ্গে ছিল। কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হওয়ার পর সে নিজের ৩ শত সৈন্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া গেল। কাহারও কাহারও মতে ওহোদ যুদ্ধের প্রথম ক্রটী এইখানে। আবদুল্লা প্রথম হইতে মুছলমানদিগের সঙ্গে যোগ না দিলে ততটা ক্ষতির কারণ ঘটিত না। কিন্তু সে ইচ্ছা করিয়াই এক সঙ্গে যাত্রা করিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গেল। ইহার ফলে অবশিষ্ট মুছলমানদিগের মনে একটা দুর্ব্বলতার ভাব আসিয়া পড়া বিচিত্র ছিল না।

ওহোদ যুদ্ধের দিন প্রত্যুষে গৃহ হইতে বাহির হইয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সেনাপতি-রূপে ময়দানে উপস্থিত হইলেন। নিজের ৭ শত সঙ্গীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া কএকটা ব্যূহ রচনা করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিলেন। মুছলমান-দিগের পশ্চাৎ দিকের পর্ব্বতমালার মধ্যে একটী গিরিপথ ছিল। হজরত রছুলে করিম ৫০ জন অভিজ্ঞ তীরন্দাজ সৈন্যকে সেই গিরিপথের দ্বারদেশে বসাইয়া দিলেন। আবদুল্লা-এবনে-জোবের ইঁহাদিগের সেনাপতিরূপে নিয়োজিত হইলেন। 'হজরত ইঁহাদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া বলিয়া দিলেন—তোমরা কোন অবস্থায় নিজেদের স্থান ত্যাগ করিও না। যখনই দেখিবে যে, শত্রুসৈন্য গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তখনই তাহাদের উপর তীর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিও। জয় হউক, পরাজয় হউক, আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করিও না। সাবধান, কোনক্রমেই যেন ইহার অন্যথা না হয়!'

ইহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মুছলমানরা সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কোরেশপক্ষ বিশৃঙ্খলার সহিত পলায়ন করিতে লাগিল। তীরন্দাজ সৈন্যগণ এই আশাতীত জয়ের উল্লাসে আত্মহারা হইয়া

হজরতের আদেশ ও আমীরের নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া আসিলেন। মাত্র দশজন তীরন্দাজ সেনাপতির সঙ্গে থাকিয়া গেলেন। খালেদ-এবনে-অলীদ দুইশত নির্ব্বাচিত অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। গিরিপথকে অরক্ষিত দেখিয়া তিনি অবিলম্বে নিজের সৈন্য লইয়া সেই পথ দিয়া বিক্ষিপ্ত মুছলমানদিগের উপর তাহাদের পশ্চাৎদিক হইতে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াদিলেন। ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত বিপদ এই আক্রমণের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। তীরন্দাজ সৈন্যরা এখানে যথোচিতভাবে ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং ইহাই তাঁহাদের সমস্ত বিপদের মূল কারণ।

ওহোদ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হজরতের জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এছলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে মছজিদের এমাম ও ময়দানের সেনাপতি অভিন্ন। মহানবী মোস্তাফাকে এখানে আমরা একজন সুদক্ষ ও বহুদর্শী বীর সেনাপতিরূপে দেখিতে পাইতেছি।

আলোচ্য আয়তের প্রথম ভাগে জানা যাইতেছে যে, হজরত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বহির্গত হইয়াছিলেন—নিজ 'আহ্‌লের' নিকট হইতে। আহ্‌ল শব্দের মূল অর্থ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি, স্ত্রীকেও ভাবার্থে আহ্‌ল বলা হয় (রাগেব)। বর্ত্তমান ব্যবহার অনুসারে বাঙ্গলার 'পরিবার' এখানে উহার ঠিক প্রতিশব্দ। মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশা এই যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য মহিলাদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আহত গাজীদিগের সেবা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসে ও বোখারীর হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আহ্‌ল বা পরিবার বলিতে এখানে বিবি আয়েশাকেই বুঝাইতেছে।

৩৪৯ দুইটী দলের দুর্ব্বলতা

জাবেরের একটী বর্ণনায় জানা যায় যে, এখানে "দুইটী দল" বলিতে বানিহারেছা ও বানিছালমা নামক দুই গোত্রের লোকদিগকে বুঝাইতেছে (বোখারী, মোছলেম)। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় পাঁচগুণ শত্রু-সৈন্যের মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া কাহার কাহার মনে দুর্ব্বলতার ভাব আসিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা ছিল তাঁহাদের মনের একটা অস্থায়ী ভাব। যেমনই তাঁহাদের মনে হইল যে, জয় পরাজয়ের প্রকৃত মালেক যিনি, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই'ত মুছলমানের সহায়, তাঁহাদের মনের দুর্ব্বলতাটুকু তখনই দূর হইয়া গেল। ওহোদযুদ্ধে আনছারগণ যে-ধৈর্য্য, সাহস ও ঈমানের পরিচয় দিয়াছিলেন, দুনয়ার ইতিহাসে তাহা বস্তুতই অনুপম।

আয়তের শেষভাগে সকল অবস্থার সাধারণ নীতি হিসাবে বলা হইতেছে যে, আল্লার প্রতি আস্থাবান মোমেন-সমাজ কখনই নিজেদের সংখ্যার প্রতি, অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি বা ধনসম্পদের উপর নির্ভর করিবে না—সমস্ত সাধনায় ও সমস্ত সংগ্রামে তাহারা নির্ভর করিবে একমাত্র আল্লার উপর। সুতরাং জনবল বা অস্ত্রবল কম হওয়ার জন্য অবসন্ন হইয়া পড়া, মোমেন সমাজের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইবে না।

এখানে বিশেষরূপে জানিয়া রাখা উচিত যে, 'তাওয়াক্কোল্' শব্দের যে অর্থ আজকালকার মুছলমান সমাজ সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা একেবারেই সঙ্গত নহে। কোর-আনের 'তাওয়াক্কোল' কর্ম্মবিমুখ কাপুরুষের আলস্য ও অবসাদের সমর্থন কখনই করে না। কোরআনে 'তাওয়াক্কোল'-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে عزم ও صبر বা সঙ্কল্প ও ধৈর্য্যধারণের আদেশ প্রায় সর্ব্বত্রই দেওয়া হইয়াছে। এই ছুরার ১৫৮ আয়তে বলা হইতেছে—

فاذا عزمت فتوكل على الله

"অতঃপর নিজের সঙ্কল্প স্থির করিয়া লওয়ার পর তুমি আল্লার উপর তাওয়াক্কোল (নির্ভর) করিবে।" অন্যত্র বলা হইতেছে—

نعم اجر العاملين - الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

কর্ম্মনিরতদিগের পুরস্কার কতই না সুন্দর—যাহারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং নিজেদের প্রভুর উপর নির্ভর করিয়া থাকে (২৯—৫৮)। কর্ম্মের জন্যই সঙ্কল্পের দরকার হয় এবং কর্ম্মের পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া ধৈর্য্যধারণের আবশ্যক হইয়া থাকে। শেষোক্ত আয়ত হইতে বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে।

৩৫০ বদর যুদ্ধের অবস্থা

মক্কাবাসীরা সহস্রাধিক সুসজ্জিত পদাতিক ও অশ্বসাদী দুর্দ্ধর্ষ আরবকে সঙ্গে লইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে আসে। মদীনা হইতে তিন মন্‌জিল দূরে 'বদর' নামক স্থানে মুছলমানদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বদর যুদ্ধে মুছলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের দিক দিয়া তাঁহাদের অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়। এ অবস্থাতেও আল্লাহ মুছলমানকে বিজয়ী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে এই মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মুছলমান কোরেশ-শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বদর যুদ্ধের এই শিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও লোকসংখ্যা কম আছে বলিয়া পরাজয়ের আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়ার কারণ'ত তোমাদের কিছুই ছিল না। বদর যুদ্ধে যে-আল্লাহ তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার উপর নির্ভর করিয়া যাওয়াই এক্ষেত্রেও তোমাদের পক্ষে উচিত ছিল।

৩৫১ 'সে সময়'

রুকুর প্রথম দুই আয়তে ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে, ১২৩ আয়তের 'সেই সময়' তাহারই সংলগ্ন। অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধের সময় যখন তুমি স্বীয় পরিবারের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছিলে, যখন তোমাদিগের মধ্যকার দুইটী দল ভীরুতা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং যখন তুমি মোমেনদিগকে বলিতেছিলে......ইত্যাদি। অধিকাংশ তফছিরকার এই আয়তটীকে বদর যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বটে (কবির), কিন্তু রুকুর

বর্ণনা ধরার প্রতি মনোনিবেশ করিলে এই মতকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা ব্যতীত আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে তিন হাজার ফেরেশতা নাজেল করার কথা বলা হইয়াছে। অথচ বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে এক হাজার ফেরেশতাদ্বারা সাহায্য করার কথা অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে (আনফাল, ৯ম আয়ত)।

৩৫২ তিন হাজার ফেরেশতা

বদর যুদ্ধে কোরেশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সেখানে এক হাজার ফেরেশতা পাঠাইয়া মুছলমানদিগকে সাহায্য করার কথা বলা হইয়াছে (৮—৯)। ওহোদ যুদ্ধে তিন হাজার শত্রু সৈন্য মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এখানে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাইবার কথা বলা হইতেছে। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, ইহা হজরতের উক্তি। হজরত মো'মেনদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—আল্লার অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর কর, শত্রুদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ভীত হইও না। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শত্রুর মোকাবেলায় এক একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

৩৫৩ পাঁচ হাজার ফেরেশতা

হজরত রছুলে করিমের পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাবাণীর সমর্থন করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন—আমার রছুল তোমাদিগকে ফেরেশতাদিগের দ্বারা যে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিতেছেন, তাহা খুবই সত্য। যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক এবং পৃথিবীর কোন প্রলোভন যদি তোমাদিগের মনের সংযমকে ব্যাহত করিতে না পারে, তাহা হইলে, তিন হাজার কেন, পাঁচ হাজার ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। একটু মনোযোগ দিয়া আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এই রুকুর আয়তগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বদর ও ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরবর্ত্তী সময়ে। সুতরাং এই পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি যে বদর বা ওহোদ যুদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত হয় নাই, তাহা স্থির নিশ্চিত। বস্তুতঃ ইহা ভবিষ্যতের জন্য একটা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি। আল্লার নামে, আল্লার হইয়া এবং আল্লার উপর নির্ভর করিয়া, মুছলমান যখনই আল্লার ধর্ম্মের ও তাঁহার প্রিয় রছুলের উম্মতের মঙ্গলের জন্য নিজকে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ময়দানে আসিবে—তখনই তাহাদের সাহায্যের জন্য আল্লার ফেরেশতারা নামিয়া আসিবেন। এখানে "পাঁচ হাজার" বলিতে ঠিক কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝাইতেছে না। উহার তাৎপর্য্য—বহু, আশাতীত।

ফেরেশতার সাহায্য

ফেরেশতারা কোন যুদ্ধে বস্তুতঃ মুছলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন কি না, করিয়া থাকিলে সে সাহায্যের স্বরূপ কি?—এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে তফছিরকারগণ এত মতভেদ করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব। কএকটা মতের সার নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি:—

(১) বদর যুদ্ধে কাফেরগণ من فورهم সমাগত হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে ফেরেশতা-দিগের দ্বারা সাহায্য করা হয় নাই।

(২) বদর যুদ্ধে মুছলমানরা (১২৪ আয়তের বর্ণনা অনুসারে) ধৈর্য্যধারণ ও সংযম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৩) আহজাব যুদ্ধের পূর্ব্বকার কোন যুদ্ধেই মুছলমানরা যথাযথ ধৈর্য্য বা সংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই, অতএব ফেরেশতাদের সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ফেরেশতাদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, বানি-কোরায়জার দুর্গ আক্রমনের সময়।

(৪) ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ওহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু, মুছলমানরা যদি ধৈর্য্যধারণ ও সংযম অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় ফেরেশ্‌তাদের সাহায্য পাইবে—এই ছিল প্রতিশ্রুতির সর্ত্ত। কিন্তু যেহেতু ওহোদ-যুদ্ধে তাহারা এই সর্ত্ত পালন করে নাই, অতএব ফেরেশ্‌তাদের সাহায্যলাভও করিতে পারে নাই।

(৫) এই শ্রেণীর মতভেদগুলির উল্লেখ করিয়া এমাম এবনে-জরির বলিতেছেন :— মুছলমানরা যে বস্তুতঃ ফেরেশ্‌তাদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, কোরআনে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে ঐরূপ সাহায্য পান নাই, তাহারও কোন প্রমাণ কোরআনে পাওয়া যায় না। কোন ছহি হাদিছে ইহার মধ্যকার কোন মতেরই কোন সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এগুলির মধ্যে কোন মতের সমর্থন বা প্রতিবাদ করা চলে না (এবনে-জরির ৪—৫০—৫৩)।

(৬) ফেরেশ্‌তারা সাহায্য করিয়াছিলেন—পাগড়ী বাঁধিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, মানুষরূপে কাফেরদিগের সহিত প্রবলভাবে যুদ্ধ করিয়া। খুঁটিনাটি বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যেও আবার বহু মতভেদ আছে (কবির ৩—৬৫)।

(৭) এমাম আবু-বাক্‌রল্‌-আছম এই মতের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমাম ছাহেব নানারূপ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়া এই মতবাদের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

(ক) একজন ফেরেশতাও, তোমাদের কথামত, সমস্ত দুনয়াকে 'গারৎ' করিয়া দিতে সমর্থ। বিশেষতঃ জিব্রাইল, মিকাইলের মত ফেরেশতারা যখন ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন মুষ্টিমেয় আরব-বদ্দুদিগকে পরাজিত করার জন্য হাজার হাজার ফেরেশতার বাহিনী পাঠাইবার দরকার কি ছিল ?

(খ) কোরেশদিগের নায়ক ও প্রধান বীরগণ সকলেই মুছলমানদিগের সুপরিচিত। তাহাদের কাহার সহিত কোন্ মুছলমানের যুদ্ধ হইল, কোরেশদিগের কোন্ দলপতি বা কোন্

বীর-যোদ্ধা কোন্ মুছলমানের হাতে নিহত হইল, ইহাও সম্পূর্ণভাবে বিদিত। ফলতঃ কোরেশ-দলপতিদিগকে এবং তাহাদের প্রধান প্রধান বীরপুরুষদিগকে'ত মুছলমানরাই নিহত করিল। সুতরাং হাজার হাজার ফেরেশতা আসিয়া করিলেন কি ?

(গ) ফেরেশতারা যখন মুছলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, সে সময় লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল কি না ? যদি দেখিতে পাইতে থাকে, তাহা হইলে ফেরেশ্তারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন মানুষরূপে না অন্য কোন আকারে ? যদি মানুষরূপে হয়, তাহা হইলে তিন হাজার ফেরেশতা মিলাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মুছলমানদিগের সংখ্যা চারি হাজার দেখাইতেছিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ এরূপ কথা কেহ বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা কোরআনের (و يقللكم فى اعينهم) আয়তের বিপরীত। আর ফেরেশতারা যদি অন্য কোন আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে একটা অসাধারণ বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, ফেরেশতারা মানুষের অগোচরভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, যুদ্ধের সময় এই অজ্ঞাত অদৃশ্য যোদ্ধাদিগের আক্রমণে যখন শত্রু-সৈন্যদের মাথা কাটিয়া যাইতেছিল, পেট ফাটিয়া নাড়ীভূড়ি বাহির হইতেছিল, আহত কাফের সৈন্য ঘোড়ার পিঠ হইতে ভূপতিত হইতেছিল—তখন সেই অপরূপ আজগৈবী ব্যাপারের কথা সকলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিত, সহস্র মুখে তাহা দেশময় রাষ্ট্র হইত এবং বস্তুতই তাহা এছলামের একটা শ্রেষ্ঠতম মোযেজা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এ সমস্তের কিছুই হয় নাই, সুতরাং এই অভিমতটী সঙ্গত নহে।

(ঘ) যে সব ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্থূলদেহী ছিলেন না স্বচ্ছদেহী ? প্রথম অবস্থায় সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বস্তুতঃ পান নাই। আর যদি তাঁহারা স্বচ্ছদেহী হন, তাহা হইলে, তাঁহাদের অশ্বারোহণের সঙ্গতি বা সার্থকতা কি থাকিতে পারে ?

এমাম রাজী এই সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, বা দিতে না পারিয়া, সাধারণ কাঠ-মোল্লাদের মত রাগ করিয়া বলিতেছেন—যাহারা কোরআনে ও নবুয়তে বিশ্বাসবান নহে, এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা কেবল তাহাদের পক্ষে শোভা পায়……ইত্যাদি (কবির ৩—৬৬)।

(৮) ফেরেশতাদিগের কর্ম্মের সংশ্রব হয় আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে। তাঁহারা আসিয়া মুছলমানদিগের অন্তরে তাওহীদের দৃঢ়তা ও ঈমানের প্রেরণাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন (কবির ও আবদুহু)।

আমাদের বিবেচনায় ইহাই সঙ্গত অভিমত। ছুরা আন্ফালের ১২ আয়তে, বদর যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :—

اذ يوحى ربك الى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا -

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদিগকে প্রত্যাদেশ করিতেছিলেন যে—আমি তোমাদিগের সঙ্গে

আছি, অতএব মুছলমানদিগকে মজবুৎ করিয়া রাখ।" এই আয়তের তাৎপর্য্যে এমাম এবনে জরির বলিতেছেন—

يقول -- قووا عزمهم و صححوا نياتهم فى قتال عدوهم

মজবুৎ করিয়া রাখ—অর্থে "তাহাদিগের সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় এবং তাহাদিগের নিয়ৎকে সুসঙ্গত করিয়া রাখ।"

৩৫৪ প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য্য

এই আয়ৎ হইতেও অষ্টম দফার অভিমতের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। এখানে বলা হইতেছে যে, ফেরেশতা পাঠাইবার (অথবা ফেরেশতা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার) উদ্দেশ্য, যেন তাহাদের সহায়তায় তোমাদের অন্তরের অবসাদ কাটিয়া যায়, তোমাদের মন যেন নিরুদ্বেগ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, জয়ের মালেক তোমরাও নহ, ফেরেশতারাও নহে। বরং তাহার একমাত্র মালেক হইতেছেন—প্রবল ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লার বিভিন্ন গুণবাচক বিশেষণ বা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই ঐ ব্যবহারের বিশেষ একটা সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে। এখানে বলা হইতেছে যে, জয়ের মালেক যে-আল্লাহ, তিনি হইতেছেন একাধারে প্রবল ও প্রজ্ঞাময় উভয়ই। প্রবল—অর্থাৎ, তিনি কাহাকে জয়যুক্ত করিতে চাহিলে, সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করার অপ্রতিহত শক্তি তাঁহার আছে, কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে ব্যাহত করিতে পারে না। যুগপৎভাবে তিনি হাকিম বা প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ—এইরূপে কাহাকে জয়যুক্ত করিতে চাওয়া বা জয়যুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার কোন একটা অন্ধনিয়মের বা অহেতুক খেয়ালের পরিণাম ফল কখনই নহে। বরং বস্তুতঃ ইহা হইতেছে তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রসূত। নিজের সর্ব্বব্যাপী অনন্ত প্রজ্ঞা অনুসারে যে বা যাহারা জয়যুক্ত হওয়ার উপযোগী ও অধিকারী, তাহাদিগকেই তিনি জয়যুক্ত করিয়া দেন।

১২৬ আয়তে এই জয়-পরাজয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কোফর বিধ্বস্ত হউক, তাহার বাহকগণ শক্তি-সামর্থ্যহীন হইয়া পড়ুক, মুছলমানদিগকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্য ইহাই। মুছলমানের জয়ে এই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জয়যুক্ত করার কারণ বা সার্থকতা কিছুই থাকে না।

৩৫৫ তওবা কবুল করা

এই আয়তটীর শানে-নজুল বা allusion সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এবনে-ওমরের এক দফা বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ওহোদ যুদ্ধে আহত হওয়ার পর হজরত রছুলে করিম আবু-ছুফয়ান প্রমুখ চারিজন কোরেশ-প্রধান সম্বন্ধে 'লা'নৎ ও বদ্-দোওয়া' করিতে থাকেন। এই সময় হজরতকে ঐরূপ বদ্-দোওয়া করিতে নিষেধ

করিয়া এই আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল (আহমদ, বোখারী, তিরমিজী, নাছাই—মনছুর)। এমাম আহমদের রেওয়ায়তে “ قال سمعت رسول الله صلعم يقول অর্থাৎ, এবনে ওমর বলেন, আমি শুনিয়াছিলাম, হজরত বলিতেছেন” এইরূপ স্পষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

এবনে-আব্বাছ ও আবু-হোরায়রার বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, এই আয়তটী, ওহোদ যুদ্ধ শেষ হইবার কয়েক মাস পরে, বীর-মউনার শোচনীয় দুর্ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়। এই সময় কয়েকটী কোরেশ গোত্র ধর্ম্মশিক্ষার অজুহাতে ৭০ জন কোরআনের হাফেজকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় এবং বীর-মউনা নামক স্থানে তাঁহাদের সকলকে শহীদ করিয়া ফেলে। এই দুর্ঘটনায় হজরত যাহার পর নাই শোকান্বিত হইয়া পড়েন এবং একমাস ধরিয়া রে'ল, জক্ওয়ান, ওছাইয়া ও বানি-লেহয়ান. গোত্র চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে নামাজে বদ্দোওয়া বা লা'নৎ করিতে থাকেন। বোখারী ও তিরমিজীর বর্ণিত, স্বয়ং এবনে-ওমরের আর এক হাদিছে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, নামাজের এই বদ্দোওয়ার পর আলোচ্য আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এখানে প্রথমে দেখা যাইতেছে যে, এবনে ওমরের দুইটী বর্ণনার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। একটীতে বলা হইতেছে যে, ওহোদ যুদ্ধের কএক মাস পরে বীর-মাউনার ঘটনা উপলক্ষে আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পর, এবনে-আব্বাছ ও আবু-হোরায়রার বর্ণনা হইতেও এবনে ওমরের প্রথম রেওয়ায়তটীর প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কথা এই যে, ওহোদ যুদ্ধের সময় এবনে-ওমর ১২।১৩ বৎসরের একটী বালক মাত্র। “এই জন্য তিনি ওহোদ যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন।” সমস্ত রেজাল পুস্তকে ইহা সমবেত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এবনে ওমর ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত হন নাই (এছাবা, এস্তীআব)। সুতরাং ওহোদক্ষেত্রে বর্ণিত হজরতের কোন কথা শুনিবার সুযোগ তাঁহার নিশ্চয়ই ঘটে নাই।

বীর-মাউনার ঘটনার সাক্ষ্য সম্বন্ধেও অবস্থা এইরূপ। এবনে আব্বাছ তখন ৪।৫ বৎসরের শিশু মাত্র। তিনি পিতার সঙ্গে হেজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন, মক্কাবিজয়ের অল্প পূর্ব্বে, সুতরাং বীরমাউনার ঘটনার কএক বৎসর পরে। আবুহোরায়রার অবস্থাও এইরূপ। ওহোদ ও বীরমাউনার ঘটনার দীর্ঘকাল পরে (খয়বর বিজয়ের পর) তিনি মদীনায় আসেন ও এছলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা যে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

হজরত ওহোদ যুদ্ধে কি বলিয়াছিলেন বা কি করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীদিগের মুখে তাহার স্পষ্ট বর্ণনা জানা যাইতেছে। হজরতের খাদেম আনছ ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন (এছাবা, একমাল প্রভৃতি)। তিনি বলিতেছেন :—ওহোদ যুদ্ধের দিন হজরতের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় এবং মাথায় আঘাত লাগিয়া তাহা হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। হজরত তখন মুখের রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন—

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم الى ربهم - فانزل الله ليس لك من الامر شيء الاية -

যে জাতি নিজেদের নবীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে, তাহারা সফলতা লাভ করিবে কিরূপে, অথচ সে নবী তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহাদের প্রভুর পানে। তখন এই আয়তটী অবতীর্ণ হয় (আহমদ, বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী, নাছাই—মনছুর)। আবদুল্লাহ নামক আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীর বর্ণনায় প্রকৃত ঘটনাটী আরও স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন:—

كانى انظر الى رسول الله صلعم يحكى نبيا من الانبياء ضربه قومه و هو يمسح الدم عن وجهه و يقول — رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون -

আমি এখনও যেন দেখিতেছি, হজরত স্বজাতি কর্ত্তৃক আহত জনৈক নবীর উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছিলেন, আর নিজের মুখের রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন—প্রভুহে! আমার জাতিকে ক্ষমা করিয়া দাও! কারণ, তাহারা জানে না (মোছলেম ২—১০৮)।

এক সঙ্গে এই দুইটী বিবরণের আলোচনা করিয়া দেখিলে, নিঃসন্দেহরূপে জানা যইবে যে, নিজের আঘাত বা কষ্টের জন্য মোস্তাফাহৃদয়ে কোন প্রকার ক্রোধ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই এবং সেজন্য তিনি শত্রুপক্ষের প্রতি লা'নৎ বা অভিসম্পাতও করেন নাই। বরং তাহাদের হঠকারিতা ও অনাচারের শোচনীয়তা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মঙ্গল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার মনে নিরাশার সৃষ্টি হইতেছিল। মহানবী মোস্তাফা এই আততায়ীদিগকে তখনও পর বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। এই সব অত্যাচারের জন্য তাহারা আল্লার কঠোর দণ্ডভাগী হইতে পারে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু তাহাদের জাতীয় জীবনকে সকল দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহা'ত সার্থক হইতে পারিবে না। ফলতঃ এই অত্যাচারী, আততায়ী ও প্রাণের বৈরীদিগের ক্ষতির আশঙ্কাতেই তিনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাই সেই আঘাত-জর্জ্জরিত অবস্থায়, রক্তরঞ্জিত করযুগল প্রসারিত করিয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছিলেন—প্রভুহে! আমাকে না জানিয়া, না বুঝিয়াই তাহারা এই অত্যাচার করিয়াছে। অতএব আমার এই জাতিকে, তোমার এই অবুঝ বান্দাদিগকে, তুমি ক্ষমা কর!

এই প্রার্থনার উত্তরে আলোচ্য আয়তে বলা হইতেছে—তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করে, তবেই তাহারা ক্ষমা লাভ করিতে পারে। অন্যথায় অত্যাচারীকে নিজের অপকর্ম্মের অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাই আমার অলঙ্ঘ্য ন্যায়-বিধান, তোমার প্রার্থনায় এই বিধানের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না।

১৪ রুকু'

১২৯ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝
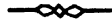
১২৯ হে মোমেনগণ ! তোমরা স্থদ খাইও না—দ্বিগুণ-চতুর্গুণ,[৩২৬] আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংগত হইয়া চলিও, যেমতে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

১৩০ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝ج

১৩০ আর সেই অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিও - যাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে অমান্যকারীদিগের জন্য।

১৩১ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ج

১৩১ আর আজ্ঞাবহ হইয়া চলিও আল্লার ও (এই) রছুলের,[৩২৭] যেমতে তোমরা করুণা-ভাজন হইতে পারিবে।

১৩২ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝لا

১৩২ এবং তোমরা ত্বরিত হইয়া চলিও আপন প্রভুর ক্ষমার পানে, আর সেই স্বর্গের (পানে[৩২৮]) সমস্ত আছমান ও জমীন জুড়িয়া যাহার বিশালতা,[৩২৯] যাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে (সেই সব) সংযমীদিগের জন্য,—

١٣٣ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

১৩৩ —যাহারা ব্যয় করিয়া থাকে স্বচ্ছল ও কৃচ্ছ (উভয়) অবস্থাতে, এবং যাহারা ক্রোধসম্বরণকারী ও লোকের (অপরাধ) সম্বন্ধে ক্ষমাশীল ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রেম করিয়া থাকেন উপকারক লোকদিগকে।

١٣٤ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ صلے قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

১৩৪ আর যাহারা (এরূপ সৎ-ভাব সম্পন্ন যে) যখনই তাহারা কোন মহাপাতকে লিপ্ত হয় অথবা নিজ-আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া বসে, তখনই তাহারা স্মরণে আনে—আল্লাহ্‌কে, ফলে নিজেদের অপরাধগুলির জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে থাকে—বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কে আছে আর অপরাধ ক্ষমা করার ?—অধিকন্তু নিজেদের অনুষ্ঠিত (পাপ-) কার্য্যে তাহারা (জেদ করিয়া) জমিয়া থাকে না - নিজেদের জ্ঞাতসারে।

١٣٥ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ

১৩৫ এই যে লোকসমাজ, ইহাদের কর্ম্মফল হইতেছে—তাহাদের প্রভুর সন্নিধান হইতে (সমাগত) মার্জ্জনা, আর এমন কানন-কলাপ যাহার তলদেশ দিয়া

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ؕ

বহিয়া চলিয়াছে নদী-নির্ঝরমালা, সেখানে তাহারা চির-স্থায়ী; বস্তুতঃ সাধকদিগের পুণ্যফল কতই না সুন্দর!

١٣٦ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১৩৬ (জয়-পরাজয়ের ও উত্থান-পতনের) বহু আদর্শ-ঘটনা তোমাদিগের পূর্ব্বেও (সংঘটিত) হইয়া গিয়াছে, অতএব পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, সে মতে (সন্ধান করিয়া) দেখ— কী পরিণতি হইয়াছে, মিথ্যা-আরোপকারী-দিগের।

١٣٧ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩৭ ইহা হইতেছে জন-সাধারণের জন্য স্পষ্ট বিবৃতি, এবং সংযমশীল (মোমেন) দিগের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ।

١٣٨ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৮ আর (হে মোমেনগণ!) তোমরা শিথিল হইও না তথা বিমর্ষ হইয়া পড়িও না, বস্তুতঃ তোমরাই প্রবলতর হইয়া থাকিবে—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

١٣٩ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ

১৩৯ তোমরা যদি কোন আঘাত পাইয়া থাক, তাহা হইলে (তাহাতে অভিনব কিছুই নাই) অন্যজাতিও উহার অনুরূপ আঘাত পাইয়াছে; আর (জয়

পরাজয়ের) এই যে দিনগুলি, বিভিন্ন জন-সমাজের মধ্যে আমরা ইহার প্রবর্ত্তন করিয়া থাকি—পর্য্যায়ক্রমে, অধিকন্তু (এই আঘাতের) কারণ এই যে, কাহারা যে সত্যকার মোমেন, আল্লাহ্ তাহা (প্রকাশ্য কার্য্য-ক্ষেত্রে) জানিয়া লইতে চান আর তোমাদিগের মধ্যকার কতকগুলি লোককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে চান ; বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না—

الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪০ (এই আঘাতের) আরও কারণ এই যে, আল্লাহ মোমেনদিগকে (উহাদ্বারা) শোধন করিয়া লইবেন এবং কাফেরদিগকে শ্রীবৃদ্ধিহীন করিয়া দিবেন।

١٤٠ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪১ তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, (কেবল মুখের দাবীর ফলেই) তোমরা বেহেশ্‌তে দাখিল হইয়া যাইবে — অথচ, তোমাদিগের মধ্যে জেহাদ করিবে কাহারা আর (সেই জেহাদে) ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকিবে কাহারা, সে যাবৎ আল্লাহ তাহা (কার্য্য-ক্ষেত্র) জানিয়া লন নাই !

١٤١ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৪২ অবস্থা এই যে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব্বে তোমরা তাহার

١٤٢ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ

কামনা করিয়া আসিতেছিলে, অতঃপর সেই মৃত্যুকে তোমরা প্রত্যক্ষ করিলে, অথচ (সে সময় তাহাকে বরণ না করিয়া) তোমরা কেবল দেখিয়া যাইতেছিলে।[৩৫৬]

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

টীকা :—

৩৫৬ রেবা—দ্বিগুণ চতুর্গুণ

রেবার অবৈধতা সম্বন্ধে ইহাই কোরআনের প্রথম আয়ত, ছুরা বকরার আয়তগুলি ইহার পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত ও শেষ নিষেধাজ্ঞা।

আলোচ্য আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে :—"হে মোমেনগণ! তোমরা সুদ খাইও না।" ইহাই আয়তের বক্তব্য। "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" সুদের সংজ্ঞাও নহে, শর্ত্তও নহে। উহাদ্বারা কুসীদ-ব্যবসায়ের সাধারণ পরিণামটার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। "সুদ খাইও না—দ্বিগুণ চতুর্গুণ" পদের তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা সুদ খাইবে না—সুদের অবস্থা এই যে, আসলের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণতঃ তাহা মূলধনের দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়ায় বা দাঁড়াইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর লেখক আয়তের ভাষার প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া এই اضعافا مضاعفة বা 'দ্বিগুণ চতুর্গুণ' শব্দ দুইটীকে লইয়া কোআনের তফছিরে একটা অনর্থক ও অনাবশ্যক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চান যে, আয়তে "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" বলিয়া কেবল চক্রবৃদ্ধি হারের অতিরিক্ত সুদকে হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং এই পর্য্যায়ভুক্ত না হয় যে সুদ, তাহা অবৈধ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বলিয়া রেবার নিষেধাজ্ঞাকে تقييد বা qualify করা হয় নাই, উহাদ্বারা সুদের বাস্তব পরিণতির পরিচয় দেওয়া হইতেছে মাত্র। উহাকে শর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে আয়তের ভাষার প্রতি অবিচার করা হইবে। এইরূপ প্রয়োগের একটা উদাহরণ দিয়া বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রাগ-এছলামিক যুগের আরবরা অভাব ও দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই মহাপাপের নিবারণ-কল্পে কোরআনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইল :—

و لا تقتلوا اولادكم خشية املاق

"তোমরা নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না—অভাবের আশঙ্কাবশতঃ (এছরাইল) আলোচ্য আয়তের ন্যায়, এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে সকল শ্রেণীর সন্তান-হত্যাকে নিবারণ করা।

কিন্তু যেহেতু আরবরা সে সময় এই মহাপাতকে লিপ্ত হইত সাধারণতঃ অভাবের আশঙ্কা করিয়া, সেইজন্য "অভাবের আশঙ্কাবশতঃ"–বলিয়া সমাজের একটা অবস্থাকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ ইহা সন্তান-হত্যার নিষেধাজ্ঞার কারণও নহে, শর্ত্তও নহে। অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, দারিদ্র্যের আশঙ্কাবশতঃ না হইলে, নিজের সন্তানদিগকে হত্যা করা এই আয়ত অনুসারে বৈধ! ঠিক এইরূপ, 'দ্বিগুণ-চতুর্গুণ' কথাটী সুদের নিষেধাজ্ঞার শর্ত্তও নহে, কারণও নহে।

ছুরা বকরার আয়তটী সুদ সম্বন্ধে শেষ নিষেধাজ্ঞা। এমনকি এবনে-আব্বাছের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, ইহাই 'আহ্‌কাম' বা আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে কোরআনের শেষ আয়ত। এই শেষ-নিষেধাজ্ঞায় রেবা মাত্রকে অবৈধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বলিয়া তাহার কোন বিশেষণ সেখানে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এখানে 'দ্বিগুণ-চতুর্গুণ'কে নিষেধের শর্ত্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও, শেষ আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে উহাকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়তগুলিকে যেরূপভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। "নেশার অবস্থায় নমাজে প্রবৃত্ত হইও না" (নছা, ৪৩)—প্রাথমিক অবস্থার আদেশ। পরবর্ত্তী আদেশে সর্ব্বপ্রকার মাদককে অবৈধ বলিয়া ব্যাপকভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শেষ আয়তকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রথম আয়তকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে, নামাজের ক্ষতি না হয়-এমন ভাবে মদ্যপান করা বৈধ হইবে।

এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, রেবার চরম ও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল– হজরতের জীবনের শেষ সময়, এছলামী-ষ্টেটের অর্থ-নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও তাহার অবদান-উপকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর। একটু মনোযোগ সহকারে কোরআন পাঠ করিলে সহজে জানা যাইবে যে, জাকাতের আদেশের সঙ্গে রেবার নিষেধাজ্ঞার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষকে কুসীদজীবী শাইলকদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এছলামের বিধান অনুসারে বায়তুল্‌মাল-তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা আবশ্যক।

দুন্‌য়ার বহু ধর্ম্মপ্রচারক, বহু সমাজ-সংস্কারক ও বহু ব্যবস্থাপ্রণেতা আবহমান কাল হইতে কুসীদ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই বহু বিশ্রুত উন্নত যুগ পর্য্যন্ত, দুস্থ মানবতাকে কুসীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করারজন্য —বা তাহার অজুহাতে—তাঁহারা নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। কুসীদ ব্যবসায়ের এই ইতিহাসটা সম্যকভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে যে, একমাত্র দীনদয়াল মোহাম্মদ মোস্তাফা ব্যতীত আর কেহই এই সর্ব্বনাশকর সমাজ-ব্যাধির আসল নিদানটা বুঝিয়া উঠিতে, অথবা তাহার প্রতিকারের যথাযথ উপায় আবিষ্কার করিতে, সমর্থ হন নাই। একদিকে, কুসীদ ব্যবসায়কে তাঁহারা অবৈধ ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না, অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত দীনদুঃখীকে তাঁহাদের কেহই এমন কোন

পথ দেখাইয়া দিতেছেন না, যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী মহাজনদিগের দ্বারস্থ না হইয়াও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে। এসম্বন্ধে আর একটী সত্যকথা এই যে, অর্থনীতির কোন উদার, মহান ও বিশ্বজনীন দৃষ্টি লইয়া আর কেহ এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে একটা না একটা ধনিক স্বার্থের নির্দ্দেশ অনুসারে। কোন একটা সুদৃঢ় নীতি ও সুমহান আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না, এখনও নাই। এখানে সে সব কথা বলা অসম্ভব হইলেও সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় না দিয়া পারিতেছি না।

আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা-গ্রন্থ হইতেছে মনু-সংহিতা। কুসীদ গ্রহণ সম্বন্ধে বহু বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ এই সংহিতায় আছে, সত্য; কিন্তু তাহার ভীষণতাকে কম করার কোন চেষ্টাও এই সংহিতাকার করেন নাই—নিবারণের চেষ্টা'ত দূরের কথা। এই সংহিতায় কুসীদজীবী মহাজনদিগকে দুইগুণ হইতে পাঁচগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে (৮—১৫১)। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মোশির (মূছার) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পরবর্ত্তীযুগ পর্য্যন্ত এছরাইল-বংশের নবীরা স্বজাতীয় জনসাধারণকে কুসীদজীবী মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সে চেষ্টা ও ব্যবস্থা কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। মোশি সদাপ্রভুর নামে এছরাইল-বংশের ধনিক-দিগকে নিষেধ করিতেছেন, তাহারা যেন "**স্বজাতীয়** কোন দীনদুঃখীকে" টাকা ধার দিয়া তাহার উপর সুদ না চাপায় (যাত্রা পুস্তক, ২২—২৫, ২৬)। দ্বিতীয় বিবরণেও এই উপদেশ দিয়া বলা হইতেছে—"সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না" (২৩—২০)। কুসীদ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে যে হীনাদপি হীন মানসিকতার এবং নির্ম্মম শোষণ প্রবৃত্তির উপর, স্বদেশী বিদেশী প্রভৃতি বলিয়া তাহার তারতম্য কিছুই হয় না। বাইবেলের নির্দ্দেশ এই যে, এছারাইলীয়রা বিদেশী বা পর-জাতীয়দের নিকট হইতে যথাসাধ্য শোষণ করিতে থাকুক, তাহাতে অবৈধ বা অসঙ্গত কিছুই নাই, স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে একটু সতর্ক হইয়া চলিলেই হইল। এই নীতিহীন আদর্শহীন সাম্প্রদায়িকতার ফলে এহুদীজাতি আজ শাইলকের জাতি বলিয়া দুন্‌য়ার সর্ব্বত্রই চরমভাবে অভিশপ্ত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই কুসীদ ব্যবসাই তাহাদিগকে ইউরোপময় এমন ঘৃণা ও অত্যাচারের পাত্রে পরিণত করিয়াছিল। সুদ দেওয়াতে জাতির যে বৈষয়িক ক্ষতি, (বাইবেলের বর্ণনা মতে) এছরাইলীয় নবীদিগের দৃষ্টি সেই ক্ষতি টুকুতেই সীবাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সুদ গ্রহণ করাতে, বিশেষতঃ সমাজে তাহার অবাদ প্রচলনে জাতির যে মানসিক অধঃপতন ঘটে, এহুদী জননায়করা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাইবেল পাঠ করিলে খুবই পরিষ্কারভাবে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিও চরিতার্থ হইতে পারে নাই। প্রবৃত্তি হীন হইয়া গেলে, স্বজাতি বিজাতির বিচারও আর মানুষের থাকে না। তাই ভাববাদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ইতিহাসেও দেখা যাইতেছে যে, এছরাইলীয় পিতা এছরাইলীয় মহাজনের কবলে পড়িয়া দাসরূপে মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার

পুত্রদ্বয়কে আবার দাসরূপে পাওয়ার জন্য সেই মহাজন আসিয়া স্বজাতীয় খাতকের বিধবা স্ত্রীকে পীড়ন করিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছে না (২ রাজাবলি ৪--১)। নহিমিয় ৫ম অধ্যায়ে এবং যিশাইয় ৫ম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে মহাজন-পীড়িত দীন-দুঃখীদিগের আর্ত্তনাদ সমানভাবেই শোনা যাইতেছে। যাহা হউক, উদারদৃষ্টি, সুদৃঢ় নীতি ও মহান আদর্শের অভাবে, বাইবেলের সমস্ত ব্যবস্থা এবং এছরাইলীয় ভাববাদীদিগের সমস্ত চেষ্টাই যে একটা ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছিল, বাইবেল-বিশেষজ্ঞরাও তাহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। (দেখ—Ency. Bibilica. Art. Law and Justice, 16)।

শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় বিভিন্ন জাতির আইন-প্রণেতারাও এসম্বন্ধে যত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন বা এখনও করিতেছেন, নীতি ও আদর্শের অভাবে তাহার কোনটীও কোন প্রকার স্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারে নাই। সুদখোর মহাজনদিগের অত্যাচারে প্রাচীন গ্রীসের জনসাধারণ যখন একেবারে দাস জাতিতে পরিণত হইয়া যাইতেছিল, সেই সময়, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৯৪ সনে, সোলোন-আইন বা Solon's legislation প্রণীত হয়। যে সব ঋণ খাতকদিগের দেহের বা সম্পত্তির জামিনে সে সময় পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যে ঋণের মূলধনের বহুগুণ অধিক সুদ তাহার পূর্ব্বে মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছিল, এই আইনের ফলে তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইল। কিন্তু হৃতসর্ব্বস্ব দীনদুঃখীরা অল্পদিন যাইতে না যাইতে আবার মহাজনদিগের কবলে পতিত হইল।

সাম্রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থাও তখন এইরূপ শোচনীয়। মহাজনরাই প্রভু আর খাতকরা সপরিবারে তাহাদের দাস, এই ছিল সে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি। এই সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সনে, একটী আইন পাস করিয়া সেখানে সুদের উচ্চতম হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইন সত্তেও, in the course of two or three centuries the small free farmers were utterly destroyed ...... and debt ended practically, if not technically, in slavery. অর্থাৎ, দুই বা তিন শতাব্দীর মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন কৃষিযোতগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং ঋণের ফলে জন-সাধারণ, আইনতঃ নাই হউক, কার্য্যতঃ দাসজাতিতে পর্য্যবসিত হইল *।

খৃষ্টানধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ও প্রসারলাভের পর পাদ্রী-পুরোহিতরা কুসীদের অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য খুব জোর দিতে লাগিলেন, সত্য। কিন্তু সুদ নিবারণের চেষ্টার পূর্ব্বে ঋণ নিবারণের কোন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে খৃষ্টানরা সুদের ব্যবসায় বর্জ্জন করিল, আর তাহাকে একচেটিয়াভাবে অধিকার করিয়া বসিল সেই সব দেশের এহুদী অধিবাসীরা। তখন খৃষ্টান হইল খাতক আর এহুদীরা হইল মহাজন। ঠিক যেমন সুদের ব্যবসায়টা আমাদের দেশের হিন্দু মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই সময়, শোষক ও শোষিতের মধ্যে এমন কঠোর বৈরীভাবের সৃষ্টি হয় এবং এহুদী মহাজনদিগের

* Ency. Bri. Usury.

অত্যাচার এমন চরমসীমায় উপনীত হইয়া যায় যে, ৩য় হেনরী নিউক্যাসেল ও ডার্ব্বিকে যে ‘চার্টার’ প্রদান করেন, তাহাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন এহুদীই এই দুই স্থানে বাস করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত Magna Carta বা রাজকীয় ছনদের * ১০ ও ১১ ধারায় মৃত খাতকের বিধবা স্ত্রী ও নাবালেগ ওয়ারেছদিগকে এহুদী মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা পাওয়া হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ও এই সব রক্ষাকবচ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার ফলে ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিকভাবাপন্ন মনীষী ও রাজনৈতিক নেতারা ১২৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত পরপর কতকগুলি আইন পাস করিয়া যান। এইগুলি ইংলণ্ডের Usury Laws বলিয়া বিদিত।

আইন বহুত প্রণীত হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতিরোধের বা প্রতিকারের দিক দিয়া উপকার বিশেষ কিছু হইল না। বরং এই নীতি ও আদর্শহীন প্রচেষ্টার ফলে দেশময় একটা উল্‌টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া গেল, এবং অবশেষে পার্লামেন্টের পূরা ৩৫ বৎসরের বাদ প্রতিবাদ ও কলহ কোন্দলের পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া সুদ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব্বের সমস্ত আইনগুলিকে রহিত করিয়া দেওয়া হইল। সে সময় ইংলণ্ডে সমবায় সমিতি, ঋণদান সমিতি ও অন্যান্য সকল প্রকারের ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তত্রাচ অর্দ্ধশতাব্দী যাইতে না যাইতে ইংলণ্ডের গগন পবন জনসাধারণের আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া সুদ-নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন আইন পাস করিতে হইল। কিন্তু তাহাও আজ ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। পুরাতন ও নূতন প্রণালীর নানা প্রকারের কুসীদ ব্যবসায়ের ফলে ভারতের জনসাধারণ আজ হৃতসর্ব্বস্ব। অভিজ্ঞরা হিসাব করিয়া বলিতেছেন, ভারতের এক কৃষকসমাজের ঋণই ৯০০ কোটি টাকা। ইহার সুদ হয় বার্ষিক কমবেশী ১৭০ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কিং ইন্‌কয়ারি কমিটীর মতে বাঙ্গালার কৃষকদিগের মোট ঋণ ১০০ কোটি টাকা—প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের গড়পড়তা ঋণ ১৬০ টাকা। বহুক্ষেত্রে সুদে আসলে মিলিয়া মহাজনের দেওয়া প্রকৃত মূলধন ‘দ্বিগুণ-চতুর্গুণ’ভাবে বাড়িতে বাড়িতে কৃষকদের ঋণভার এইরূপ দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আইন পাস করিয়া সুদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই আইন দুস্থ দীনদুঃখীর কাণাকড়িরও উপকারে আইসে নাই বরং এই ১৫ বৎসরে তাহাদের ঋণের ভার বহুপরিমাণে বাড়িয়াই গিয়াছে। ১৯৩২ সালে আবার এক আইন পাস করিয়া কুসীদভার-প্রপীড়িত জনসাধারণের দুর্দ্দশার আংশিক প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই ভীষণ ধ্বংসস্রোতের গতিরোধ করা তাহাতেও সম্ভবপর হইল না। তাই এবার গবর্ণমেন্ট স্বয়ং “Bill for the Relief of Rural Indebtedness” বলিয়া আবার এক নূতন প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন।

* ১২২৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জনের নিকট হইতে গৃহীত ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকারের মহা-ছনদ।

মজ্জমান মানুষ যেমন সম্মুখস্থ তৃণকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, দেশের জনসাধারণ সেইরূপ এই শ্রেণীর আইনগুলির প্রতি তাকাইয়া প্রতিকারের আশায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু দুন্‌য়ার গত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস আজ একবাক্যে বলিয়া দিতেছে যে, এ সব প্রতিকার প্রতিকারই নহে। বরং শোষণকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শোষিতকে একেবারে মরিতে না দেওয়ার স্বার্থবুদ্ধিই এই সব প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। বস্তুতঃ এছলামের নির্দ্ধারিত প্রতিকারের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত দুন্‌য়াকে কুসীদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এছলাম এই সর্ব্বনাশ স্রোতের গতিরোধ করিয়াছে একদিকে রেবা বা কুসীদের ব্যবসায়কে কঠোর ও ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করিয়া, অন্যদিকে—সুদ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্ত্তে—ঋণ নিবারণের চিরস্থায়ী ও বাস্তব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া। আজ হউক, কাল হউক, আর দু'দিন পরেই হউক, জগৎকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এছলামের এই সমাধান ব্যতীত দুস্থমানবতার এই ঋণসমস্যার বা সুদসমস্যার অন্য কোনই সমাধান নাই। সুদনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া, জনসাধারণের অভাবের মাত্রাকে দিন দিন বাড়াইয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঋণকে সহজলভ্য করিয়া দিয়াই দুন্‌য়া এযাবৎ এই নির্ম্মমতার চিত্রকে নির্ম্মমতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এছলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার বিশাল সাম্রাজ্যগুলির দিকে দিকে তাহার অবলম্বিত নীতির ও আদর্শের সফলতা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

কুসীদ বা usury সম্বন্ধে আধুনিক জগতে যে সব আলোচনা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সুদনিয়ন্ত্রণের যে সব "ফর্ম্মূলা" আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সমস্তের গোড়ার কথা হইতেছে sucurity বা জামিন। যাহার জামিন যত নিরাপদ বা মূল্যবান, সে সেই অনুপাতে কম সুদে ঋণ পাওয়ার অধিকারী, ইহাই হইতেছে সকল দিকের সার সিদ্ধান্ত। কিন্তু দুন্‌য়ার দুস্থ দীনদুঃখীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে, জামিন দেওয়ার মত সম্পত্তি অথবা ঋণ পরিশোধ করার মত সঙ্গতি যাহাদের নাই। ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কোন প্রতিকারই সভ্যজগতের কাছে নাই। ইহারও একমাত্র প্রতিকার—এছলাম।

এছলামের স্পষ্ট ও অপরিহার্য্য নির্দ্দেশ এই যে, সঙ্গতভাবে নিজের সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ করার পর মানুষের যাহা উদ্বৃত হইবে, তাহার অধিকারী একা সেই কেবল নহে। তাহার শতকরা ২৷৷০ টাকা দেশের দুস্থ দীনদুঃখীদিগের অধিকারভুক্ত। খলিফা প্রত্যেক ধনিকের নিকট হইতে এই কর আদায় করিবেন। এইরূপে ক্ষেত্রস্বামীদের নিকট হইতে অবস্থা বিশেষে উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ তিনি আদায় করিয়া লইবেন। শস্যের ন্যায় ফল ও পশুপালের উপরও এই প্রকার কর বা জাকাতের ব্যবস্থা আছে। এগুলি বাধ্যতামূলক, কেহ না দিলে তাহার সঙ্গে জেহাদ করার ব্যবস্থা। ইহাছাড়া অন্য প্রকারের 'ছাদাকাৎ' হইতেও এই তহবিল পুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে মোছলেম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে তহবিল সঞ্চিত হইবে, সরঞ্জামী খরচের জন্য তাহার মাত্র ১/৮ ব্যয় করা যাইতে পারিবে। অবশিষ্ট ৭/৮ ব্যয় করিতে হইবে, দুস্থ দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের সেবায় এবং অন্যান্য জনহিতকর

কার্য্যে। কোরআন ইহাকে দরিদ্র জনসাধারণের 'স্বত্বাধিকার' বলিয়া প্রচার করিয়াছে। ছুরা নেছার 'ছাদাকা' সংক্রান্ত আয়তে ইহাকে فريضة من الله আল্লার প্রদত্ত নির্দ্দেশ বা ordinance বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (৯—৬০)। এখানে ঋণের কথা নাই, সুদের প্রসঙ্গ নাই, জামিনের প্রশ্ন নাই, ভিক্ষার অপমান নাই। বলা আবশ্যক যে, ইহা আদর্শবাদের স্বপ্ন নহে, কর্ম্মবিমুখের অবাস্তব কল্পনাও নহে। এই শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, এছলাম নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদন করিয়া দেখাইয়াছে যে, সুদসমস্যার বা ঋণসমস্যার একমাত্র প্রতিকার ইহাই।

সভ্যতার প্রথমদিন হইতেই Capitalism বা ধনতন্ত্রবাদ এবং Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ, পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। দুনয়ার অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রকৃত কারণ যে ইহাই, ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে নিজেদের অতি হীন ধনতান্ত্রিক স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া, স্বদেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতে এহুদী জাতি যে কখনই চেষ্টার ক্রটী করে নাই, এহুদ-ইতিহাসের ইহা সর্ব্বপ্রধান সত্য। গত মহাযুদ্ধেও জর্ম্মানজাতির শোচনীয় পরাজয়ের একটা বড় কারণ জর্ম্মান-এহুদীরাই। এছলামের অর্থ-নীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতীয় সম্পদকে মুষ্টিমেয় ধনিকের কবলগত করার যে নীতি, তাহারই নাম Capitalism বা ধনতন্ত্রবাদ। কিন্তু এছলামী-অর্থনীতির অন্যতম কথা হইতেছে ধনের নিক্কেন্দ্রীকরণ। এহুদীদের জাতীয় মনের সহিত এছলামের প্রধান সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া। বিদেশী কোরেশদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাহারা প্রত্যক্ষভাবে মুছলমানের ও পরোক্ষভাবে স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এই হীন মানসিকতার ফলে। তখনকার দিনে এই কুসীদ ব্যবসাই ছিল তাহাদের শোষণ প্রবৃত্তির প্রধান সহায় ও হীন-মানসিকতার প্রধান কারণ। তাই এহুদীদিগের জাতীয় চরিত্রের আলোচনা এবং বদর ও ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে মুছলমানকে প্রাসঙ্গিকভাবে কুসীদ ব্যবসায়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে—যেন তাহাদের জাতীয়-চরিত্রও ঐরূপে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হইয়া না পড়ে। সুদ প্রদান করিয়া স্বজাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ইহাই আর সকলের চিন্তা। কিন্তু এছলাম সুদ প্রদান অপেক্ষা মুছলমানকে কঠোরতরভাবে নিষেধ করিয়াছে সুদ গ্রহণ করিতে। কোরআনের কুত্রাপি সুদ প্রদান সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। কারণ বৈষয়িক হিসাবের সাময়িক লাভ লোকসান অপেক্ষা জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষকে বড় করিয়া দেখাই তাহার চিরাচরিত নীতি ও শাশ্বৎ আদর্শ।

৩৫৭ আজ্ঞাবহ হইয়া চল!

মানুষ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবে, ইহাই মূল লক্ষ্য। মানুষ আল্লার আদেশ নির্দ্দেশগুলি জানিতে পারিয়াছে এই রছুলের মারফতে। সুতরাং আল্লার আজ্ঞাবহ

হইয়া চলার জন্য সেই রছুলের আজ্ঞা মান্য করা প্রথম আবশ্যক। Vicroy বা রাজপ্রতিনিধিকে অমান্য করা আর স্বয়ং রাজাকে অমান্য করা একই কথা।

পূর্ব্বরুকুতে ওহোদ যুদ্ধের দুর্ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, রছুলের আদেশ যথাযথভাবে পালন না করার ফলেই মুছলমানদিগকে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে এখানে বলা হইতেছে যে, তোমরা আল্লার ও তোমাদের রছুলের আজ্ঞাবহ চলিও, তাহা হইলেই তোমরা আল্লার করুণালাভ করিতে সমর্থ হইবে। যুদ্ধের সময় এইরূপ discipline বা নিয়ম-নিষ্ঠার বিশেষ আবশ্যক। তাই যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে এখানে এই আবশ্যকীয় নিয়মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৫৮ ত্বরিত হওয়া

এই আয়তে আল্লার ক্ষমার পানে ও স্বর্গের পানে ত্বরিত হইয়া চলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সব কাজ ও উপকরণ আল্লার ক্ষমা ও স্বর্গলাভের কারণ হয়, সেই কাজগুলি সম্পাদন এবং সেই উপকরণগুলি অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিও না।

৩৫৯ বেহেশ্‌তের "বিশালতা"

ইহারই অনুরূপ ছুরা হাদিদের ২১ আয়তে বলা হইয়াছে—

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الارض -

"আর তোমরা ত্বরিত হইয়া চলিও আপন প্রভুর ক্ষমার পানে আর সেই স্বর্গের (পানে) আছমান ও জমিনের বিশালতার ন্যায় যাহার বিশালতা।' এই দুই আয়তে عرض শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী সাহিত্যে উহার সাধারণ ও সর্ব্ববাদীসম্মত অর্থ—প্রস্থ, পরিসর, বিশালতা এবং মূল্য ও বিনিময় (ছেহাহ, রাগেব, মেছবাহ, কবির প্রভৃতি)। অধিকাংশ তফছিরকার এখানে প্রস্থ বা পরিসর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আবু-মোছলেম ও আর দুই একজন শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—মানুষ সাধারণভাবে কোন বস্তুর যে মূল্য বা বিনিময় কল্পনা করিতে পারে, বেহেশতের মূল্য তাহাই, এখানে রূপকভাবে এইটাই বোঝান হইতেছে। আমার মতে এখানে "আর্জ" শব্দের অর্থ বিনিময় হইতে পারে, বিশালতাও হইতে পারে। উভয় অবস্থাতে ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার পরিণাম একই। ফলতঃ বেহেশতকে মানুষ যেরূপে কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন ও অতি সঙ্কীর্ণ। সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসীদিগের জন্য যে স্বর্গ আল্লাহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মানুষের কল্পনাতীত ভাবে বিশাল ও মূল্যবান। বেহেশ্‌ত স্থানের নাম না অবস্থার নাম, দৈহিক না আধ্যাত্মিক, অথবা ইহা ব্যতীত আর কিছু, এক মাত্র আল্লাই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং সে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গতি বা সার্থকতা কিছুই নাই। আল্লাহ'ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া

দিতেছেন যে,— ... "তাঁহাদিগের জন্ম কি নয়নাভিরাম (পরম ধন) লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, কোন ব্যক্তিই তাহা অবগত নহে" (৩২—১৭)। তিনি আরও বলিতেছেন:—আমার সৎকর্ম্মশীল বান্দাদিগের জন্ম যে নে'মৎ আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি—কোন চক্ষু তাহা দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ তাহা শ্রবণ করে নাই, আর কোন মানুষের মনে তাহার কল্পনাও স্থানলাভ করিতে পারে নাই (বোখারী, মোছলেম)। ছুরা বকরার ২৯, ৩০ ও ৩১ টীকায় দোজখ ও বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৬০ মোত্তাকীদের লক্ষণ

মানুষের কল্পনাতীত বেহেশ্‌তেকে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে সংযমশীল লোকদিগের জন্ম, উপরের আয়তে এই কথা বলার পর এখানে ও ইহার পরবর্ত্তী আয়তে মোত্তকী বা সংযমী-দিগের পাঁচটী লক্ষণের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতেছে সদ্ব্যয়ের অভ্যাস। কৃপণতার মনোভাব মানুষকে পাইয়া না বসিতে পারে, ইহাই আয়তের মূল লক্ষ্য। তাই বলা হইতেছে, অবস্থা সচ্ছল হউক আর অসচ্ছল হউক, নিজের শক্তি অনুসারে কিছু কিছু সদ্ব্যয় মুছলমানকে সকল সময়ই করিয়া যাইতে হইবে। অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া সদ্ব্যয় ত্যাগ করিয়া বসিলে, তাহার ফলে প্রবৃত্তিটা এমনই ভাবে বিগড়াইয়া যাইতে পারে যে, অবস্থা ভাল হইলেও সদ্ব্যয় করার মত মনের বল তখন আর মানুষের থাকিবে না। এইরূপে ক্রোধ মানুষের জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনা শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এইজন্ম ক্রোধ সম্বরণ করা সংযম সাধনার একটা প্রধান উপকরণ। মানুষের অপরাধ ক্ষমা করাও সংযমের একটা প্রধান লক্ষণ। অপরাধীকে দণ্ড না দেওয়ার নামই ক্ষমা। কোরআন বলিতেছে, শুধু ক্ষমা করাই সংযমের প্রধান আদর্শ নহে, বরং সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য সেই অপকারীর উপকারও করিয়া যাইতে হইবে।

কোরআন ও হাদিছ সংযমসাধনার এই শ্রেণীর শিক্ষায় পরিপূর্ণ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার সারাজীবনটাই ইহার অনুপম আদর্শ।

৩৬১ অনুতাপ ও আত্মগ্লানি

সংযমসাধনার পঞ্চম লক্ষণটী এই আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভ্রান্তি ও পদস্খলন মানুষের জীবনে অনিবার্য্য। কিন্তু কোরআনের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে মুছলমান, তাহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, যখনই সে কোন অপকর্ম্মের দ্বারা নিজ-আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া বসে, তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া সে বিচলিত হইয়া পড়ে। আর নিজের অপকর্ম্মের জন্ম তাঁহার হুজুরে ক্ষমাভিক্ষা করিতে থাকে। পাপের জন্ম তাহারা অনুতপ্ত হয়, তাহাদের মনে আত্মগ্লানির সৃষ্টি হইয়া যায়। এই অনুতাপই মানুষের আত্মশুদ্ধির প্রধান উপকরণ। এছলামের পরিভাষায় ইহাকেই তাওবা বলা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৬২ ইতিহাসের শিক্ষা

কোরআনে বহুস্থলে مكذبين শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা 'মোকাজ্জেব্' শব্দের বহুবচন। মোকাজ্জেব্ তাক্জীব্ হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—সত্যের প্রতি মিথ্যার আরোপ করা। অর্থাৎ যাহা সত্য, তাহাকে সত্যনয় বলিয়া মুখে ঘোষণা করা, অথবা বাস্তবক্ষেত্রে কার্য্যতঃ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করা। যাহারা মুখে সত্যকে স্বীকার করে বা অস্বীকার করে না, তাহাদের মধ্যে এরূপ লোকও অনেক আছে, যাহারা নিজেদের কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায় যে, মুখে না বলিলেও, তাহারাও সত্যকে সত্য বলিয় গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালায় ইহার কোন প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই নাই, তাই অগত্যা "মিথ্যা-আরোপকারী" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

এই রুকুর প্রারম্ভে আনুসঙ্গিকভাবে সুদ প্রভৃতি কতকগুলি দরকারী বিষয়ের উল্লেখ করার পর, এখান হইতে আবার ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইতেছে। এই আয়তে, তাহার ভূমিকা হিসাবে, মুছলমানদিগকে বিশ্বমানবের উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। জাতিগঠনের জন্য কি উপাদান উপকরণের দরকার, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য কি কি সাধনার আবশ্যক, এবং সেই সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন শ্রেণীর অন্যায় ও অপকার্য্যগুলি বর্জ্জন করিয়া চলা অপরিহার্য্য, এই ছুরার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুখ্যতঃ তাহারই আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। এখানে মুছলমানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—তোমরা দুন্য়ার দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর, লুপ্ত বিধ্বস্ত বা অধঃপতিত জাতিদিগের শোচনীয় পরিণতির কার্য্যকারণ পরম্পরার সন্ধান করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই সমস্ত সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করাই তাহাদের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। ইহাই তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম এবং মুছলমানদিগের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না।

"পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর"—পদের লক্ষ্যার্থ পরিভ্রমণ করাই নহে। জাতিগণের জীবন-মরণের কার্য্য-কারণ-পরম্পরা সম্বন্ধে ইতিহাসের শিক্ষাকে যে কোন প্রকারে হউক, গ্রহণ করাই আয়তের উদ্দেশ্য।

৩৬৩ ঈমানই শক্তি

আয়তে অহ্ন ও হোজ্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অহ্ন—অর্থে শিথিল হওয়া, দুর্ব্বল হইয়া পড়া। কোন প্রিয় বস্তুর তিরোধান ঘটায় মনে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তাহাকে হোজ্ন বলা হয়। বাঙ্গলায় উহার অর্থ—বিমর্ষ হওয়া, শোকাভিভূত হইয়া পড়া। সে সময় অর্থবলে ও জনবলে মুছলমানদিগের অবস্থা ছিল একেবারে হীন। বদর ও ওহোদ যুদ্ধের ভীষণ সংঘর্ষে তাহা আরও হীনতর হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতির ফলে হজরতের সহচরগণ শিথিল ও বিমর্ষ

হইয়া না পড়েন, এই জন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, কোরআনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, ইহা হজরতের ছাহাবাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইলেও, সমগ্র মোছলেম জাতির পক্ষে ইহা চিরন্তন ও সর্ব্বব্যাপী শিক্ষা, শাশ্বৎ আশার বাণী।

আয়তের সার শিক্ষা এই যে, মুছলমানের প্রকৃত শক্তি তাহার ঈমানে, ধনবলেও নহে, জনবলেও নহে। তাহার এই ঈমান অক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে যে, একমাত্র আল্লাই সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ সমস্ত শক্তির পরম-অধিকারী একমাত্র তিনি। মুছলমান-মণ্ডলীর উত্থান হইয়াছে সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে, তাঁহার বাণীকে দুনয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে জয়যুক্ত করার জন্য। নিজের যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে, সত্যের এই জয়পতাকাকে বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই তাহার মোছলেম-জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সাধনা। সাধনা তাহার কর্ত্তব্য, ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া সে তাহাই করিয়া যাইবে। সে সাধনা কখন কি পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিবে না করিবে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের মঙ্গল-ইচ্ছাই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। ফলতঃ মোছলেম-সাধকের আর তাহার শক্তিকেন্দ্রের সহিত যোগসূত্র হইতেছে এই বিশ্বাস বা ঈমান। এই ঈমান যদি দুর্ব্বল না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শক্তিকেন্দ্রের সহিত তাহার যোগসূত্রটা অটুট ও অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। কাজেই প্রবল ও পরাক্রমিত হইয়া থাকিবে তাহারাই।

প্রত্যেক মুছলমানই দুনয়ায় আসিয়াছে তাওহীদের মিশনরী হিসাবে। ইহাই তাহার মোছলেম-অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রধান সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। "আমার সমস্ত উপাসনা-আরাধনা, আমার সমস্ত কোরবান-বলিদান, আমার সমগ্র জীবন ও মরণ নিয়োজিত হইয়াছে একমাত্র রব্বুল-আলামীন আল্লার জন্য—কেহই নাই তাঁহার দ্বিতীয়, এই নির্দ্দেশই আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমি (এই নির্দ্দেশে) আত্মসমর্পণকারী প্রথম মোছলেম" (কোরআন–আন্‌আম) ইহাই'ত মোছলেম-অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ—তাহার জীবন-সাধনার প্রথম কথা ও শেষ কথা। এই বিস্মৃতপাঠ আবার মুছলমানকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, জীবনমন্ত্রের এই শাশ্বৎধ্বনি জাগাইয়া তাহার মনপ্রাণকে আবার জীবন্ত করিয়া, অমর করিয়া তুলিতে হইবে। মুছলমানকে ধ্বংস করার জন্য তাহার যাত্রাপথের চারিদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কেবলই রচনা করা হইয়াছে মরণের চরম বিভীষিকা। তাহাদের কর্ণে কর্ণে, মর্ম্মে মর্ম্মে উদাত্ত সুরে ধ্বনিয়া উঠুক—কোরআনের এই অমৃতবাণী, ঈমানের এই চিরন্তন জীবন-পুলক। সে আবার বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে শিখুক যে, সে দুনয়ায় আসিয়াছে স্বর্গের অমর বর লাভ করিয়া। ইহাই কোরআনের সত্যকার তফছির, বাস্তব তফছির।

৩৬৪ আঘাতের সার্থকতা

তফছিরকারগণের সাধারণ অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়তে হজরতের ছাহাবীদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলা হইতেছে যে, ওহোদ যুদ্ধে যে আঘাত তোমরা পাইয়াছ, তাহাতে বিচলিত

হওয়ার কারণ কিছুই নাই। কারণ অন্যজাতি অর্থাৎ তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোরেশপক্ষও'ত তোমাদের মত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমার মতে এখানে কওম-অর্থে দুনয়ার অন্য সব জাতির কথাই বুঝাইতেছে। সে যাহা হউক, সত্যের সাধক মোছলেম জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমাদের এই সাধনার পথ নিরঙ্কুশ একেবারেই নহে। আঘাত ও বিপদ এপথের অপরিহার্য্য সাথী। এই শ্রেণীর বিপদের তিনটী হেতু এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে :—

(১) পরীক্ষা না আসা পর্য্যন্ত সকলেই নিজকে মোমেন-মুছলমান বলিয়া দাবী ও প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু ইহাদের অনেকেই সত্যকার মোমেন নহে। সোণার সহিত খাদ মিশাইয়া যে মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, তাহা মেকী, কর্ম্মক্ষেত্রে অচল। সেই জন্য আগুনের তাপে খাদকে সোণা হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে কোরআন চায় তাওহীদের সেবকদিগকে লইয়া একটা খাঁটি জাতি গঠন করিতে এবং এইজন্য মোনাফেক ও মোমেনকে কার্য্যক্ষেত্রে বাছাই করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে জেহাদের এই অগ্নিপরীক্ষা।

(২) জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের মহিমায় গৌরবান্বিত করিতে হইলে, সব চাইতে বেশী দকার তাহার ব্যক্তিগণের ত্যাগ-সাধনার। কর্ত্তব্যের আহ্বানে শত্রুর বিষাক্ত খঞ্জরকে নিজের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া সব চাইতে বড় ত্যাগ। মুছলমানের জাতীয় জীবনের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য তাই তাহার প্রত্যেক স্তরেই শহীদের কাঁচা কলিজার যাঁচা খুনের দরকার হইবে। এই শহীদরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রাণকে কোরবান করিয়া জাতিকে প্রাণবান করিয়া রাখিবে, ইহাই এছলামের বজ্রবাণী। এজন্যও পরীক্ষার দরকার।

(৩) জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে যে দোষ দুর্ব্বলতা আছে, বিপদের সময় নিজের শোচনীয় কুফল লইয়া তাহা প্রকট হইয়া ওঠে। এই কুফলের অভিজ্ঞতাদ্বারা মুছলমান ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে এবং নিজকে সেই সব দোষদুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত করিয়া লইবে। নায়কের আনুগত্য ও কঠোর নিয়মনিষ্ঠার অভাবেই ওহোদযুদ্ধে মুছলমানদিগকে, বিজয়লাভের পরেও, বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এই বিপদের শিক্ষায় তাহারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া যাইবে। এই প্রকার আত্মশুদ্ধির ফলে তাহাদের চরিত্রবল ও জাতীয় শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মোমেনদিগের এই শক্তিবৃদ্ধির ফলে কাফেরদিগের শক্তি বিনষ্ট হইবে।

এই গুলিই হইতেছে আঘাতের ও বিপদের সার্থকতা।

৩৬৫ জেহাদ

জেহাদ এছলামের অপরিহার্য্য অঙ্গ। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপায়ান্তর না থাকিলে, মুছলমান আমীরের নির্দ্দেশমতে তরবারীর দ্বারা তাহাকে রক্ষা করার চেষ্টা পাইবে, ইহারই নাম জেহাদ। ছুরা বকরার বিভিন্ন টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আয়তে মুখ্যতঃ হজরতের ছাহাবাগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—জেহাদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া বিচলিত হইয়া পড়ার কোন

কারণ তোমাদের নাই। শুধু মুখে এছলামের দাবী করিয়া ও পরীক্ষা-বর্জ্জিত কএকটা অনুষ্ঠানমাত্র পালন করিয়াই তোমরা নিজেদের কাম্য মোক্ষধামে প্রবেশ করিতে পারিবে, সেজন্য জেহাদের বিপদ বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হইবে না—তোমরা কি এইরূপই মনে করিয়াছিলে? অর্থাৎ, কর নাই, করিতে পার না! কারণ, "বেহেশ্‌ত যে তরবারীর ছায়ায় অবস্থিত" আর তাহার সাধনপথ যে জেহাদের অগ্নিক্ষেত্রের মধ্যদিয়াই রচিত হইয়াছে, এ তত্ত্ব তোমরা বহুপূর্ব্ব হইতেই অবগত আছে। সুতরাং ওহোদের বিপদে তোমাদের পক্ষে চাঞ্চল্যের বা অবসন্নতার কারণ কিছুই থাকিতে পারে না।

৩৬৬ মৃত্যুর কামনা

মৃত্যু অর্থে মৃত্যুর উপকরণ বা জেহাদ, অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে নিজের প্রাণ কোরবান করা। বদরযুদ্ধের পর গাজী ও শহীদগণের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া কোরআনের আয়ত অবতীর্ণ হইতে লাগিল, স্বয়ং হজরত রছুলে করিম শতমুখে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছাহাবাগণের উৎসাহের অবধি রহিল না। বিশেষ করিয়া যে সব ছাহাবী বদরযুদ্ধে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আল্লার হুজুরে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—বদরযুদ্ধের মত আর একটা সুযোগ আসুক, সেখানে শাহাদৎ-সাধনায় লিপ্ত হইয়া আমরা স্বর্গ ও জীবন লাভ করি (জরির, মন্‌ছুর)। ওহোদযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে ছাহাবারা—বিশেষতঃ তরুণ সমাজ—মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার জন্য কিরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এখানে "তোমরা মৃত্যুর কামনা করিতেছিলে"-পদে, ছাহাবাগণের এই সব আগ্রহ ও আকাঙ্খার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ, যে জেহাদের ও যে শাহাদতের আকাঙ্খা তোমরা এতদিন পোষণ ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলে, সেদিন তাহাই তোমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

---

১৫ রুকু'

١٤٣ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৩ বস্তুতঃ মোহাম্মাদ'ত একজন রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন —নিশ্চয় অন্য রছুলগণ সকলে তাঁহার পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছেন ; অতএব, তিনি যদি (স্বাভাবিকভাবে) মরিয়া যান অথবা (অন্য কর্ত্তৃক) নিহত হন, তোমরা কি তাহা হইলে বিপরীতমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে? বস্তুতঃ বিপরীতমুখে ঘুরিয়া দাঁড়ায় যে ব্যক্তি, আল্লার কিছুমাত্র ক্ষতি সে কখনই করিতে পারে না ; আর কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ লোকদিগকে আল্লাহ (তাহাদের) কর্ম্মফল শীঘ্রই প্রদান করিবেন।

١٤٤ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ

১৪৪ আর কোন ব্যক্তিই মরিতে পারে না আল্লার নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে—মৃত্যুর সময় অবধারিত ; বস্তুতঃ দুন্য়ার পুণ্যফল (লাভের) প্রয়াসী হয় যে ব্যক্তি, তাহাকে তাহা হইতে প্রদান করিব, আর পরকালের পুণ্যফল

مِنْهَا ج وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ۝

(পাওয়ার) প্রয়াসী হয় যে ব্যক্তি, তাহাকে তাহা হইতে প্রদান করিব ; আর কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ লোকদিগকে আমরা (তাহাদের) কর্ম্মফল শীঘ্রই প্রদান্ করিব।

১৪৫ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৪৫ বস্তুতঃ (অতীত যুগে) কতই না ছিলেন নবী—বহু প্রভু-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আল্লার পথে যে-বিপদ তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা তাহারা শিথিল হইয়া যায় নাই, অধিকন্তু তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই, (শত্রু সমীপে) হেয়তা স্বীকার ও হীনতা প্রকাশও করে নাই ; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেম করেন ধৈর্য্যশীল লোকদিগকেঁ।

১৪৬ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

১৪৬ আর তাহারা বলার মধ্যে বলিত — হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগের তরে আমাদিগের পাপগুলি ক্ষমা কর ও আমাদিগের কার্য্যকলাপের অতিরিক্ততাকে (মার্জ্জনা কর), আর আমাদের চরণকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ এবং

কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দাও ! | الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪৭ সে মতে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন দুন্য়ার পুণ্যফল আর পরকালের উত্তম পুণ্যফল; বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেম করেন সৎকর্ম্মশীলদিগকে। | ١٤٧ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

টীকা :—

৩৬৭ নবীর মৃত্যুতে সত্য মরে না।

ওহোদ-যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রত্যেক দিকে, মুছলমানের জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান শিক্ষা ও আদর্শ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ইহার মধ্যকার কতকগুলি প্রধান শিক্ষা ও আদর্শকে, কোরআনে নানা প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

তীরান্দাজ সৈন্যরা হজরতের কঠোর তাকিদের কথা স্মরণ রাখিলেন না, নিজেদের নায়কের নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না, ইহার ফলে কোরেশ সেনাপতি অরক্ষিত গিরিপথ দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মুছলমানদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। মুছলমানরা ইহার পূর্ব্বেই ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে অবস্থায় এই আকস্মিক আক্রমণের বেগ সহ্য করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। এই বিপদের সময় অধিকাংশ মুছলমানই এমন বিহ্বল হইয়া পড়েন যে, হজরত কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কি করিতেছেন, তাহাঁর সন্ধান লওয়ার সুযোগও তাঁহাদের পক্ষে ঘটিয়া উঠিল না। এই অবসরকে স্বর্ণ সুযোগ মনে করিয়া কোরেশ যোদ্ধারা নিজেদের আক্রমণকে হজরতের প্রতি কেন্দ্রীভূত করিতে লাগিল। গণিত যে কয়জন নরনারী এই সময় হজরতকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ধৈর্য্য ও বীরত্ব বস্তুতই অতুলনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হজরত গুরুতরভাবে আহত হইয়া পড়েন। কোরেশ যোদ্ধারা মনে করিল, হজরত নিহত হইয়াছেন এবং এই সংবাদটীকে চারিদিকে প্রচার করিয়া দিতেও বিলম্ব করিল না। সেই বিহ্বল, বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন মুছলমানরা যখন শুনিলেন যে, হজরত নিহত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের অনেকের দেহ ও মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। হতাশ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া

তাঁহাদের একদল যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মোনাফেক-প্রধান আবদুল্লাহ-এবনে-উবাইয়ের মারফতে কোরেশ দলপতি আবু-ছুফ্‌য়ানের নিকট অভয়-ভিক্ষা করার জন্যও নাকি কেহ কেহ লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময় বিক্ষিপ্ত মোমেনবর্গকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন যাঁহারা, আনাছ-এবনে-নজর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি শুনিলেন, একদল মুছলমান হতাশ স্বরে হাহুতাশ করিরা বলিতেছেন—"আর কি হইবে, হজরত নিহত হইয়াছেন।" আনাছ তখন বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন :—

يا قوم ! ان كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل - فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلعم ! ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا ، فموتوا على ما مات عليه رسول الله !

"হে মোছলেম জাতি! মোহাম্মদ যদি সত্য সত্য নিহতই হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও মোহাম্মদের খোদা'ত নিহত হন নাই! অতএব যে সত্যের জন্য হজরত মোহাম্মদ সংগ্রাম করিয়াছেন, তোমরাও তাহার জন্য সংগ্রাম করিয়া যাও! হজরতের পর জীবনকে লইয়া কি কাজে লাগাইবে? ওঠ, যে কর্ত্তব্যের জন্য হজরত প্রাণ দিয়াছেন, তোমরাও তাহার জন্য নিজদিগকে বলিদান কর!"—মনছুর প্রভৃতি। মুখ্যতঃ এই সব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মুছলমান জাতিকে এখানে একটা গভীর, বিরাট ও চিরন্তন সত্য, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আয়তের প্রথমে বলা হইতেছে—মোহাম্মদ আল্লার রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অর্থাৎ মোহাম্মদের সম্মান ও গুরুত্ব, তাঁহার ব্যক্তিগত হিসাবে নহে, বরং তিনি আল্লার রছুল বলিয়া। রছুল হইতেছেন, আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত সত্যের বাহকমাত্র। সেই বাহক মরিলে সত্য মরে না, সত্য সাধনার কর্ত্তব্যও শেষ হইয়া যায় না। তোমরা যদি মুছলমান হইয়া থাক সত্যের জন্য, তাহা হইলে মোহাম্মদের মৃত্যুর পরেও সে সত্য সত্যই থাকিবে এবং তখন সত্যসাধনার সে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যে পরিণত হইয়া যাইবে না। এছলামের লক্ষ্য সত্যের সাধনা—নর পূজা নহে, তাওহীদের এই প্রাণ-বস্তুটাই এখানকার প্রধান প্রতিপাদ্য। মুছলমান সমাজের মধ্যে আজকাল এরূপ 'ভক্তের' সংখ্যাই অধিক, যাঁহারা ব্যক্তি-মোহাম্মদকে রছুল-মোহাম্মদ অপেক্ষা বড় করিয়া গ্রহণ করিতেছেন!

আয়তে আরও বলা হইতেছে যে, মোহাম্মদের পূর্ব্বকার নবীরা সকলেই "গত" হইয়াছেন। মূলে خلوا শব্দ আছে, বাঙ্গালায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ "গত হওয়া"। অমুক লোক গত হইয়া গিয়াছেন-বলিতে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন—এই অর্থই বোঝায়। কোরআন বলিয়া দিতেছে যে, হজরতের পূর্ব্বকার নবীরা সকলেই গত হইয়া গিয়াছেন—দুই প্রকারের। তাঁহাদের অধিকাংশ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আর কেহ কেহ অন্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ বোঝা যাইতেছে যে, এই দুই প্রকার ব্যতীত,

নবীদিগের গত হওয়ার অন্য কোন উপায় নাই, থাকিলে এ ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ নিশ্চয় করা হইত। তফছিরকারগণও এখানে এই মতের সমর্থন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে :—

حاصل الكلام انه تعالى بين ان قتله لا يوجب ضعفا فى دينه بدليلين - (الاول) بالقياس على موت ساير الانبياء و قتلهم (كبير) رسل الله ... الذين حين انقضت آجالهم ماتوا و قبضهم الله اليه ... كساير مدة رسله الى خلقه الذين مضوا قبله و ماتوا (ابن جرير) و ثانيهما القياس على موت ساير الانبياء و قتلهم (غرايب) فسيخلوا كما خلوا بالموت او القتل (بيضاوى) بين ان حكم النبى صلعم حكم من سبق من الانبياء (ص) فى انهم ماتوا و بقى اتباعهم متمسكين بدينهم (روح المعانى) -

কবির, জরির, গারায়েবুল কোরআন, বায়জাভী, রুহুল্‌মাআনী প্রভৃতি তফছিরের লেখকগণ এখানে একবাক্যে ও স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছেনে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যে অমর নহেন এবং তাঁহার মৃত্যুর ফলে ধর্ম্মসাধনা যে রহিত হইয়া যাইবে না, এই সত্যের প্রমাণ হিসাবে এখানে বলা হইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বকার রছুলগণ সকলেই হয় স্বাভাবিক ভাবে অথবা অন্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সাধনা ব্যর্থ বা রহিত হইয়া যায় নাই। সেইরূপে, মোহাম্মদকেও নিশ্চয় মরিতে হইবে এবং সেইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহারও সাধনা মরিয়া যাইতে পারে না।

হজরত ঈছাও এই "পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগের" একজন। যেহেতু কোরআন অনুসারে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পূর্ব্ববর্ত্তী রছুলগণ সকলেই গত হইয়া গিয়াছেন, অতএব হজরত ঈছাও নিশ্চয় গত হইয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, যেহেতু কোরআন অনুসারে, নিহত হইয়া মরা অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ব্যতীত গত হওয়ার অন্য কোন উপায় নাই, অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, এই দুই প্রকারের কোন এক প্রকার উপায়ে হজরত ঈছারও নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। আবহুহ'ত ইহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারই করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

قد خلت و مضت الرسل من قبله فماتوا و قد قتل بعض الذبين كزكريا و يحيى ... افئن مات كما مات موسى و عيسى او قتل كما قتل زكريا و يحيى ... الخ

"তাহার পূর্ব্বকার রছুলগণ গত হইয়াছেন, চলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছেন। আর কেহ কেহ নিহত হইয়াছেন, যেমন জাকারিয়া ও য়্যাহ্‌য়া ...... অতএব মোহাম্মদ যদি মরিয়া যান, মূছা ও ঈছা যেমন মরিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি যদি নিহত হন, জাকারিয়া ও য়্যাহ্‌য়া যেমন নিহত হইয়াছেন, তাহা হইলে তোমরা কি সত্যের বিপরীত মুখে ঘুরিয়া দাড়াইবে ?

মুছলমানের জাতীয় জীবনের আর একটা গুরুতর ঘটনার সহিত এই আয়তের ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে। এই আয়ত নাজেল হওয়ার দীর্ঘকাল পরে, হজরত মোহাম্মদ

মোস্তফার মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ সংবাদে মোস্তফাগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কতিপয় ছাহাবা, বিশেষতঃ হজরত ওমর, এই শোকে এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, 'হজরতের মৃত্যু হইয়াছে, একথা বিশ্বাস করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। হজরত ওমর ছাহাবাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—মোনাফেকদিগের মধ্যকার কতকগুলি লোক মনে করিতেছেন যে, হজরত মরিয়া গিয়াছেন। না, ইহা সত্য নহে, আল্লার দিব্য, হজরত মরেন নাই। তিনি আপন প্রভুর সন্নিধানে গমন করিয়াছেন, তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন—ইত্যাদি। এই ঘোর চাঞ্চল্যের সময় হজরত আবুবকর সেখানে উপস্থিত হইলেন, কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরভাবে বিবি আয়েশার হুজ্‌রায় প্রবেশ করিলেন এবং হজরতের মুখের চাদর তুলিয়া তাহাতে চুম্বন করিয়া সাশ্রু নয়নে বলিতে লাগিলেন—'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন, আল্লার দিব্য, আপনাকে দুইবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে না। আপনার জন্য যে মৃত্যু অবধারিত ছিল, তাহা অসিয়াছে আর আপনি মরিয়া গিয়াছেন। অতঃপর হজরত আবুবকর বাহির হইয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, ওমর তখনও নিজের বক্তব্য দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেছিলেন। আবুবকর তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিতে আদেশ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাম্‌দ না'আতের পর সকলকে সম্বোধন করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—'হে লোক সকল, যাহারা মোহাম্মদের পূজা করিত, তাহারা অবগত হউক যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছেন। আর তোমাদের মধ্যে আল্লার পূজা করিত যাহারা, তাহাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ চিরজীবন্ত, তাঁহার মৃত্যু নাই। অতঃপর আবুবকর জলদগম্ভীর স্বরে কোরআনের এই আয়তটী আবৃত্তি করিলেন—মোহাম্মদ একজন রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন,......কৃতজ্ঞতা পরায়ণ লোকদিগকে আল্লাহ তাহাদের কর্ম্ম-ফল শীঘ্রই প্রদান করিবেন। আবুবকরের মুখে এই আয়তের আবৃত্তি শুনিয়া সকলের মোহ কাটিয়া গেল, তাঁহারা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, আবুবকরের মুখে শ্রবণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আয়তটী যেন আর কখনও তাঁহারা শ্রবণই করেন নাই। (বোখারী, নাছাই, মনছুর প্রভৃতি)। আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়া আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—হে মোস্তফার সত্যকার স্থলাভিষিক্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খলিফা, তোমার আত্মার প্রতি আল্লার আশীর্ব্বাদ সহস্রধারে বর্ষিত হউক, তুমি উপস্থিত না থাকিলে অথবা চঞ্চল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলে, না জানি সে দিন এছলামের কি ভীষণ সর্ব্বনাশই না হইয়া যাইত !

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ "শাকের"দিগকে শীঘ্রই তাহাদের কর্ম্মফল প্রদান করিবেন। শাকের অর্থে শোকর-গোজার, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ। আল্লার যে নে'মত বা অনুগ্রহ তাহাদের প্রতি আছে, নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে যাহারা, শাকের বা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ বলিতে তাহাদিগকে বোঝায়। রিক্ত, মুক্ত ও অকৃত্রিম তাওহীদ-জ্ঞান এবং তাহার সাধনাই মুছলমানদিগের প্রতি আল্লার

প্রধান অনুগ্রহ এবং সেই তাওহীদকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও প্রকাশ করাতেই তাহার যথাযথ সম্মান করা হয়।

ফলতঃ এই আয়তে মুছলমানকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাওহীদ-সাধনার মূল লক্ষ্য হইতেছেন—আল্লাহ, রছুল সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষকে লক্ষ্যের আসনে বসাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

৩৬৮ মৃত্যুর সময় অবধারিত

মানুষকে, বিশেষতঃ সত্যসাধক মুছলমানকে, তাহার জীবন-মরণ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লার নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে মরিয়া যাওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। অধিকন্তু মৃত্যুর সময়ও আল্লার আদেশক্রমে পূর্ব্ব হইতে অবধারিত হইয়া আছে। সে সময়কে এড়াইয়া চলাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং 'মোহাম্মদ সত্য সত্যই নিহত হইয়াছেন' শুনিয়া তাহাদের বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া মরেন নাই। বরং মঙ্গলময় আল্লার নির্দ্দেশেই এন্তেকাল করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মৃত্যুর সময়কে পিছাইয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না, অতএব এ-মৃত্যুর জন্য তিনি একটুকুও দায়ী নহেন। মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, ইহাই যখন তোমাদের সাধনা ও সঙ্কল্প, তখন মোহাম্মদের মৃত্যু ঘটানই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাতে এমন বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া পড়ার কারণ কি ছিল?

পক্ষান্তরে তোমরা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে—মরণের ভয়ে। আল্লার নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন মানুষই মরিতে পারে না, এই সত্যটাকে সুদৃঢ়ভাবে হৃদ্‌গত করিয়া রাখিলে তোমরা বুঝিতে পারিতে যে, আল্লার আদেশ না হইয়া থাকিলে কাফেরদিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র একত্রেও তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার নির্দ্দেশ আসিয়া থাকিলেও দুন্‌য়ার কোন প্রান্তই তোমার জন্য নিরাপদ হইবে না, আজরাইলের অমোঘমুষ্টি সেখানেই তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। অন্যথায় দুন্‌য়ার ভীরু ও কাপুরুষরা সকলেই অমর হইয়া থাকিত। আল্লার হুকুম ব্যতীত বাঁচিব না, মরিবও না—এই বিশ্বাসই জেহাদের মূল শক্তি।

৩৬৯ জেহাদের স্বরূপ ও মর্য্যাদা

পররাজ্য-হরণের লালসা বা জাতীয়তার অভিমান দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করে যাহারা, অসুবিধা দেখিলেই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, উপস্থিত পরাজয়ের ফলে তাহাদের দেহ ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এবং শত্রুর নিকট অতি হীনভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা পায়। কিন্তু মুছলমানের অবস্থা স্বতন্ত্র। সত্যকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই তাহাদের জাতীয় জীবনের সাধনা, এবং এই সাধনার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্বকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকাতেই তাহার সার্থকতা। জয় পরাজয় বা জীবন-মরণের কোন সমস্যাই মোছলেম-মনের এই দুর্ব্বার সঙ্কল্পকে প্রতিহত করিতে

পারিবে না, ইহাই তাওহীদের শিক্ষা। আশু-পরাজয়ের কারণে সত্য গিয়া শয়তানের পদপ্রান্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

এই শিক্ষার নজীর হিসাবে বলা হইতেছে যে, জেহাদের এই অগ্নি-পরীক্ষা কেবল তোমাদের এই উম্মতের জন্য একটা অভিনব নির্দেশ নহে। তোমাদের পূর্ব্বেও বহু নবীর ও তাঁহাদের ভক্তগণের মাথার উপর দিয়া এই অগ্নিপরীক্ষার ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। এই নবীরা ও তাঁহাদের সঙ্গী রেব্বী (৭৯ আয়তের টীকা) বা প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লার এই পথে, অর্থাৎ জেহাদের এই সাধনাক্ষেত্রে, ভীষণ হইতে ভীষণতর বিপদ আপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে তাহারা শিথিল হইয়া পড়ে নাই, দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই, অথবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর সম্মুখে হেয়তা স্বীকার বা কাকুতি মিনতি করে নাই। আয়তে استكانوا শব্দ আছে। উহার ধাতুগত অর্থ—"অবনমিত হওয়া ও কাকুতি মিনতি প্রকাশ করা।" শত্রুর নিকট এইরূপ অবনমিত হওয়া এবং আত্মরক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করা মোছলেম মনোবৃত্তির বিপরীত কথা। মুছলমান সাধক এই শ্রেণীর সমস্ত হীন-মনোবৃত্তি হইতে নিজকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া রাখিবে, এই নজীরের শিক্ষা ইহাই।

৩৭০ গাজীদিগের প্রার্থনা

বিপদের সম্মুখীন হইয়া চাঞ্চল্য বা আকুলি-ব্যাকুলির কোন উক্তিই তাহারা প্রকাশ করে নাই। বরং জেহাদ-সাধনার মূলসাধ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা কেবলই প্রার্থনা করিয়াছে যে—প্রভু হে! জেহাদের অগ্নি-পরীক্ষা ও তাহার আপদ বিপদ যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়! আমাদের কৃত সব ত্রুটি বিচ্যুতিকে, সব পাপ ও অপরাধকে এবং সমস্ত অতিরিক্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে সেই আগুনে সংশোধিত করিয়া আমাদের জীবনকে পবিত্র, মহান ও কল্যাণ মণ্ডিত করিয়া তোল! সত্যসাধনার পথে আমাদের চরণগুলিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও, কোন অবস্থায় তাহা যেন কম্পিত বা স্খলিত না হয়! আর সত্যকে ধ্বংস করার জন্য যে-কাফের জাতি আমাদের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, আমাদিগকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়া দাও—তোমার নাম ও তোমার সত্যই যেন সকলের উপর পরাক্রান্ত হইয়া থাকিতে পারে।

জেহাদের প্রকৃত স্বরূপটা তাহারা চিনিতে পারিয়াছিল, তাই সেই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়াইয়া এই প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাই মুছলমানের সনাতন ও শাশ্বৎ আদর্শ। সাবধান, তোমরা ইহা হইতে স্খলিত হইও না!

৩৭১ পরকালের পুণ্যফল

১৪৪ আয়তে বলা হইয়াছে যে, যাহারা কেবল দুনয়ার পুণ্যফল লাভের সঙ্কল্প করিবে, দুনয়ার পুণ্যফলের মধ্য হইতে কিছু তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে। কিন্তু এক্ষণে বলা হইতেছে যে, জেহাদের স্বরূপকে পূর্ণভাবে হৃদগত করিয়া যাহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার মূল

সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিপদ আপদে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে, তুন্‌য়ার পুরস্কার তাহারা'ত সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবেই। আর তুন্‌য়ার পুরস্কার যতই অধিক হউক না কেন, পরকালের পুণ্যফলের তুলনায় তাহা নিকৃষ্ট। ফলতঃ পরকালের সেই উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর পুণ্যফলও তাহারা লাভ করিবে। তুন্‌য়ার পুরস্কার বলিতে মুছলমানের জাতীয় সম্মান, সম্পদ ও স্বাধীনতাকে, তাহাদের বিশ্ববিজয়ী প্রভাব পরাক্রমকে, তাহাদের স্বাধীন সাম্রাজ্যকে বুঝাইতেছে। আর পরকালের মহত্তম পুণ্যফল হইতেছে, বেহেশ্‌তের সেই কল্পনাতীত পরমানন্দ, আল্লার 'রেজওয়ান' ও সেই নয়নাভিরাম নে'মৎ—'কোন কর্ণ যাহা শ্রবণ করে নাই, কোন চক্ষু যাহা দর্শন করে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে যে নে'মতের কল্পনাও সম্ভবপর হয় নাই।'

আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে — والله يحب المحسنين বস্তুতঃ আল্লাহ ভালবাসেন 'মোহছেন'দিগকে। 'মোহছেন' এহ্‌ছান হইতে উৎপন্ন, যে এহ্‌ছান করে, সেই মোহছেন। এহ্‌ছান শব্দের তাৎপর্য্য তুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম—পরের উপকার করা, অন্য কাহারও প্রতি বিবেকের নির্দ্দেশে কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করা। এই ছুরার ১৩৪ আয়তে محسنين শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে অনুবাদ করিতে হইবে—বস্তুতঃ পরোপকারী লোকদিগকে আল্লাহ ভালবাসিয়া থাকেন। দ্বিতীয়—মানুষের নিজের কাজের সততা ও সঙ্গতিকে এহ্‌ছান বলা হয়। 'মানুষ যখন সৎ-জ্ঞান অর্জ্জন করে ও সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়' তখন তাহার এই ব্যক্তিগত সদ্ভাব ও সৎকর্ম্মকে 'এহ্‌ছান' বলা হয় (রাগেব প্রভৃতি)। এখানে 'মোহছেন' শব্দ এই অর্থে গৃহীত। অন্য-অনুবাদকরা উভয় স্থানে 'সৎকর্ম্মশীল' বলিয়া মোহছেন-শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

১৬ রুকু'

১৪৮ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ ۝

১৪৮ হে মোমেনগণ! তোমরা যদি সেই সমস্ত লোকের আজ্ঞারত হইয়া চল - যাহারা (সত্যকে) অমান্য করিয়াছে, (তাহা হইলে) তোমাদিগকে তাহারা ফিরাইয়া দিবে পশ্চাৎ মুখে, ফলতঃ (লাভের পরিবর্ত্তে) তোমরা হইয়া পড়িবে ক্ষতিগ্রস্ত[৩১২]।

১৪৯ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ۝

১৪৯ কখনই না, আল্লাই তোমাদের একমাত্র সহায়, বস্তুতঃ তিনিই হইতেছেন সাহায্যকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

১৫০ سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ۝

১৫০ আল্লার সহিত কাফেরদিগের এই যে শের্ক—যাহার সমর্থনে কোনই ছনদ[৩১৩] তিনি প্রকাশ করেন নাই—ইহার ফলে আমরা তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দেই[৩১৪]; আর তাহাদের আশ্রম হইতেছে (নরকের) অগ্নি; বস্তুতঃ অত্যাচারীদিগের অধিবাস কতইনা মন্দ।

১৫১ আর আল্লাহ্ তোমাদিগের সমীপে নিজের ওয়াদাকে নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন—যখন তাহাদিগকে তোমরা নিঃশেষে নিহত করিয়া যাইতেছিলে - তাঁহার নির্দ্দেশ-ক্রমে, যাবৎনা তোমরা কাপুরুষতা প্রকাশ করিলে ও (রছুলের) আজ্ঞা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধ ঘটাইলে এবং (অবশেষে সেই আজ্ঞাকে) অমান্য করিয়া বসিলে — তোমাদের অভিপ্রেত (বিজয়) কে তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করার পরে; তোমা-দিগের মধ্যে এরূপ লোক ছিল যাহারা চাহিতেছিল দুনয়াকে, আর তোমাদিগের মধ্যে এরূপ লোকও ছিল যাহারা চাহিতেছিল পরকালকে, অতঃপর তোমা-দিগকে তিনি তাহাদিগের দিক হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন—তোমাদিগকে পরীক্ষিত করিয়া লওয়ার জন্য, আর তোমাদিগের অপরাধগুলিকে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন মোমেনগণের প্রতি প্রসাদ-শীল।

١٥١ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৫২ আর (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) দূরে প্রস্থান করিতেছিলে

١٥٢ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى

أَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْٓ أُخْرٰىكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

এমন (বিহ্বল) অবস্থায়, যে, অন্য কাহারও পানে ফিরিয়া দেখিতে (পারিতে-) ছিলে না —অথচ রছুল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছিল তোমাদিগের পশ্চাৎ দিকে[৩৭৯]! ফলে আল্লাহ তোমাদিগকে (ইহার) প্রতিফল দিলেন, মনস্তাপের পর মনস্তাপ—কারণ, যে (সম্পদ) হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে অথবা যে (বিপদে) তোমরা পতিত হইবে, তাহার ফলে তোমরা যেন আর কখনও অবসন্ন হইয়া না পড় ; আর (সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে) আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্যকরূপে অবগত[৩৮০]।

১৫৩ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ

১৫৩ অতঃপর এই সব মনস্তাপের পরে তোমাদিগের প্রতি অবতারণ করিলেন এক শান্তি-তন্দ্রা[৩৮১], যাহা তোমাদিগের মধ্যকার একদলকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল, আর অন্যদলটী[৩৮২], তাহাদিগকে বিমর্ষ করিয়া ফেলিয়াছিল — আত্মচিন্তা, তাহারা তখন আল্লাহ্

مِنْ شَىْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ
لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا
قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى
مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا
فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

সম্বন্ধে ধারণ করিতেছিল অজ্ঞতার ধারণা ; তাহারা বলিতেছিল—এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু আছে !—বলিয়া দাও — সমস্ত ব্যাপার আল্লারই অধিকারভুক্ত ; — ইহারা মনে যে ভাবটী লুকাইয়া রাখিতেছিল, তোমার কাছে তাহা প্রকাশ করিতেছিল না ; তাহারা (মনে মনে) বলিতেছিল, এ-ব্যাপারে আমাদের যদি কিছু অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে (পড়িয়া) নিহত হইতাম না ; বলিয়া দাও—তোমরা যদি নিজেদের গৃহের মধ্যেও অবস্থান করিতে, (তাহা হইলেও) নিহত হওয়াই যাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই নিজ নিজ বধ্যভূমির পানে বাহির হইয়া আসিত,[১৮৩] আর (অন্যদিক দিয়া বিশেষ কথা এই যে—এই সব বিপদদ্বারা) তোমাদের অন্তরের বিষয়গুলিকে তিনি পরীক্ষিত করিয়া লইবেন, এবং তোমাদের হৃদয়ের বিষয়গুলিকে তিনি পরিশোধিত করিয়া দিবেন[১৮৪] ; আর আল্লাহ্ (মানুষের) হৃদয়ের সবকিছুই সম্যকভাবে অবগত ।

১৫৪ দুই (যুযুধান) দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল যে দিন, সে দিন তোমাদিগের মধ্যকার যে সব লোক (যুদ্ধ হইতে) পরাঙ্মুখ হইয়াছিল (তাহাদের এই কার্য্যের) একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের অর্জ্জিত কোন কোন (অন্যায়ের) দ্বারা শয়তান তাহাদিগকে স্খলিত করিতে চাহিয়াছিল, বস্তুতঃ তাহাদের অপরাধগুলি আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ন, ধৈর্য্যশীল[৩৭৫]।

১৫৪ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۠

---

*টীকা :—

৩৭২ পরজাতির বশ্যতা স্বীকার

এতাআৎ শব্দের অর্থ—কাহারও আদেশ পালন করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা আজ্ঞাবহ হইয়া চলা। এখানে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমাদের রছুলের মারফতে প্রকাশিত এছলামের সত্যকে অমান্য করিয়াছে যাহারা, তাহারা আজ তোমাদিগের উপর আপতিত হইতেছে, এই সত্যটাকে দুনয়া হইতে লোপ করিয়া দেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় মুছলমান যদি সেই সব বিধর্ম্মীর নিকট আত্মসমর্পণ করে অথবা তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে ইহাদ্বারা তাহাদের কোন লাভ'ত হইবেই না, বরং তাহারা সর্ব্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

এই ক্ষতির পরিচয় দিয়া বলা হইতেছে যে, কাফেরদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিলে, তাহারা মুছলমানকে পশ্চাতের দিকে ফিরাইয়া দিবে। কোরআনের আলোকে এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষার কল্যাণে, মুছলমান অল্প কএক বৎসরের মধ্যে সকল প্রকার উৎকর্ষ ও উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কাফেরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাহারা সেই অগ্রগতির পথকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিয়া দিবে। মুছলমান তখন অতীতের সেই জ্ঞানগত ও কর্ম্মগত

অনাচার গুলির মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। এ অবস্থায় তাহার পরকাল পণ্ড হইবে ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী গ্লানীতে, ইহকাল নষ্ট হইবে দাসত্বের অপরিহার্য্য অভিশাপে।

পরবর্ত্তী (১৪৯) আয়তটী ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মুছলমান পরজাতির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে যায় কোন্ দুর্ব্বল মানসিকতার ফলে, আয়তে তাহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সর্ব্বদাই আবশ্যক হয় সুদৃঢ় ঈমানের এবং আল্লার উপর অবিচলিত নির্ভরশীলতার। এই ঈমান ও নির্ভরশীলতা যখন দুর্ব্বল হইয়া আসে, মুছলমান তখন পরজাতির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে যায়—তাহাদের অনুগ্রহে বিপদের ভীষণতা হইতে আশু রক্ষা পাওয়ার ভ্রান্ত আশায় প্রবঞ্চিত হইয়া। কিন্তু মুছলমান-হিসাবে তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদের একমাত্র সহায় হইতেছেন আল্লাহ। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। মুছলমান ফলাফলের জন্য তাঁহারই সহায়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সকল অবস্থায় নিজের কর্ত্তব্য দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া যাইবে, পরজাতির বশ্যতা কখনও স্বীকার করিবে না—ইহাই আয়তের শিক্ষা।

৩৭৩ ছোলতান—ছনদ

আয়তের এই অংশে বলা হইতেছে যে, আল্লার সহিত গয়রুল্লাহ্‌কে শরীক বানাইয়া লওয়ার এই যে অনাচার, ইহার সমর্থনে আল্লার দেওয়া কোন 'ছোলতান' নাই। আমি অগত্যা ছোলতান-শব্দের অনুবাদ করিয়াছি 'ছনদ' বলিয়া। কিন্তু শব্দের সব ভাব ইহাদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে না—বিশেষতঃ 'সনদ'-শব্দের বর্ত্তমান বাঙ্গলা ব্যবহার অনুসারে। ইংরাজীর authority, 'ছোলতানের' প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া আমার মনে হয়।

কোন কাজ করা না-করার অথবা কোন বিশ্বাস পোষণ করা না-করার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি প্রতিপাদিত হয়, আল্লার দেওয়া দুইটী authority বা সনদের নির্দ্দেশ অনুসারে। ইহার প্রথম ও প্রধান আল্লার কেতাব, দ্বিতীয় আল্লার দেওয়া মানুষের জ্ঞান ও বিবেক। মানব সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে এ যাবৎ বিভিন্ন যুগে দুনয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে আল্লার যে সব নবী সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও শিক্ষার কুত্রাপি শের্ক বা অংশীবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং এই মহাপাতকের প্রতিবাদই তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মানুষের সুষ্টু জ্ঞান ও মুক্ত-বিবেকও এ নির্দ্দেশ কখনই দিতে পারে না যে, মানুষ সৃষ্টির কোন বিষয় বা বস্তুকে স্রষ্টার সত্তার বা শক্তির অংশীরূপে গ্রহণ করুক। ফলতঃ শের্ক বা অংশীবাদের সমর্থনে কোন দিকের কোন ছোলতান, ছনদ বা authority তাহাদের নাই।

৩৭৪ শের্কই দুর্ব্বলতার মুল কারণ

আয়তের প্রথমে سنلقي ছানুল্‌কী শব্দ আছে। নুল্‌কী-ক্রিয়াপদের প্রথমে ছিন-উপসর্গ থাকায় অনুবাদক ও টীকাকারকগণের মধ্যে অনেকেই উহার তাৎপর্য্য করিয়াছেন সত্বর বা শীঘ্র বলিয়া। আমরা "সত্বরই কাফেরদিগের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিব"—

মোটের উপর ইহাই তাঁহাদের অনুবাদের সাধারণ ধারা। মোজারে'-ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ছিন-উপসর্গ আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অদূর ভবিষ্যৎ বা مستقبل قريب অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের যুক্তি।

তফছিরকারগণ বলিতেছেন—ওহোদ যুদ্ধের বা তাহার পরবর্ত্তী দিনের অবস্থা সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হইতেছে। কিন্তু পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, ইহার পূর্ব্বের ও পরের সমস্ত প্রাসঙ্গিক আয়তে ওহোদ-যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান ও তাহার সমালোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়তগুলি যে ওহোদ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

আমার মতে ছিন-উপসর্গের ঐ প্রকার ভবিষ্যৎবাচক অর্থ গ্রহণ করা এখনে সঙ্গত হইবে না। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে তাহার কোন দরকারও নাই। প্রথমতঃ ছিন-বর্ণের ঐ প্রকার তাৎপর্য্য বৈয়াকরণরা সকলে স্বীকার করেন নাই। তাহার পর, যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও একথা বলেন নাই যে, সর্ব্বত্রই ছিন-বর্ণের ঐ তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে। জওহারী বলিতেছেন—

قد تخلص الفعل للاستقبال - و زعم الخليل انه جواب لن

ফারায়েদুল্-লোগাৎ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—

(و السين) فی الاثبات مقابلة للن فی النفی و لهذا قد تستعمل للتاكيد من غير قصد الی معنی الاستقبال -

আকরাবুল-মাওয়ারেদ নামক অভিধানে বলা হইয়াছে :—

و ذهب قوم الی انها قد تاتی للاستمرار لا للاستقبال

এই সমস্ত উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম্ম এই যে :—

(১) ছিন-বর্ণ মধ্যে মধ্যে ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সর্ব্বত্র হয় না।

(২) মধ্যে মধ্যে تاكيد বা নিশ্চয়তার ও ক্রিয়াপদের continuity বা ধারাবাহিকতা প্রকাশ করার জন্যও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই হিসাবে আমি অনুবাদ করিয়াছি—"আমরা তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিতে থাকিব।"

এক দিনের কোন একটা ঘটনা সম্বন্ধে অথবা কোন এক সময়ের কাফেরদিগের সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলা হয় নাই। বস্তুতঃ একটা সর্ব্বব্যাপী স্বাভাবিক সত্যের ও শাশ্বৎ নিয়মের কথাই এখানে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। মুছলমানের সহায় ও তাহার শক্তির মূলকেন্দ্র আল্লাহ, মুছলমান নির্ভর করিবে তাঁহারই উপর। তাঁহারই আদেশ অনুসারে মুছলমানের জেহাদ। সে বাঁচিবে সত্যের জন্য, মরিবে সত্যের জন্য, ইহাই তাহার শিক্ষা। সুতরাং জেহাদের ময়দানে জয়ের ন্যায় তাহার পরাজয়ও সার্থক, জীবনের ন্যায় তাহার মরণও সফল। একদিকের এই ভাব,

অন্য দিকে তাহাদের সহিত মোকাবেলা করিতে আসিতেছে যাহারা, দুনয়ার এই জয়-পরাজয় বা জীবন-মরণকেই তাহারা শেষকথা বলিয়া মনে করে। জ্ঞানের আলোক বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাহাদের নাই। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়া তাহারা প্রকৃত শক্তিকেন্দ্রের সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা শক্তির সাধনা করিতে চাহিতেছে, শক্তিহীন অচেতন জড়পদার্থগুলিকে অবলম্বন করিয়া, নিজেদের মনের অন্ধকার ও ভ্রান্তসংস্কার-প্রসূত কাল্পনিক দেবদেবীদিগের শরণ লইয়া। এ অবস্থায়, বিশেষতঃ তাওহীদের সেবক মুছলমানদিগের মোকাবেলায়, তাহাদের অন্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক কথা। ফলতঃ শের্কই যে মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ, এই সাধারণ সত্যটাকে এখানে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুছলমান সমাজ এই শের্কের অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া এবং তাওহীদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখনই আল্লার নামে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, মোশ্‌রেক জাতিরা লোক-বলে ও অস্ত্র-বলে তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে বলবান হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাহাদের মোকাবেলায় তিষ্ঠিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাসের সত্য। বিশেষতঃ হজরত রছুলে করিম ও ছাহাবাগণের সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩৭৫ আল্লার ওয়াদা

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মক্কায় অবস্থানকালে যখন মুছলমানরা চরমভাবে উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইতেছিলেন, পার্থিক হিসাবে যখন তাঁহাদের উদ্ধারের ও রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় বিদ্যমান ছিল না, সেই সময় আল্লাহ কোরআনে তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, ঈমানে দৃঢ় হইয়া ও রছুলের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিলে তাহারা আল্লার সাহায্য লাভ করিবে, শত্রুদিগের উপর জয়যুক্ত হইবে। জেহাদের আদেশ প্রদানের ও তাহার পুরস্কারগুলির বর্ণনা করার পর ছুরা 'ছফে' বলা হয়—

و اخرى تحبونها ، نصر من الله و فتح قريب - و بشر المؤمنين

আর এই জেহাদের ফলে "তোমরা আর একটা বস্তুলাভ করিবে, যাহা তোমাদের অভিপ্রেত— আল্লার পক্ষ হইতে সাহায্য ও অদূরভবিষ্যতের বিজয়, হে মোহাম্মদ! তুমি মোমেনদিগকে এই সুসংবাদ দিয়া রাখ" (ছফ—২য় রুকু)। এই শ্রেণীর ওয়াদার কথাই এখানে বলা হইতেছে।

৩৭৬ আল্লার ওয়াদা পূর্ণ হইল

উপরে আল্লার যে ওয়াদার কথা বলা হইয়াছে, ওহোদ যুদ্ধেও তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। লোক-বলে ও অস্ত্র-বলে কোরেশ-বাহিনীর মোকাবেলায় মুছলমানদিগের শক্তি ছিল একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই অস্ত্রশস্ত্রহীন মুষ্টিমেয় মুছলমানের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে বিরাট কোরেশ-বাহিনীকে অল্প সময়ের মধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

সম্মুখ সমরে এক একজন গাজীর আক্রমণে বহু কোরেশ-সৈন্য ধরাশায়ী হইয়া পড়িতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রুপক্ষ নিজেদের প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে আল্লার ওয়াদা বাস্তবে পরিণত হইয়া গেল। কিন্তু এই বিজয়লাভের পর মুছলমানদিগের একদলের মনে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িল, লুটের মাল সংগ্রহ করার লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইহার ফলে রছুলের আদেশ সম্বন্ধে ঘাটিরক্ষক তীরন্দাজ-সৈন্যদের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত হইল। এই সময় অধিকাংশ তীরন্দাজ বলিতে লাগিলেন—এখানে বসিয়া থাকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ এখন শেষ হইয়াছে, আমরা বিজয়ী হইয়াছি। অতএব এখানে বসিয়া থাকার এখন আর কোন দরকার নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নায়ক আবদুল্লাহ-এবনে-জোবের এবং তাঁহার সমমতাবলম্বী কএকজন তীরন্দাজ বলিতে লাগিলেন—হজরতের স্পষ্ট আদেশ, 'জয় হউক পরাজয় হউক, আমার দ্বিতীয় নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই এই ঘাটি ত্যাগ করিবে না।' অতএব এ অবস্থায় নিজেদের স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। আয়তে এই মতবিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশেষে কএকজন ব্যতীত অন্য সমস্ত তীরন্দাজই ঘাটি ছাড়িয়া চলিয়া যান। এইরূপে তাঁহারা 'রছুলের আদেশকে অমান্য' করিয়াছিলেন। আয়তে বলা হইতেছে যে, এই দুর্ব্বলতা ও আত্মবিরোধের প্রশ্রয় না দেওয়া এবং রছুলের আদেশ অমান্য না করা পর্য্যন্ত আল্লার ওয়াদা পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল।

৩৭৭ দুই দলের পৃথক দৃষ্টি

লুটের মালের অংশ লওয়ার জন্য যাঁহারা ঘাটি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, দুন্‌য়ার লাভকেই তাঁহারা তখন বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যে কয়জন তীরন্দাজ তখন রছুলের আদেশের সম্মানরক্ষার জন্য ঘাটিতে বসিয়া অনুপম বীরত্বসহকারে নিজদিগকে কোরবান করিয়াছিলেন, পার্থিবজীবনের সুখ-সম্পদ তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পরকাল।

৩৭৮ দুর্ব্বলতার সংশোধন

পূর্ব্বে মুছলমানরা কাফেরদিগকে নিহত করিতেছিলেন, ফলে তাহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিল। তীরন্দাজ-সৈন্যদিগের স্বেচ্ছাচারের ফলে সমর-ক্ষেত্রের পটপরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং কাফেররা তখন মুছলমানদিগকে নিহত করিতে লাগিল, আর মুছলমানরাই তখন পলাইয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিল। এই বিপর্য্যয়ের মূলে ছিল তীরন্দাজদের নিয়মনিষ্ঠার অভাব এবং এই অভাবের কারণ ঘটিয়াছিল পার্থিব ধনসম্পদের প্রলোভনে। কিন্তু এই অপকর্ম্মের ভীষণ পরিণামের মধ্য দিয়া নিজেদের ভ্রান্ত-মানসিকতার অভিশাপকে তাঁহারা সম্যকভাবে বুঝিয়া লইলেন, অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিতে তাঁহাদের মনোপ্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লোভের,

আত্মবিরোধের, নিয়মভঙ্গের এবং সেনাপতির আদেশ অমান্য করার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহার বাস্তব পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা সাবধান হইলেন। এইরূপে, এই বিপদের দ্বারা তাঁহাদের মনের দোষত্রুটীগুলিকে আল্লাহ সংশোধিত করিয়া দিলেন। আয়তে ইহাকেই 'এব্‌তেলা' বলা হইয়াছে। এখানেও আমরা অগত্যা "পরীক্ষা" বলিয়া উহার অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের জন্য ১১২ টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯ দুর্ব্বলতার পরিণাম

তীরন্দাজ সৈন্যগণ ঘাটি ত্যাগ করিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক কোরেশ-সেনাপতি সেই পথে পশ্চাৎদিক দিয়া মুছলমানদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিল। অই আক্রমণের ফলে মুছলমানরা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এই সময় সমর-ক্ষেত্রে তিষ্ঠিয়া থাকা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। এমন ভীতিবিহ্বল অবস্থায় তাঁহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে দূরে পলায়ন করিতে লাগিলেন যে, অন্য মুছলমানদিগের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসরও তাঁহাদের হয় নাই। আয়তের প্রথমভাগে এই দলের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

অবশিষ্ট ছাহবাগণের মধ্যকার অনেকেই তখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শত্রু সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা অশেষ দৃঢ়তা ও অনুপম বীরত্বের পরিচয় দিতেছিলেন সত্য। কিন্তু কেন্দ্রের সন্ধান না পাওয়ায় ছত্রবদ্ধ শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছিল না। হজরতের কাছে তখন অবস্থান করিতেছিলেন গণিত কএকজন মাত্র বীর নরনারী। এই সময় একদল কোরেশ সৈন্য একত্র হইয়া তাহাদের সমবেত আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করিল হজরতের উপর। কিন্তু মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফার বীর-হৃদয় এই কল্পনাতীত বিপদেও এক বিন্দু বিচলিত হইল না। চাঞ্চল্যহীন ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মুছলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তখন তিনি বলিতেছিলেন—

الیّ عباد الله ! الیّ عباد الله ! انا رسول الله !

"আমার কাছে আইস, হে আল্লার বান্দাগণ আমার কাছে আইস! আমি আল্লার রছুল!" আয়তের প্রথম অংশে এই সব ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, হজরতের আহ্বান কাণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাহাবাদিগের মনে নূতন প্রেরণার উদ্রেক হইল, সকলে তাঁহারা সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন এবং পুনরায় ছত্রবদ্ধ হইয়া কোরেশদিগের আক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

৩৮০ পরাজয়ের সার্থকতা

আল্লার সৃষ্টি-রাজ্য অপরিহার্য্য নিয়ম পরম্পরার অধীন। এখানে মানুষ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার অনুরূপ ফলাফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। ওহোদ যুদ্ধের এই সব

ব্যাপারেও আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের কর্ম্মের প্রতিফল দিলেন—তোমরা মনস্তাপের পর মনস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলে। রছুলের আদেশ অমান্য করার জন্য মনস্তাপ, বিজয় লাভের পর এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার জন্য মনস্তাপ, বহু আত্মীয় স্বজনের নিহত হওয়ার জন্য মনস্তাপ, একদল লোকের কাপুরুষতার জন্য মনস্তাপ—আর সর্ব্বোপরি মনস্তাপ স্বয়ং হজরত রছুলে করিমের আহত হওয়ার জন্য। কিন্তু এই কর্ম্ম ও তাহার প্রতিফল এবং তজ্জনিত তোমাদের মনস্তাপ ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া তোমরা মনে প্রাণে এই শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে যে, কোন সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া অথবা কোন বিপদে পতিত হইয়া অবসন্ন ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়া, মুছলমানের পক্ষে কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। এই শিক্ষার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে, ইহাই আল্লার উদ্দেশ্য। সম্পদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তীরন্দাজ সৈন্যগণ, আর বিপদে পতিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন পলায়নপর মুছলমানগণ। সংক্ষেপে, সম্পদের প্রলোভন বা বিপদের বিভীষিকা মুছলমানকে তাহার কর্ত্তব্যসাধনা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না, ওহোদের বাস্তব নজীরের মধ্য দিয়া এই শিক্ষাটাকে মুছলমানের ঈমানে পরিণত করিয়া দেওয়াই আয়তের উদ্দেশ্য।

অকৃতকার্য্যতার ভিত্তির উপর সফলার গৌরব-সৌধ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এরূপ কথা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কিন্তু এই কথাটী সত্য হয় তখন, নিজেদের অকৃতকার্য্যতার কার্য্য-কারণ লইয়া যখন আমরা আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হই, সেই কারণস্বরূপ নিজেদের দোষ দুর্ব্বলতাগুলির জন্য অনুতপ্ত হই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া লই। ওহোদ যুদ্ধের বিফলতাকে ছাহাবারা ভাবী সফলতার ভিত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন এইরূপে। পরাজয়ের এই সার্থকতার কথাই আয়তে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৮১ **শান্তি-তন্দ্রা।**

উপরে বলা হইয়াছে যে, হজরতের আহ্বান শ্রবণ করিয়া বহু মুছলমান আবার কেন্দ্রে সমবেত হইলেন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিয়া কোরেশদিগের দ্বিতীয় আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বিপদের প্রকৃত কারণকে বুঝিতে পারিয়া, সেজন্য অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুনরায় কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ও তাহার আশু-সুফলকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই দলের মুছলমানদিগের মনে শান্তির ভাব আসিল। এই সময় তাঁহারা امنة نعاسا বা শান্তিতন্দ্রা কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। امنة অর্থে আমন বা শান্তি, নোয়াছ অর্থে তন্দ্রা। কাহার কাহার মতে এখানে امنة نعاسا অর্থে السكون و الهدو স্থিরতা ও নিরুদ্বেগভাবকে বুঝাইতেছে (রাগেব)। কাফের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাওয়ার বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ের অবস্থা এখানে বর্ণনা করা হইতেছে। উদ্বেগ, বিজয়, নিয়মভঙ্গ, বিক্ষেপ, বিপদ

প্রভৃতিদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের ঘণ ঘণ পটপরিবর্ত্তনে, হজরতের নিহত হওয়ার সংবাদে, এবং কঠোর সাধনার দ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভের ফলে, অশেষ উত্তেজনা ও পরিশ্রমের পর মুছলমানদিগের অন্তরে শান্তির উদ্রেক হইল, এবং এই শান্তির ফলে তাঁহাদের অনেকেই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইহাকেই আয়তে 'শান্তিতন্দ্রা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ওহোদ যুদ্ধে মুছলমানদিগকে যে অসাধারণ মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করিতে হইয়াছিল, বিশেষতঃ যেরূপ আশাতীতভাবে তাঁহারা আশুধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার পর এইরূপ ক্লান্তি ও শান্তিজনিত তন্দ্রার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

৩৮২ **অন্যদলটী**

এখানে দ্বিতীয় দল বলিতে মোনাফেক বা কপট দলকে বুঝাইতেছে—ইহাই তফছিরকারগণের সাধারণ অভিমত। কিন্তু আমরা এই মতকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মতে, দ্বিতীয় দল বলিতে এখানে মুছলমানদিগের মধ্যকার সেই দলটীকে বুঝাইতেছে, যাঁহারা যুদ্ধের বিভিন্নস্তরে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ—

(১) আবদুল্লাহ-এবনে-উবাই তিনশত মোনাফেককে লইয়া পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মোনাফেক দল যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, ইহা নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে।

(২) আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইতেছে যে, তোমাদের মধ্যকার একটী দল শান্তিতন্দ্রাদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আর অন্য দলটী আত্মচিন্তায় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে এখানে "অন্য দল" বলিতে মুছলমানদিগের অপর দলটীকেই বুঝাইতেছে।

(৩) আয়তের উপসংহারে এই 'দ্বিতীয় দলকে' সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের মনের দোষ দুর্ব্বলতাগুলিকে দূর করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের অন্তরের ভাবগুলিকে সংশোধিত করিয়া লওয়াই আল্লার উদ্দেশ্য। এই এব্‌তেলা বা 'পরীক্ষা' ও সংশোধন কেবল মুছলমানদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

(৪) ১৫৫ আয়তে মোনাফেকদিগের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, ওহোদ যুদ্ধের সময় মুছলামনদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর মোমেনদিগের ঈমান ছিল পর্ব্বতের মত অটল। সম্পদে, বিপদে, জয়ে, পরাজয়ে, জীবনে, মরণে কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারের দুর্ব্বলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শান্তি-তন্দ্রা কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিলেন, এই শ্রেণীর ছাহাবারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুছলমানরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল-চিত্ত। লুটের লোভে হজরতের কঠোর আদেশকে অমান্য করিয়া এবং প্রাণের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়া, তাঁহারা সাময়িকভাবে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল বলিতে ইঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। আল্লাহ ইঁহাদের অপরাধগুলিকে

ক্ষমা করিয়াছেন এবং 'পরীক্ষার' দ্বারা ইঁহাদের অন্তরের দোষ দুর্ব্বলতাগুলির সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয়, কপট বা মোনাফেক দল। ইহারা রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে নিজদিগকে মুছলমানরূপে প্রকাশ করিত, লাভের ভাগ লওয়ার সময় সকলের আগে আসিয়া, দাঁড়াইত, এবং পরীক্ষার আভাস পাইলে দূরে সরিয়া যাইত। শত্রুদিগের সহিত গুপ্তষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া, মুছলমানদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতার উদ্রেক বা অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় থাকিত। ১৫৫ আয়তে ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই তিন শ্রেণীর লোক মুছলমাদিগের মধ্যে চিরকালই বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

আলোচ্য অংশের এক স্থানে বলা হইতেছে, দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিল যাহারা, তাহারা বলিতেছিল— এ ব্যাপারে আমাদের যদি কিছু (অধিকার) থাকিত, তাহা হইলে আমরা **এখানে** (পড়িয়া) নিহত হইতাম না। সুতরাং মুছলমানরা নিহত হইয়াছিলেন যেখানে, এই কথাগুলি যে ওহোদের সেই সমরক্ষেত্রেই উক্ত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, মোনাফেক দল সেখানে উপস্থিত ছিল না, এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় নাই। সুতরাং এই আয়তগুলি একদল মুছলমান সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে।

এখানে বলা হইতেছে যে, এই দলের মুছলমানরা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, এই সব বিপদ ও দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের হাত'ত কিছুই নাই। বিজয়ী বা পরাজিত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লার হস্তগত। অর্থাৎ তিনি সাহায্য করিলে আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? তাঁহারা হজরতের সম্মুখে প্রকাশ্যতঃ এইটুকু বলিতেছিলেন। কিন্তু ইহার অন্তরালে লুকাইয়ছিল একটা অজ্ঞজনোচিত মানসিকতা। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, বদর যুদ্ধের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও যদি আল্লার সাহায্য আসিত, তাহা হইলে আমাদিগকে এখানে এমন নির্ম্মমভাবে নিহতে হইত হইত না। ফলতঃ "আল্লার সাহায্য" সম্বন্ধে তাঁহারা যে ধারণা পোষণ করিতেছিলেন, তাহাকেই অজ্ঞতার ধারণা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, শক্তির মূলকেন্দ্র ও বিজয় প্রদানের প্রকৃত মালেক যে আল্লাহ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আল্লার ন্যায়-রাজ্যের অপরিহার্য্য বিধান এই যে, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের প্রকাশ হয়, তাহার উপযোগী অবদানকে অবলম্বন করিয়া। আল্লার নিকট হইতে শক্তি ও বিজয়লাভের জন্য তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার দরকার। তাঁহার প্রদত্ত ফল সর্ব্বদাই কর্ম্মসাপেক্ষ। সেখানে ত্রুটী ঘটাইয়া আল্লার সাহায্য না পাওয়ার জন্য ক্ষেদ বা অভিমান প্রকাশ করিতে থাকিবে, ইহা অজ্ঞতার কথা।

৩৮৩ অজ্ঞতার ধারণা

উপরে যে অজ্ঞতার ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রের কঠোর অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই শ্রেণীর ধারণাগুলিকে মুছলমানের মন ও মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেওয়া

এবং তাহাদের অন্তরগুলিকে এই সব দুর্ব্বলতার ভাব হইতে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলাই এই বিপদের একটা মহান সার্থকতা। মদীনায় সে সময় যে দুর্ব্বার শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকে চিরস্থায়ীভাবে সর্ব্ববিজয়ী করার জন্য শুধু বিজয়ের উল্লাসই যথেষ্ট হইত না। সে জন্য পরাজয়ের অভিজ্ঞতার দরকার ছিল, সে কেন্দ্রের কর্ম্মীদের আত্মশুদ্ধির জন্য পরীক্ষার বজ্রদাহেরও আবশ্য ছিল। আয়তের শেষভাগে বিশ্ব-মোছলেমকে এই সত্যটী স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

৩৮৪ ভয় ও লোভ

তীরন্দাজ সৈন্যরা লোভের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের অর্জ্জিত এই লোভের দ্বারা শয়তান তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ভয়ে। তাঁহা-দিগকে স্খলিত করার জন্য এই ভয়ই ছিল শয়তানের অবলম্বন। অতএব ভয় আর লোভকে বর্জ্জন করাই মোছলেম মোজাহেদের প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

১৭ রুকু

১৫৫ হে মোমেনগণ! তোমরা যেন সেই সমস্ত লোকের মত হইয়া যাইও না - যাহারা অমান্য করিয়াছে এবং, তাহাদিগের ভ্রাতৃবর্গ প্রবাসে গমন করিলে অথবা গাজী-রূপে (বহির্গত) হইলে, যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে ঃ— আমাদের কাছে থাকিলে ইহারা মরিতও না, নিহতও হইত না, যেহেতু আল্লাহ ইহাকে তাহাদিগের অন্তরে অনুশোচনায় (পরিণত) করিয়া দিবেন ; বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাই জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন ; আর আল্লাহ হইতেছেন তোমাদিগের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সম্যক্‌দ্রষ্টা।

১৫৫ يَـا يُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ◎

১৫৬ বস্তুতঃ তোমরা যদি আল্লার পথে নিহত হও অথবা মরিয়া যাও, তাহা হইলে আল্লার নিকট হইতে (সমাগত) ক্ষমা ও করুণা —কাফেরদিগের সমস্ত সঞ্চয় অপেক্ষাও উত্তম।

১৫٦ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ◎

১৫৭ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

১৫৭ আর তোমরা যদি মরিয়া যাও বা নিহত হও (সকল অবস্থাতেই) তোমাদিগের সকলকেই সমবেত করা হইবে আল্লার পাঁনে।

১৫৮ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

১৫৮ (হে মোহাম্মদ !) আল্লার করুণা বশতই'ত তুমি তাহাদিগের প্রতি কোমল হইয়াছ — বস্তুতঃ তুমি যদি রূঢ়, কঠিনহৃদয় হইতে, তাহা হইলে তোমার পরিপার্শ্ব হইতে তাহারা নিশ্চয়ই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত — অতএব তুমি (নিজেও) তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিবে, আর (আল্লার হুজুরেও) তাহাদিগের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং এই সমস্ত ব্যাপারে তাহাদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে, অতঃপর কোন কার্য্য সমাধা করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে যখন - তখন নির্ভর করিবে আল্লার উপর ; নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীল লোকদিগকে প্রেম করেন।

১৫৯ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ

১৫৯ (হে মোমেনগণ !) আল্লাহ যদি তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের উপর পরাক্রান্ত (হওয়ার) কেহই থাকিবে না, আর তিনিই যদি

تَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

তোমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে কে আছে এমন (-শক্তিমান) যে, তৎপরে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে ? বস্তুতঃ একমাত্র আল্লার উপর নির্ভর করাই'ত মোমেনদিগের কর্ত্তব্য[৩৯০]।

١٦ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ط وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১৬০ খিয়ানৎ[৩৯১] করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না ; বস্তুতঃ খিয়ানৎ করে যে ব্যক্তি, কিয়ামতের দিনে নিজকৃত খিয়ানৎকে সে নিজেই লইয়া আসিবে, অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ-কৃতকর্ম্মের ফল পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে, আর কেহই তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।

١٦١ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১৬১ অতএব আল্লার সন্তোষের অনুগামী হইয়া চলে যে ব্যক্তি, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হইতে পারে - নিজকে যে ব্যক্তি আল্লার অসন্তোষভাজন বানাইয়া লইয়াছে এবং জাহান্নম হইতেছে যাহার আশ্রম ? বস্তুতঃ ইহা হইতেছে অতি মন্দ অধিবাস !

১৬২ আল্লার সমীপে তাহারা হইতেছে বিভিন্ন স্তরের লোক ; বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যকদ্রষ্টা ।

١٦٢ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ◎

১৬৩ নিশ্চয় আল্লাহ মোমেনদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন - যখন তিনি তাহাদিগের মধ্যে তাহাদের নিজেদের (এমন) একজনকে রছুল-রূপে উত্থিত করিলেন, যে তাহাদের সমীপে তাঁহার আয়তগুলির আবৃত্তি করিতেছে ও তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া দিতেছে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছে কেতাব ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতঃপূর্ব্বে তাহারা (নিমজ্জিত) ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ।

١٦٣ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ◎

১৬৪ কী (অন্যায় কথা)! তোমরা যখন (ওহোদ যুদ্ধে) বিপদগ্রস্ত হইলে — অথচ (বদর যুদ্ধে) প্রতিপক্ষকে তাহার দ্বিগুণ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলে তোমরাই — তখন বলিতে লাগিলে, ইহা (আসিল) কোথা হইতে ? বলিয়া দাও, ইহা (আসিয়াছিল) তোমাদের নিজেদেরই সন্নিধান

١٦٤ اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا لا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

হইতে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়েই সর্ব্বশক্তিমান।[৩৯৩]

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১৬৫ আর দুই (যুযুধান) দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল যেদিন, সেদিন যে বিপদে তোমরা পতিত হইয়াছিলে, তাহা (আসিয়াছিল মূলতঃ) আল্লারই নির্দ্দেশক্রমে, আর (তাহার) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি (কার্য্যক্ষেত্রে) মোমেনদিগকে জানিয়া লইবেন—

١٦٥ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

১৬৬ —আর কাপট্যাচরণ করিয়াছে যাহারা, তাহাদিগকেও জানিয়া লইবেন,[৩৯৪] এবং তাহাদিগকে বলা হইল ঃ—"আইস, আল্লার পথে যুদ্ধ কর অথবা আত্মরক্ষা কর!" তাহারা (উত্তরে) বলিতে লাগিল —যুদ্ধ হইবে জানিলে তোমাদিগের অনুসরণ আমরা নিশ্চয়ই করিতাম ; ঈমানের তুলনায় কোফরেরই অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল সেদিন তাহারা,[৩৯৫] মুখে যাহা বলিয়া থাকে - তাহাদের মনের কথা তাহা নহে ; বস্তুতঃ তাহাদিগের গুপ্ত মনোভাবগুলি

١٦٦ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا

يَكْتُمُونَ ۚ

আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত আছেন।

١٦٧ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ط قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

১৬৭ (সেই কপটের দল) যাহারা নিজেরা'ত থাকিল বসিয়া, অথচ নিজেদের ভ্রাতৃবর্গের সম্বন্ধে বলিতে লাগিল—আমাদের কথা শুনিলে ইহারা নিহত হইত না ; বলিয়া দাও ঃ—তাই যদি হয়, তবে তোমরা নিজেদের (উপর) হইতে মৃত্যুকে টলাইয়া দাও'ত —যদি তোমরা সত্যবাদী হও !

١٦٨ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ط بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۙ

১৬৮ আর আল্লার পথে নিহত হইয়াছে যাহারা, তাহাদিগকে কখনই মৃত বলিয়া মনে করিও না ; না, তাহারা জীবিত, নিজেদের প্রভুর সন্নিধানে রেজ্‌ক প্রাপ্ত হয় তাহারা—

١٦٩ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۙ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ

১৬৯ —নিজের যে প্রসাদ আল্লাহ্ তাহাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহার জন্য পরমানন্দিত তাহারা, অধিকন্তু তাহাদিগের যেসব স্থলাভিষিক্তরা তাহাদিগের সহিত (পর জীবনে) সম্মিলিত হয় নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই শুভসংবাদের সত্যতায়

পুলকিত হইয়া থাকে যে, না আছে তাহাদের কোন ভয়, আর না হইবে তাহারা সন্তাপগ্রস্ত।

أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

১৭০ তাহারা আরও আনন্দিত হইয়া থাকে আল্লার নে'মৎ ও প্রসাদ সংক্রান্ত শুভসংবাদের সত্যতায়, আর এই জন্য যে, বিশ্বাসীদিগের কর্ম্মকে আল্লাহ্ ব্যর্থ করিয়া দেন না।

১৭০ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

টীকা:—

৩৮৬ মোনাফেকদিগের উক্তি

আয়তের প্রথমে "সেই সমস্ত লোক" বলিয়া মদীনার মোনাফেক বা কপটদিগকে বুঝাইতেছে। غزى গাজী-শব্দের বহুবচন। যে 'গেজ্বা' করে, সেই গাজী। নির্দ্ধারিত নিয়ম ও শর্ত্ত অনুসারে কাফেরদিগের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে গেজ্বা বলা হয়। "যাহারা প্রবাসে গমন করে"-বলিতে 'সেই সমস্ত লোককে বুঝাইতেছে, যাহারা বাণিজ্যাদি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে প্রবাসে গমন করে', ইহাই তফছিরকারগণের সাধারণ অভিমত। আমার মতে ব্যবসা বাণিজ্য বা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে যাঁহারা প্রবাস যাত্রা করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের কোন হেতুই মোনাফেকদিগের ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্যাদি উপলক্ষে আবশ্যক হইলে মক্কার কাফের ও মদীনার মোনাফেকরাও নিঃশঙ্ক মনে প্রবাস যাত্রা করিত। স্বধর্ম্ম বা স্বজাতির মঙ্গলের জন্য নানা উপলক্ষে বিভিন্ন মুছলমানকে সে সময় প্রবাসে গমন ও অবস্থান করিতে হইত। মোনাফেকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, এই শ্রেণীর প্রবাস-গামী মুছলমানদিগের সম্বন্ধে। আয়তে মুছলমান গাজী ও প্রবাসযাত্রীদিগকে মোনাফেকদিগের 'ভ্রাতৃবর্গ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বংশগত বা গোত্রগত আত্মীয়তার হিসাবে।

'যাহারা প্রবাসে গমন করে এবং যাহারা গাজীরূপে বহির্গত হয়' -আয়তের এই অংশে দুইটা কথা উহ্য আছে। আয়তের তাৎপর্য্য এইরূপ হইবে—যাহারা প্রবাসে গমন করে ও 'মরিয়া যায়' এবং যাহারা গাজীরূপে বহির্গত হয় 'ও নিহত হয়।' এই উহ্য স্বীকারের ইঙ্গিত

আয়তের পরবর্ত্তী অংশে পাওয়া যাইতেছে। সেখানে মোনাফেকদিগের প্রমুখাৎ বলা হইতেছে, ইহারা যদি আমাদিগের কাছে থাকিত, তাহা হইলে 'মরিতও না, নিহতও হইত না।' সুতরাং প্রবাস যাত্রীদিগের মৃত্যু ঘটার ও গাজীদিগের নিহত হওয়ার পর, ও তাহারই জন্য, মোনাফেক-দিগের এই উক্তি।

কাপুরুষতার এই দর্শনটা মোনাফেক-মানসিকতার একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ও পরীক্ষার তাপ সহিতে অসমর্থ মোনাফেকের দল চিরকালই আশু লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া নিজেদের কাপুরুষতার সমর্থন করিতে থাকে। এই মানসিকতার ফলে, মুছলমানরা যখন কোন কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রবাসে গমন করিয়া মরিয়া যান, অথবা জেহাদে লিপ্ত হইয়া শহীদ হন, তখনই তাহারা বলিতে থাকে— আমাদের কথা শুনিয়া আমাদের সঙ্গে গৃহকোণে বসিয়া থাকিলে, তাহাদিগকে এমন করিয়া মরিতে বা নিহত হইতে হইত না! বিশ্বাসী মুছলমানদিগকে এখানে নিষেধ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে—সাবধান! তোমরা যেন এই মোনাফেকদিগের মত হইয়া যাইও না। অর্থাৎ, তাহাদের ন্যায় মূর্খতা ও কাপুরুষতার সংস্কারকে প্রশ্রয় দিওনা। তোমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবে যে, কাহাকে জীবন দেওয়া বা জীবিত রাখা আর কাহারও মৃত্যু ঘটান, একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত। 'রাখে আল্লা মারে কে, মারে আল্লা রাখে কে?'—ইহাই মুছলমানের ঈমান।

মুছলমানদিগকে মোনাফেকদিগের মানসিকতা অবলম্বন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু এই মানসিকতার ফলেই মোনাফেকদিগকে পরিণামে অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া মরিতে হইবে। কারণ, মুছলমানরা যখন আল্লাহকে জীবন মরণের একমাত্র মালেক মনে করিয়া নির্ভয়ে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, আল্লাহ তখন তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তাঁহার সাহায্যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইবে। এছলাম-বৈরীদিগের সেই শোচনীয় পরিণতি এবং এছলাম-সেবকদিগের সেই দুর্জ্জয় দুর্ব্বার শক্তি দেখিয়া, মোনাফেকদের মনস্তাপের সীমা থাকিবে না। কিন্তু মুছলমানরা নিজেরাই যদি ঐরূপ মানসিকতা সম্পন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের দ্বারা আল্লার এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে না।

৩৮৭ মো'মেন ও মোনাফেকের তুলনা

এখানে দুইটী দলের সত্যকার লাভ লোকসানের তুলনা করা হইতেছে। মোমেনরা জেহাদে লিপ্ত হয়, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সেবার জন্য প্রবাসে গমন করে, অথবা অন্য প্রকারে আল্লার পথে কাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় যাহারা নিহত বা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তুলনার একপক্ষ হইতেছে তাহারা। অন্যদিকে মোনাফেকের দল নিজেদের নিরাপত্তার দর্শন লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, যশ মান ও ধন সম্পদাদি অর্জ্জন করিতে থাকে। মৃত ও নিহত মুছলমানের ত্যাগের মোকাবেলায় জীবিত মোনাফেকদিগের এই সঞ্চয়। মোনাফেকদের লাভ হইতেছে এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্বল। ইহার মোকাবেলায় মৃত-কর্ম্মী বা

বীর-শহীদ তাহার কৃপানিধান প্রভুর নিকট হইতে পাইতেছে তাঁহার ক্ষমা ও অনন্ত করুণা। পারলৌকিক জীবনের সেই চিরস্থায়ী পরামানন্দের ও অমৃতত্বের মোকাবেলায় মোনাফেকদিগের এই সঞ্চয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

৩৮৮ সকলের শেষগন্তব্য একই

মরিতে সকলকেই হইবে। আল্লার পথের কর্ম্মী যেমন মোছলেম-জীবনের কর্ত্তব্য-পালন করিতে করিতে মরিয়া যায়; সমরক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা যেমন শত্রুর তীক্ষ্ণধার কৃপাণকে নিজের হৃৎপিণ্ডে বরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে—মরণের ভয়ে বিহ্বল দুন্‌য়া-সর্ব্বস্ব কর্ত্তব্য-বিমুখ কপট ও কাপুরুষের দলকেও সেইরূপ একদিন না একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতেই হইবে। তাহার পর তাহাদের সকলকে সমবেত হইতে হইবে সর্ব্বশক্তিমান জুল-জালালের ন্যায়দণ্ডের সম্মুখে। অস্থায়ী দুন্‌য়া তাহার সমস্ত শোক ও সুখ লইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এবং তখন আল্লার হুজুরে মানুষকে পুরস্কার বা দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে, নিজ নিজ কর্ম্ম-অনুসারে। সুতরাং অস্থায়ী জীবন ও তাহার অকিঞ্চিৎকর সুখ সম্পদের জন্য চিরস্থায়ী জীবনের অনন্ত দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়া অথবা তাহার শাশ্বৎ সুখ শান্তিকে বর্জ্জন করা মুছলমানের পক্ষে অনুচিত হইবে।

৩৮৯ এমামের কর্ত্তব্য

এমামের প্রতি জামাআতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পরেও এ সম্বন্ধে অনেক কথা আসিবে। কিন্তু জমাতের প্রতি এমামের কর্ত্তব্য কি, তাহারই আভাস এখানে দেওয়া হইতেছে। আয়তের "তুমি যদি রূঢ় .... বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত"—এই অংশটা অনন্বিত (parenthesis) হিসাবে বর্ণিত। আপাততঃ এই অংশটা বাদ দিয়া পড়িলে অর্থ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আয়তের প্রথমে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তাহাদের অর্থাৎ তোমার অনুসরণকারী মোমেনদিগের সম্বন্ধে তুমি যে এমন কোমল-প্রাণ ও মধুর-হৃদয় হইয়া আছ, এই কোমলতা ও মধুরতার স্রষ্টা তুমি নিজে নহ, ইহা তোমার প্রতি ও বিশ্বমানবের প্রতি আল্লার রহমৎ বা অনুগ্রহ-দান। তোমার এই কোমল মধুর ও শান্ত শীতল রহমতের ছায়ায় দুন্‌য়ার সকল শ্রেণীর মানুষ আসিয়া অভয় লাভ করিবে এবং তোমার শিক্ষাধীন তাহারা গড়িয়া তুলিবে যুগযুগের অভিপ্সিত সেই মহাজাতিকে — দুন্‌য়াকে যাহারা আল্লার নামের জয়জয়কারে মুখরিত করিয়া তুলিবে। তোমাকে আল্লাহ এই কোমলতা দিয়াছেন, যেন নেতা ও এমামের হিসাবে তুমি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই করুণ ও কোমল ব্যবহার করিয়া যাও। দুর্ব্বল মনকে সবল করিয়া তোলা, কাঁচা ঈমানকে পাকা করিয়া দেওয়া, নানা ত্রুটী বিচ্যুতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহাদের জীবনকে সুদৃঢ় ও সুসম্পন্নরূপে গড়িয়া দেওয়াই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। এজন্য সব চাইতে বেশী দরকার ছিল তোমার ঐ কোমল মধুর চরিত্রের।

এই ভূমিকার পর বলা হইতেছে—'অতএব, তুমি নিজেও তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবে আর আল্লার হুজুরেও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে।' ওহোদযুদ্ধের ব্যাপারে মুছলমানরা যেসব অন্যায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ছিল প্রত্যক্ষভাবে হজরতের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অপরাধ। এইগুলি তিনি নিজে ক্ষমা করিবেন। আর শুধু ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, উম্মতের দোষ ক্রুটীর জন্য সর্ব্বদাই আল্লার হুজুরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। এই সব অপরাধের জন্য তাহাদিগের প্রতি মার্শাল-ল জারী করার বা অন্য কোন প্রকারের কোন দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে করা হয় নাই। হাদিছ ও ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ওহোদযুদ্ধের ক্রুটী বিচ্যুতির জন্য হজরত ছাহাবাদিগের মধ্যে কাহাকেও কস্মিনকালে একটা সামান্য ভৎসনার কথাও বলেন নাই। ইহাই রছুলের ছুন্নত, মহাজাতির মহাএমাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পুণ্যময় আদর্শ। লক্ষ লক্ষ মানবের সমবায়ে গঠিত হইবে যে জাতি, তাহার ব্যক্তিরা কতবার পড়িবে কতবার উঠিবে, কত ভুলভ্রান্তির অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বিবেককে ধীর স্থীরভাবে বুঝিতে দিতে হইবে যে, এইসব পতনের মধ্যে তাহাদের দুর্ব্বলতা কোথায় কিরূপে লুকাইয়াছিল।

ক্ষমা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ প্রদানের পর হজরতকে বলা হইতেছে—এই সমস্ত ব্যাপারে তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। যে সব বিষয় 'অহি'দ্বারা অবধারিত হইয়া গিয়াছে বা ভবিষ্যতে হইয়া যাইবে, পরামর্শের সুযোগ তাহাতে থাকিবে না। ইহা ব্যতীত, অন্য সমস্ত সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে হজরত জামাআতের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, ইহাই আয়তের নির্দ্দেশ। ওহোদযুদ্ধের পূর্ব্বেও তিনি এইরূপে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশের মত স্বীকার করিয়া লওয়াকে নিজের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্যই নিজের ও প্রধান প্রধান ছাহাবীদিগের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার আদেশ তিনি দিয়াছিলেন। আয়তে হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—এই শ্রেণীর ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে তুমি তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবে, তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবে। অভিধানে বর্ণিত হইয়াছে—

شاوره فی الامر طلب منه المشورة

"شاوره অর্থে, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।" পরামর্শ বা মতামত জিজ্ঞাসা করা আর সেই মতামত অনুসারে কাজ করা, এক কথা কখনই নহে। ইহার পরে বলা হইতেছে যে, জামাআতের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করার পর, সেই সমস্ত মতামতের বিচার করিয়া তুমি নিজেই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। এই সিদ্ধান্তকে 'আজম' বা সঙ্কল্প বলা হইয়াছে। অভিধানকাররা বলিতেছেন—

(১) العزم و العزيمة عقد القلب على امضاء الامر - راغب

(২) عزم عزيمة و عزمة اجتهد و جد فی امره - المصباح المنير

(৩) اولوا العزم من الرسل هم اصحاب الشرايع اجتهدوا في تاسيسها الخ - فرايد اللغة

ইহার সারমর্ম এই যে, 'এজ্‌তেহাদ বা বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার দৃঢ় সঙ্কল্পকে আজ্‌ম বলা হয়।' সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মতামত জিজ্ঞাসা করার পর, বিনা বিচারে অধিকাংশের অভিমতের অনুসরণ করিয়া যাওয়া এমামের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অধিকাংশের অভিমতও যদি তাঁহার বিচারে অসঙ্গত বলিয়া স্থির হয়, তবে তাহাকেও বাতিল করিয়া দেওয়ার অধিকার এমামের আছে। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, ইহাই আয়তের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। ওহোদযুদ্ধের পূর্ব্বে পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সে সময় হজরত এই নীতির অনুসরণ করেন নাই বলিয়া, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত এমামগণের কর্ত্তব্য এখানে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। একদল লোক মনে করিতেছিলেন যে, মদীনার বাহিরে চলিয়া আসাতেই যত বিপদ সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এ জন্য তাঁহারা পরামর্শ করাকেই যত অনর্থের মূল বলিয়া মনে করিতেছিলেন। আয়তে তাঁহাদের মতেরও প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। আয়তে বলা হইতেছে যে, কোন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইলে এমামকে জামাআতের পরামর্শ চিরকালই গ্রহণ করিতে হইবে। তবে তিনি নির্ব্বিচারে তাহার অনুসরণ করিবেন না।

৩৯০ তাওয়াক্কোল বা নির্ভরশীলতা

১৫৮ আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে, "কোন কার্য্য সমাধা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইবে যখন, তখন নির্ভর করিবে আল্লার উপর, নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীল লোকদিগকে ভালবাসেন।" এখানে বলা হইতেছে যে, একমাত্র আল্লার উপর নির্ভর করাই মোমেনদিগের কর্ত্তব্য। যুক্তি পরামর্শ করিতে হইবে, বিচার বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং সে সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে হইবে। এই সমস্ত কর্ম্মায়োজন শেষ করার পর মুছলমানকে আদেশ দেওয়া হইতেছে আল্লার উপর নির্ভর করিতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মবিমুখ কাপুরুষের আত্ম-প্রবঞ্চনার মানসিকতা আর কোরআনের তাওয়াক্কোল এক কথা নহে। এছলামের শিক্ষা অনুসারে সাধনার সমস্ত অবদান উপকরণকে মুছলমান সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিবে যে, উপকরণগুলি সফলতার উপকলক্ষ মাত্র, তাহার প্রকৃত মালেক হইতেছেন, সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় আল্লাহ।

আজকাল এক শ্রেণীর মুছলমান তাওয়াক্কোলের যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা অতিশয় ভ্রান্ত ও মারাত্মক। কোরআন ও হাদিছে সে তাওয়াক্কোলের সমর্থন নাই এবং পূর্ব্ব যুগের খলিফা, এমাম ও আলেমগণও কখন তাহার সমর্থন করেন নাই। এমাম রাজী এখানে বলিতেছেন :—"এই আয়ৎ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা ও কর্ম্মবিমুখতার নাম তাওয়াক্কোল নহে, এক শ্রেণীর মূর্খলোক যেরূপ মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাওয়াক্কোলের তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ পার্থিব উপকরণ-উপলক্ষগুলির যথাযথ ব্যবহার করিবে, কিন্তু

তাহার উপর ভরসা করিয়া থাকিবে না, তাহার ভরসা হইবে সেই উপকরণগুলি মালেক আল্লার উপর (৩—১০২)।" ওয়াজের মজলিসে তাওয়াক্কোলের ফজিলৎ সম্বন্ধে বহুবার শুনিয়াছি—'হাদিছে আছে, তোমরা যদি আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়া থাক, তাহা হইলে তিনি পাখীদের মত তোমাদের রুজী পৌছাইয়া দিবেন।' সমাজের ভ্রান্তধারণা দূর করার জন্য মূল হাদিছটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হজরত বলিতেছেন :—

لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا و تروح بطانا

তোমরা যদি আল্লার উপর যথাযথভাবে নির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে রুজী দিবেন যেরূপে পাখীদিগকে রুজী দিয়া থাকেন—পাখীরা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় আর সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে উদর পূর্ণ করিয়া (আহমদ, তিরমিজী, নাছাই, হাকেম প্রভৃতি)। বলা বাহুল্য যে, পাখীরা বাসায় বসিয়া থাকিয়া রুজী পায় না। সেজন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চেষ্টায় ও কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয় এবং এই চেষ্টার ফলেই সন্ধ্যা বেলা তাহারা ফিরিয়া আসে উদর পূর্ণ করিয়া। পাখীর উদাহরণ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কর্ম্মবিমুখের অলসতাকে এখানে তাওয়াক্কোল বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

একজন লোক এমাম আহমদকে বলিলেন—'আমি শুধু আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়া হজ্জ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' এমাম ছাহেব তাহার উত্তরে বলিলেন—'বেশ কথা। তাহা হইলে হাজীদের কাফেলাকে ছাড়িয়া একাই যাইও!' আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়া বিনা সম্বলে হজ্জ করিতে চাহিতেছিলেন যিনি, এই উত্তরে তিনি একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন—'না তাহা হইবে না!' এমাম ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন — 'তাহা হইলে তুমি তাওয়াক্কোল করিতেছ অন্য লোকের পকেটের উপর, আল্লার উপর নহে!' এছলামের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান খলিফা হজরত আবুবকর সম্বন্ধে হাদিছে ও ইতিহাসে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে, সমাজের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি খলিফার পদে বরিত হইলেন যেদিন, তাহার পরদিন ওমর ও আবু-ওবায়দা রাস্তায় বাহির হইয়া দেখেন—আবুবকর এক মোট কাপড় কাঁধে করিয়া চলিয়াছেন। ইঁহারা বলিলেন—

"আপনি কোথায় চলিয়াছেন ?"

"বাজারে।"

"এসব কি করিতেছেন ? সমগ্র মোছলেম জাতির একচ্ছত্র আমির আপনি!"

"তাহা হইলে নিজ পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিব কোথা হইতে ?"

আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়া বাড়ীতে বসিয়া যাও, এরূপ কথা তাঁহাকে কেহই বলিতে পারেন নাই।—আবদুল্ল ৪—২১৩। হজরতের জীবন-চরিত এবং হাদিছগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীর ধারণার কঠোরতর প্রতিবাদে পরিপূর্ণ। হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন—

التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء

"বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুছলমান বণিকের স্থান শহীদদিগের সঙ্গে (এবনে-মাজা, হাকেম প্রভৃতি)।"

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর হাদিছগুলির বর্ণনা আমাদের ওয়াজের মজলিসে খুব কমই শোনা যায়।

৩৯১ **খিয়ানৎ করা**

মূলে 'য়্যাগুল্লা' শব্দ আছে। উহার ধাতুগত অর্থ—খিয়ানৎ করা, abuse of confidence বা বিশ্বাসঘাতকতা করা। উপক্রম উপসংহার অনুসারে জানা যাইতেছে যে, রছুল ও নায়ক হিসাবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উপর উম্মতের মঙ্গলসাধনের যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছে, এখানে তাহারই কথা বলা হইতেছে। এমামের উপর এখানে কতকটা ডিক্‌টেটরের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাই বলা হইতেছে যে, জমাআতের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করার পর সে সম্বন্ধে রছুল নিজে যে বিচার বিবেচনা করিবেন, তোমাদের মঙ্গলচিন্তাই হইবে তাহার মূল প্রেরণা। এ বিশ্বাস সকলের রাখা উচিত। তোমাদের এই বিশ্বাসের অবমাননা আল্লার রছুল কখনই করিতে পারেন না। অতএব কোন রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে আত্মসমর্পণ করাই উম্মতের কর্ত্তব্য হইবে।

বিশ্বাসঘাতকতা করা কোন নবীর পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহা হইতেছে আল্লার হুজুরে মহাপাপ। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিরা দুন্‌য়ায় যতই আত্মগোপন করিতে চা'ক না কেন, সর্ব্বদর্শী আল্লার ন্যায়বিচারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। ফলতঃ কিয়ামতের দিন সে নিজের পাপকে বহন করিয়া আনিবে এবং সেই পাপের জন্য আল্লার অসন্তোষভাজন হইয়া পড়িবে। অথচ নবীদিগের সমস্ত সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে, আল্লার সন্তোষলাভ। অতএব আল্লার অসন্তোষভাজন হইতে হয় যে অপকর্ম্মের দ্বারা, নবীর পক্ষে তাহার সংশ্রবে যাওয়া অসম্ভব। ১৬০ হইতে ১৬২ আয়ৎ পর্য্যন্ত এই দুই শ্রেণীর লোকের মানসিকতার তারতম্য প্রদর্শন করা হইতেছে। ১৬২ আয়তে বলা হইতেছে যে, উপরে যে দুই দলের লোকের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। সর্ব্বোচ্চ স্তরের মানুষ হইতেছেন আল্লার নবীরা, অতএব হীনস্তরের লোকের নিকৃষ্ট মানসিকতা অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব।

৩৯২ **রছুলের কর্ত্তব্য**

রছুলের প্রতি যে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের আদেশ উপরে দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহারই সম্পর্কে বলা হইতেছে যে, এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তোমরা কখনও মনে করিও না যে, ইহাদ্বারা তোমরা রছুলের কোন উপকার করিতেছ অথবা এইরূপে তোমরা তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতেছ। না, কখনই নহে। রছুলের প্রতি বিশ্বাস করিয়া উপকৃত ও অনুগৃহীত হইবে তোমরা নিজেরাই। মোহাম্মদকে যে তোমরা নবীরূপে পাইয়াছ, ইহা

তোমাদিগের প্রতি আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য তোমরাই কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে, আল্লার মহাঅনুগ্রহ স্বরূপ এই নবীকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত মনেপ্রাণে বরণ করিয়া লইবে।

রছুলের বিশেষণে বলা হইতেছে—তিনি তাহাদের মধ্যকারই একজন। অর্থাৎ—তিনি দেবতা নহেন, ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তোমাদের বুদ্ধির, অনুভূতির বা অধিকারের বহির্ভূত এমন আর কিছুও তিনি নহেন, যাহার চিন্তা করিতেই তোমাদের জ্ঞান ত্রস্ত, ক্লান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। তিনি তোমাদিগের মধ্যকার ও তোমাদের মতই একজন মাটীর মানুষ। এই মানুষের কাছে তিনি বহিয়া আনিয়াছেন স্বর্গের শাশ্বৎ সন্দেশ, আল্লার অমৃতবাণী কোরআন। সেই কোরআনের নূরে তিনি তোমাদের মনের সব অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছেন, জীবনের সব কলুষ, সব গ্লানি ও সমস্ত হীনতাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। নিজে কোরআনের আবৃত্তি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং সেই কোরআন বা আল্লার কেতাবকে যাহাতে তোমরাও নিজস্বরূপে আয়ত্ত করিয়া লইতে পার, সারাজীবনের শিক্ষা, কর্ম্ম ও আদর্শের মধ্য দিয়া তিনি অবিরাম সেই সাধনাই করিরা যাইতেছেন। কোরআনের সুগভীর তত্ত্বগুলিকে আয়ত্ত করার এবং তাহার শিক্ষাকে আত্মাগত করিয়া লওয়ার জন্য দরকার হয় হেক্‌মৎ বা প্রজ্ঞার। হেক্‌মৎ শব্দের অর্থ :— اصابة الحق بالعلم و العقل।
"বিদ্যা ও জ্ঞানের সাহায্যে সত্যকে প্রাপ্ত হওয়ার" যোগ্যতাকে হেক্‌মৎ বলা হয় (রাগেব)। সুতরাং বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধ্য হইতেছে এই হেক্‌মৎ বা প্রজ্ঞা। এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লার রছুল মোহাম্মদ মোস্তফা, কোরআন—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে—প্রজ্ঞার শিক্ষা মুছলমান-দিগকে দিয়া থাকেন। জাতির জীবনকে প্রজ্ঞায় ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই যে রছুলের প্রধান সাধনা, অজ্ঞতা ও অপবিত্রতার কোন ঘৃণিতভাব তাঁহার অন্তরকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

৩৯৩ ওহোদ ও বদরের তুলনা

মুছলমানগণ ওহোদযুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বদরযুদ্ধে শত্রুপক্ষকে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাই। ওহোদের বিপদ ও ক্ষতির কার্য্যকারণ পরম্পরার অনুসন্ধান করিতে হইলে, বদরযুদ্ধের সাফল্যের কার্য্যকারণ পরম্পরার প্রশ্নটাও সেখানে স্বতই আসিয়া পড়ে। বদরযুদ্ধে মুছলমানরা ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, সম্পূর্ণভাবে হজরতের আদেশ নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই সেখানে তাঁহারা ঐরূপ আশাতীত জয়লাভ করিয়াছিলেন। ওহোদযুদ্ধে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল, তাই জয়লাভের পরেও তাঁহাদিগকে এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আয়তে বলা হইতেছে যে, মুছলমানেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—এ বিপদ কোথা হইতে আসিল, কি কারণে অসিল? আল্লাহ্ হজরতকে বলিতেছেন, ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়া দাও যে, এ

বিপদের কারণ তোমরা নিজেরাই, ইহা তোমাদের নিজেদের অন্যায় কর্ম্মের শোচনীয় প্রতিফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা ব্যতীত, আল্লার উদ্দেশ্য ছিল যে, অতঃপর কপট ও সত্যকার মুছলমানকে তিনি পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া দিবেন।

৩৯৪ বিপদ—আল্লার নির্দ্দেশ

পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, ওহোদযুদ্ধের বিপদ তোমাদের নিজ কৃতকর্ম্মের ফল। ইহার গূঢ় কারণটী বুঝাইবার জন্য এখানে বলা হইতেছে যে, ঐ বিপদ আসিয়াছিল আল্লার নির্দ্দেশক্রমেই। আল্লার সৃষ্টিরাজ্যের ক্ষুদ্র অনুপরমাণু হইতে বৃহৎ গ্রহনক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ও বিষয় কঠোর নিয়মের অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে। এই নিয়মগুলি হইতেছে আল্লার নির্দ্দেশ। কর্ম্মফলও এইরূপ একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম। শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য প্রকাশ করিবে যাহারা, যুদ্ধের সময় নায়কের আজ্ঞার অবমাননা করিবে যাহারা, তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে—ইহাই আল্লার অটল নিয়ম বা অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ। আয়তে এই নির্দ্দেশের কথাই বলা হইয়াছে।

৩৯৫ যুদ্ধের দুই আদর্শ

অসত্যের আক্রমণ হইতে সত্যকে রক্ষা করার জন্য এবং সত্যকে জয়যুক্ত করার জন্য মুছলমানের যে ধর্ম্মযুদ্ধ, পার্থিব স্বার্থের কোন সংশ্রবই তাহার সঙ্গে নাই। আল্লার পথে যুদ্ধ করা বা জেহাদ করা অর্থে এই প্রকারের যুদ্ধকে বুঝাইয়া থাকে। ছোটকালে বৃদ্ধা মাতামহীর মুখে শুনিয়াছি—

واسطے دین کے لڑنا ، نہ پے طمع بلاد   اهل اسلام جسے شرع میں کہتے هیں جہاد *

"ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধকরা—রাজ্যের লোভে নয়, মুছলমানের শরিয়তে ইহাকেই বলা হয় জেহাদ।" মুছলমানের আদর্শ জেহাদ ইহাই। আর এক প্রকারের যুদ্ধ হইয়া থাকে, নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সম্মানকে আততায়ীর অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য। উভয়ই ন্যায়সঙ্গত ও অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথমটী আদর্শের হিসাবে দ্বিতীয়টী অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের।

এখানে মোনাফেকদিগের মানসিকতার বর্ণনা করা হইতেছে। কোরেশবাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য ওহোদ-প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—তোমরা ধর্ম্মের জন্য এই জেহাদে যোগদান কর! কিন্তু এ-আদর্শের অনুসরণ করা যদি তোমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলেও, নিজেদের মান সম্ভ্রম, বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন ও দেশের সম্মানকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য, সে আক্রমণের প্রতিরোধ-চেষ্টা করাও'ত তোমাদের উচিত। না হয় সেই হিসাবে নিজেদের ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও! মোনাফেক দল ইহার উত্তরে বলিয়াছিল—যুদ্ধ হইবে জানিলে আমরা নিশ্চয়ই

---

* বাঙ্গলার জেহাদ আন্দোলন যখন পূর্ণবেগে প্রচলিত, সেই সময় আমাদের পরিবারই ছিল, সীমান্তগামী কাফেলার প্রধান আশ্রম। তাঁহারা যাত্রা করার সময় সমস্বরে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মরহুমার মুখে তাহার কএকটা পদ শিক্ষা করিয়াছিলাম। এই পদটী তাহার মধ্যকার একটী।

তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতাম। "যুদ্ধ হইবে" পদের তাৎপর্য্য দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম—অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, যুদ্ধ ঘটার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই তোমাদের সঙ্গে যোগদান করি নাই। দ্বিতীয়—মদীনার বাহিরে গিয়া বিরাট শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করিতে যাওয়া মূর্খতার কাজ। উহা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। যুদ্ধ হইলে আমরা তাহাতে যোগ দিতাম, কিন্তু মূর্খের মত আত্মহত্যায় যোগদান করিতে পারি না। আমরা দ্বিতীয় মতটীকে সমীচীন বলিয়া মনে করি। সে দিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কোফরেরই অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল"—পদে, মোনাফেকদিগকে স্পষ্টভাবে কাফের বলা হয় নাই। কারণ তখন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাফের বা অমুছলমান বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করার হেতুগুলি সমস্তই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইহার কএক বৎসর পরে ছুরা তাওবার ১১ রুকুতে, বিশেষতঃ তাহার ৮৪ আয়তে তাহাদিগকে কাফের বলিয়া স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়।

৩৯৬ মৃত্যু অনিবার্য্য

নিজেদের অপকর্ম্মের সমর্থনে মোনাফেকরা বলিয়াছিল—এই লোকগুলি যদি আমাদের কথা শুনিত, অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদান না করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিহত হইতে হইত না, আমাদিগের মত তাহারাও বাঁচিয়া থাকিত। এই আয়তে এবং রুকুর অবশিষ্ট আয়তগুলিতে তাহাদের এই যুক্তিবাদের প্রতিবাদ করা হইতেছে। এখানে প্রথমে বলা হইতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোনাফেকরা যে ধারণা পোষণ করিতেছে, তাহা সঙ্গত নহে। মুছলমানের জীবন কর্ত্তব্যপালনের জন্য। সুতরাং কর্ত্তব্যের জন্য সে জীবনকে বিসর্জ্জন দিবে, জীবনের জন্য কর্ত্তব্যকে বর্জ্জন করিবে না। তাহার দৃষ্টিতে বাঁচিয়া থাকাই মোছলেম জীবনের প্রধান সফলতা নহে। তাহার পর বলা হইতেছে যে, যে জীবনের জন্য মোনাফেকের মন এমন শোচনীয়ভাবে লালায়িত, তাহাও'ত কোন অবস্থাতেই চিরস্থায়ী নহে। যুদ্ধে না গেলেও মরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। যুদ্ধে যোগ দিয়াও বহু লোক বাঁচিয়া থাকে, আবার বাড়ী বসিয়াও অনেক লোক মরিয়া যায়। সুতরাং যে মৃত্যুর ভয়ে মোনাফেকরা কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহা সকল অবস্থাতেই অপরিহার্য্য। পরবর্ত্তী আয়তগুলিতে বলা হইতেছে যে, শহীদের যে আত্মবলিকে তোমরা মরণ বলিয়া আখ্যাত করিতেছ, তাহা মরণ কখনই নহে। বস্তুতঃ তাহা হইতেছে পরমজীবন। শহীদের অমরত্ব ও রেজক-শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ছুরা বকরার ১৪৪ ও ৩১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯৭ শহীদের প্রসাদপ্রাপ্ত

অমর শহীদ তাহার পরজীবনে নানাদিক দিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। কর্ত্তব্য সাধনার পুরস্কারে তাহাদের প্রভু-আল্লাহ তাহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে প্রসাদ তাহাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা হইতেছে, তাহাদের আনন্দের প্রধান কারণ।

'তাহাদিগের যে সব স্থলাভিষিক্তরা' বলিতে তুন্য়ায় অবস্থিত জীবিত মুছলমানদিগকে বুঝাইতেছে। তুন্য়ায় বাঁচিয়া থাকিতে শহীদরা এই শুভসংবাদ অবগত হইয়াছিল যে, সত্যের সাধক মুছলমান, পরীক্ষার সব ঝড়ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিয়া, পরিণামে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। তখন তাহাদের ভয়ের বা সন্তাপের কারণ থাকিবে না। এই শুভসংবাদ সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইয়াছে দেখিয়াও তাহারা পরমানন্দ লাভ করিবে। ইহা হইতেছে তাহাদের আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ।

পারলৌকিক প্রসাদের ন্যায় মুছলমানের পার্থিব জীবনও আল্লার অনুগ্রহ দানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং বিশ্বাসীদিগের সাধনা এ জীবনেও সর্ব্বপ্রকার সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া যাইবে, এই শুভসংবাদকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়াও তাহারা পুলকিত হইবে।

এই আয়ত হইতে পরোক্ষভাবে জানা যাইতেছে যে, স্থলাভিষিক্তদিগের অবস্থা ও কার্য্য-কলাপের সহিত শহীদদিগের একটা আত্মিক যোগসূত্র চিরকালই বর্ত্তমান থাকে।

১৮ রুকু

১৭১ এই সব (বিশ্বাসী) ব্যক্তি, যাহারা সাড়া দিয়াছিল আল্লার ও তাঁহার রছুলের আহ্বানে— গুরুতর রূপে আহত হওয়ার পরেও ; সেই সমস্ত লোক, যাহারা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ও সংযমশীল হয়, তাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে মহিমান্বিত কর্ম্মফল[৩৯৮]।

١٧١ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

১৭২ সেই সমস্ত ব্যক্তি, লোকে যাহাদিগকে বলিয়াছিল—মক্কার লোকেরা তোমাদিগের (সহিত যুদ্ধ করার) জন্য বিরাট সৈন্য-বাহিনী সমবেত করিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় করা তোমাদের কর্ত্তব্য ! কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শন তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল — আল্লাই আমাদের যথেষ্ট আর তিনিই শ্রেষ্ঠতম অকীল।

١٧٢ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

১৭৩ অতঃপর আল্লার নে'মৎ ও প্রসাদ বশতঃ তাহারা এমন

١٧٣ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

অবস্থায় ফিরিয়া আসিল যে, কোন অমঙ্গলই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, আল্লার সন্তোষের অনুগমন করিয়াছিল তাহারা, আর আল্লাহ্ হইতেছেন মহান-প্রসাদ-স্বামী।

وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۞

১৭৪ এই ভীতি-প্রদর্শক শয়তান—নিজের বন্ধুদের সম্বন্ধে (তোমাদিগকে) আতঙ্ক-গ্রস্ত করিয়া ফেলাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাদের ভয় তোমরা করিবে না, ভয় করিবে একমাত্র আমার—যদি তোমরা (সত্যকার) মোমেন হও!

١٧٤ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

১৭৫ আর কোফরে নিপতিত হওয়ার জন্য ত্বরিত হইতেছে যাহারা—(হে মোহাম্মদ!) তাহারা যেন তোমাকে মর্ম্মাহত করিতে না পারে, নিশ্চয় আল্লার (ধর্ম্মের) ক্ষতি তাহারা কিছু মাত্রও করিতে পারিবে না; আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিবেন না, অধিকন্তু তাহাদের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে মহা-দণ্ড।

١٧٥ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

১৭৬ নিশ্চয় ঈমানের বিনিময়ে কোফরকে ক্রয় করিয়াছে যাহারা, আল্লার ক্ষতি তাহারা কখনও কিছুমাত্র করিতে পারিবে না, অধিকন্তু তাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٧٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ◎

১৭৭ আর কাফের হইয়াছে যাহারা, তাহারা যেন কখনই মনে না করে যে, যে-অবকাশ আমরা তাহাদিগকে প্রদান করি, তাহা তাহাদিগের নিজেদের পক্ষে কল্যাণকর ! আমরা তাহাদিগকে অবকাশ প্রদান করি, ফলে তাহারা (নিজেদের) পাপকেই কেবল বাড়াইয়া লইতে থাকে, বস্তুতঃ তাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

١٧٧ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ط اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ط وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ◎

১৭৮ তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্ মোমেনদিগকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে দিবেন— অপবিত্রকে পবিত্র হইতে বাছাই না করিয়া, এরূপ কখনও হইতে পারে না; (পক্ষান্তরে) গ'এবের সংবাদগুলি আল্লাহ্ জানাইয়া

١٧٨ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط وَمَا

كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

দিবেন তোমাদিগকে, ইহাও কখনও হইতে পারে না, তবে আল্লাহ্ নিজ রছুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা (এই উদ্দেশ্যে) নির্ব্বাচন করিয়া লন, অতএব আল্লাতে ও তাঁহার রছুলগণে বিশ্বাস রাখিয়া চলিও! বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাসবান ও সংযমশীল হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে মহিমান্বিত কর্ম্মফল।

١٧٩ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ع

১৭৯ তাহাদিগকে আল্লাহ্ নিজের যে প্রসাদ দান করিয়াছেন-সে সম্বন্ধে কৃপণতা করে যাহারা, তাহারা যেন ইহাকে নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; না, কখনই নহে, তাহাদের জন্য ইহা অমঙ্গলজনক; নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে, কার্পণ্যের অবদানগুলি তাহাদের কণ্ঠে (আজাবের) 'তওক'রূপে পরিণত হইবে; প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্তের সমস্ত উত্তরাধিকার-বস্তুর একমাত্র মালেক হইতেছেন আল্লাহ্; আর তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

টীকা :—

৩৯৮ মোমেনদিগের পরিচয়

পূর্ব্ব রুকুর শেষ আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, মোমেন বা বিশ্বাসীদিগের কর্ম্মকে আল্লাহ ব্যর্থ করিয়া দেন না। এখানে সেই সংশ্রবে পরপর দুইটী বাস্তব নজির উল্লেখ করিয়া সেই শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের পরিচয় উম্মৎকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। উভয়ই ওহোদযুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনা।

ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়া আবু-ছুফ্য়ান জওহা নামক স্থানে পড়াও করিয়াছিল। সেখানে তাহাদের লোকজনেরা বলিতে লাগিল—বর্ত্তমান অবস্থায় ওহোদ হইতে চলিয়া আসা আমাদের পক্ষে চরম অজ্ঞতার কাজ হইয়াছে। মুছলমানরা কালকার ব্যাপারে চরম বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বহু লোক নিহত হইয়াছে, জীবিতদের মধ্যে অনেকেই গুরুতররূপে আহত। তাহারা সকলেই শোকে সন্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মোহাম্মদ নিজে আহত হইয়াছেন। এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ করিয়া মোহাম্মদকে ও তাহার ভক্তদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আবুছুফ্য়ানও এই মতের সমর্থন করিল এবং কাল তাহারা আবার মদীনা আক্রমণ করার জন্য ফিরিয়া যাইবে, ইহা পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গেল।

এইরূপ একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনা যে খুবই আছে, হজরত রছুলে করিম তাহা প্রথমেই বুঝিতে পরিয়াছিলেন। গুপ্তচরেরা আসিয়াও যে সংবাদ দিলেন, তাহাতেও হজরতের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

পরদিন প্রত্যুষে হজরতের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল—আজ, এখনই, আমরা কোরেশদিগের অনুসরণ করার জন্য যাত্রা করিব। আমার সহযাত্রী হওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য যাহার থাকে, সে অগ্রসর হউক! অন্যথায় আমি একাই যাত্রা করিব। এই ঘোষণার সময় একটা কথা বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, কালকার যুদ্ধে যাঁহারা যোগদান করেন নাই, তাঁহাদের কেহই এ যাত্রীর সঙ্গী হইতে পারিবেন না।

কোরেশদিগের ক্যাম্পে তখনও যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, ইতিমধ্যে ৭০ জন মোছলেম বীরকে সঙ্গে লইয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হাম্রাউল-আছাদ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদে আবুছুফ্য়ান ও তাহার সঙ্গীরা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিল, আহত হয় মুছলমানের দেহ, কিন্তু তাহার আত্মা বা তাহার ঈমান সকল অবস্থাতেই অক্ষত থাকে। তিন হাজার বা ৪৩ গুণ শত্রুর বিরুদ্ধে ৭০ জন মোমেনের এই বিজয় যাত্রা, এমনই অনুপম। কিন্তু মুছলমানদিগের তখনকার অবস্থা

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে, ইহা মানুষের কাজ নয়, এ ছিল বস্তুতঃ মুছলমানের ঈমানের জয়যাত্রা, ওহোদযুদ্ধের দোষত্রুটীর অতুলনীয় ক্ষতিপূরণ। ঈমানের এই তেজঃদর্পের সম্মুখীন হওয়া কোরেশদিগের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাহারা তখন নিজেদের জিনিষপত্র সামলাইয়া ত্বরিতপদে মক্কার দিকে পলাইয়া গেল। আলোচ্য আয়তে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩৯৯ ক্ষুদ্র-বদর অভিযান

যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সময় আবু-ছুফয়ান হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—আগামী বৎসর ক্ষুদ্র-বদরপ্রান্তরে তোমাদিগের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিব। হজরতের আদেশ অনুসারে হজরত ওমর আবু-ছুফয়ানের এই চ্যালেঞ্জ মনজুর করেন। নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানরা তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আবু-ছুফয়ানও যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু বদর ও ওহোদের অভিজ্ঞতার ফলে, তাহার মন একেবারে দমিয়া গিয়াছিল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এমন একটা ফন্দী বাহির করিল, যাহাতে তাহাদের 'প্রেষ্টিজের' কোন লাঘব হইবে না, অথচ মুছলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করারও আবশ্যক ঘটিবে না। সে তখন মদীনার ও তাহার নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গোত্রের কএকজন লোককে নানাপ্রকার পুরস্কারের আশা দিয়া প্রোপ্যাগেণ্ডার জন্য নিযুক্ত করিল। ইহারা মদীনায় আসিয়া প্রত্যেকে নূতন নূতনভাবে প্রচার করিতে লাগিল যে, কোরেশ পক্ষ এবার বিরাট আয়োজনে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অবশেষে ইহাদের একজন আসিয়া বলিতে লাগিল—'মক্কার লোকেরা বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। সে বাহিনীর মোকাবেলা করিতে গেলে এবার তোমাদের আর রক্ষা থাকিবে না। এবারকার মত চাপিয়া যাওয়াই তোমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। আবু-ছুফয়ান মনে করিয়াছিল যে, এই রটনার ফলে মুছলমানরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধযাত্রা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। যাহা হউক, লোক দেখাইবার জন্য সে যথাসময় মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মররুজ্জ জহরান নামক স্থানে আসিয়া ছাউনী করিল।

এদিকে, আবু-ছুফয়ানের গুপ্তচর-শয়তানদিগের রটনায় মুছলমানদিগের ভয়ের সঞ্চার হওয়া'ত দূরের কথা, তাঁহাদের ঈমান আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—কোরেশের সৈন্যবাহিনী যতই বিরাট হউক না কেন, আমাদের আল্লাহ তাহা অপেক্ষা বিরাটতর। লক্ষ কোটি শত্রুর মোকাবেলায় একা তিনিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারাও যাত্রা করিলেন এবং যথাসময় ক্ষুদ্র-বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া আবু-ছুফয়ান আর অগ্রসর হইল না, মররুজ্জ-জহরান হইতেই সে মক্কার দিকে পলাইয়া গেল। ১৭২—৭৪ আয়তে মোমেনদিগের এই কীর্ত্তির প্রশংসা করা হইয়াছে।

'তোমার হইয়া তোমার কাজগুলি সমাধা করিয়া দেওয়ার ভার যাঁহার উপর অর্পিত থাকে এবং যিনি তদনুসারে তোমার সেইসব কাজ সমাধা করিয়া দিয়া থাকেন'—অকীল বলিতে তাঁহাকে বোঝায়। আমাদের উকীল বা ভকীল এই অকীলেরই অপভ্রংশ। বাঙ্গলায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই নাই।

১৭৩ আয়তের بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ পদের অনুবাদ করিয়াছি "আল্লার নে'মৎ বশতঃ" বলিয়া। বে-বর্ণের তাৎপর্য্য সহিত ও সহকারে প্রভৃতিও হইতে পারে। তফছিরকাররা বলিতেছেন—যুদ্ধ না হওয়ায় মুছলমানরা বানি-কেনানার মেলায় নিজেদের বাণিজ্যসম্ভারগুলি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ঠ লাভবান হইয়াছিলেন। এই লাভের ধন সঙ্গে লইয়া তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আয়তে ইহাকেই আল্লার নে'মৎ ও প্রসাদ বলা হইয়াছে। আমি এই মতের সমর্থন করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ যুদ্ধযাত্রার সময় বাণিজ্য সম্ভার সঙ্গে লইয়া যাওয়া একেবারে অস্বাভাবিক। কোন বিশ্বস্ত হাদিছে ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়াও জানিতে পারি নাই। এই ছুরার ১০২ আয়তে ঠিক এই ভাবে বলা হইতেছে—

فاصبحتم بنعمته اخوانا

"আল্লার নে'মৎ বশতঃ বা তাহার কল্যাণে তোমরা ভাই ভাই হইয়া গেলে।" এখানেও ঠিক এইরূপ অনুবাদ হওয়াই সঙ্গত। এসবক্ষেত্রে দুনয়ার ধনদৌলৎ বা ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ কোরআনে সাধারণতঃ করা হয় না।

৪০০ শয়তান ও তাহার স্বজনগণ

আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এক দলের মত অনুসারে আয়তের অনুবাদ হইবে :—

(ক) ··· শয়তানে তোমাদিগকে নিজের বন্ধুবান্ধবগণ দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া ফেলিতে চায়। অথবা—

(খ) শয়তান তোমাদিগকে নিজ বন্ধুদের ভয় দেখাইতে চায়। ফলতঃ নিম্নরেখ শব্দগুলিকে উহ্য স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ তাহার কোন কারণ বা আশুক নাই। তাঁহাদের ৩য় মতটী আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

মানুষের ভয়ে ভীত করিয়া মুছলমানের ঈমানকে দুর্ব্বল করিতে চায় যাহারা, এই আয়তে তাহাদিগকে শয়তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের দৃষ্টিকে হীন করিয়া দেওয়া, তাহার মনকে সৎ, সত্য, উচ্চ ও মহান আদর্শ হইতে নামাইয়া অসৎ, অসত্য, নীচ ও জঘন্যভাবে লিপ্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাওয়াই হইতেছে শয়তানের চরম সাধনা। কিন্তু সত্যকার মোমেনের কাছে এই সব শয়তানের প্ররোচনা কোন দিনই সফল হইতে পারে না। শয়তানের ইঙ্গিতে গয়রুল্লার ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে যাহারা, তাহারা হইতেছে শয়তানের স্বজন ও তাহার বন্ধুবান্ধব অর্থাৎ মোমেনের ছদ্মবেশধারী মোনাফেকের দল।

৪০১ মোনাফেকদের স্বরূপ প্রকাশ

ওহোদযুদ্ধে মুছলমানরা বিপন্ন হইলেন, স্বয়ং হজরত গুরুতররূপে আহত হইলেন, বহু মুছলমান নিহত হইলেন। এই সমস্ত ঘটনায় মোনাফেদিকের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল। মুছলমানের ছদ্মবেশে এতদিন তাহারা আত্মগোপন করিয়াছিল, পার্থিব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া। এখন তাহারা মনে করিল যে, এছলামের শক্তি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোরেশ ও এহুদী দলপতিগণের মিলিত আক্রমণের বেগ সহ্য করা মুছলমান সমাজের পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না। এই ভাবিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল—এছলামের, হজরতের ও মুছলমানদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, শত্রুদের সঙ্গে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া, যথাসময় মুছলমানদের বিরুদ্ধে উত্থান করার প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখাইয়া। ফলতঃ তাহারা যে মুছলমান নহে, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য তাহারা তখন হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। 'কোফরে নিপতিত হওয়ার জন্য ত্বরিত হইতেছে যাহারা'—পদে, মোনাফেকদিগের এই অবস্থার কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হওয়া হজরতের পক্ষে নানাদিক দিয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই আল্লাহ প্রথম হইতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন—প্রকাশ্যভাবে কাফের হইয়া গেলেও এবং সকলে তোমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিলেও, আল্লার সত্যধর্ম্মের সামান্য একটু ক্ষতিও ইহারা করিতে পারিবে না। 'আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, পরকালের কোন অংশ তাহাদিগের জন্য রাখিবেন না'—পদের তাৎপর্য্য এইযে, আল্লার ইচ্ছায় তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে যে, ঐরূপ পাপাচরণে লিপ্ত হইলে মানুষের পারলৌকিক জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, সুখ শান্তি ও আনন্দের অংশই সেখানে তাহারা পাইতে পারে না।

৪০২ ঈমান ও কোফর

পূর্ব্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, মোনাফেকরা কোফরকে অবলম্বন করার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তাহাদের মানসিক বিদ্রোহের প্রথম স্তর। এই আয়তে তাহার শেষ স্তরের বা পরিণত অবস্থার কথা বলা হইতেছে। এই আয়তে বলা হইতেছে যে, ঈমানের বিনিময়ে কোফরকে ক্রয় করিয়া তাহারা নিজদিগকে লাভবান বলিয়া মনে করিতেছে।

৪০৩ অবকাশের অপব্যবহার

পাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ মানুষকে দণ্ড দেন না। তাহাকে তিনি আত্মসংশোধনের অবকাশ দেন। এক শ্রেণীর লোক এই অবকাশে নিজের পাপাচারের শোচনীয়তাকে অনুভব

করে, সে জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজকে সংশোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইতে থাকে। আল্লার দেওয়া অবকাশ কল্যাণকর হয় এই শ্রেণীর মানুষের জন্য। আর এক শ্রেণীর লোকের অবস্থা এইযে, জীবনের এই অবকাশে তাহাদের পাপের মোহ আরও বাড়িয়া যায়। অনাচার অত্যাচার সহিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর লোকেরা, নিজেদের কর্ম্মদোষে সেই অবকাশটাই নিজেদের জন্য ঘোর অকল্যাণের হেতুতে পরিণত করিয়া লয়। আলোচ্য আয়তে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

আয়তের শেষ অংশে ليزدادوا ক্রিয়াপদের লাম-বর্ণের অনুবাদে আমি সাধারণ তফছির-কারগণের মতের সমর্থন করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মত অনুসারে আয়তের অনুবাদ এইরূপ হইবে :—'তাহারা নিজেদের পাপকে বৃদ্ধি করিয়া লউক, কেবল এই উদ্দেশ্যেই আমরা তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকি।' এই অনুবাদ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাতে মানুষের পাপভার ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে থাকে, এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাহাকে অবকাশ দিয়া থাকেন। কোরআনের 'করুণাময় কৃপানিধান' আল্লার পক্ষে এই "উদ্দেশ্য" আদৌ শোভনীয় নহে। ইহার কোন দরকারও আমাদের নাই। সাহিত্যিক এমামরা সকলে এই লামকে لام العاقبة বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়তেও লাম-বর্ণ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (কবির ৩—১৫২)।

১০৪ পবিত্র অপবিত্রের বাছাই

আয়তের প্রথমে 'তোমরা' বলিয়া মোনাফেকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মোনাফেকেরা মুছলমানের ছদ্মবেশে তাহাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকে, গুপ্তশত্রু হিসাবে সর্ব্বদাই তাহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে থাকে। অধিকন্তু সর্ব্বদা একত্র থাকার জন্য তাহাদের দোষ দুর্ব্বলতাগুলি মোছলেম-সঙ্ঘের ব্যক্তিগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া যায়। এই দুষ্ট ও জঘন্য অবদান গুলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকায় মুছলমানের জাতীয় জীবনের সংহতি যথাযথভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। ওহোদযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুছলমানদিগকে তাহারা এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন রাখিয়াছিল। এখানে মোনাফেকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমরা এযাবৎ মোমেনদিগকে যে পরিস্থিতে ফেলিয়া রাখিয়াছ, চিরকাল তাহাদিগকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে বিপন্ন করিয়া রাখা আল্লার ন্যায়-বিচারের অনুকূল হইবে না। তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে বাছাই করিয়া দিবেনই। বলা বাহুল্য যে, বিপদ আপদের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া এই বাছাই পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ওহোদযুদ্ধের সংশ্রবে মোনাফেকদিগের অপবিত্র মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং মোমেনদিগের পবিত্র মানসিকতা ইহাতে আরও উজ্জল হইয়া উঠিল।

৪০৫ পরীক্ষার নিয়ম

একে একে মোনাফেকদের নাম করিয়া আল্লাহ জানাইয়া দিতে পারিতেন যে, তাহাদিগের মধ্যকার অমুক অমুক লোক মোনাফেক। কিন্তু তিনি এরূপ করেন না, কারণ ইহা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মের বিপরীত। প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্ম্মের মধ্যদিয়া নিজেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবে, ইহাই তাঁহার নিয়ম। সেই কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া দেন—আল্লার নির্ব্বাচিত রছুলগণ। আল্লার এই চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে মদীনার মোনাফেকগণ তাহাদের হীন মানসিকতার ও জঘন্য কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া নিজেদের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। মুছলমানরাও কার্য্যক্ষেত্রে নিজেদের পবিত্র মানসিকতা ও সুদৃঢ় ঈমানের মধ্য দিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। ফলে রছুলের নির্দ্ধারিত কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া মোমেন ও মোনাফেক স্বতই পৃথক হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য পূর্ব্ব আয়তে তাহাদিগকে কাফের বলিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪০৬ কৃপণতার প্রতিফল

ছুরার প্রথম ভাগে কোরআনের ও তাওহীদের বর্ণনা করার পর যথাক্রমে এহুদী, খৃষ্টান ও মোনাফেকদিগের অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মোনাফেকদিগের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ওহোদযুদ্ধের সার শিক্ষাগুলির বর্ণনাও সঙ্গে সঙ্গে করা হইয়াছে। এখান হইতে আবার এহুদীদিগের বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে।

ধনগৃধ্নতার যে হীন প্রবৃত্তি এহুদীদিগের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আয়তে তাহার নিন্দা করা হইতেছে। এই প্রবৃত্তির ফলে তাহারা কৃপণ-স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। যে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য, সেখানে ব্যয় না করার নাম বোখ্‌ল বা কৃপণতা। এইরূপ কৃপণতা অবলম্বন করিয়া এহুদী জাতি বহু ধন দওলৎ সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল। তাহারা স্বভাবতঃ মনে করিত যে, তাহাদের সঞ্চিত এই ধন সম্পদই তাহাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাদের জাতীয় জীবনের বহু মঙ্গলের কারণ হইবে। কোরআন প্রথমে বলিতেছে—এরূপ মনে করা খুবই ভুল। এই কৃপণতার মানসিকতা তাহাদিগের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অল্প দিনের মধ্যেই কোরআনের এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া গিয়াছে। এই মানসিকতার জন্য দুনয়ার সকল জাতিই তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, জাতির হিসাবে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং সর্ব্বদাই তাহারা ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে থাকে। অতঃপর কোরআন বলিতেছে যে, পার্থিব জীবনের ন্যায়, পারলৌকিক জীবনেও, এই কৃপণতার অবদানগুলি তাহাদের গলায় আজাবের তওকে পরিণত হইবে। কেহ কেহ ইহার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, কৃপণতা করিয়া মানুষ যে ধন সম্পদ সঞ্চয় করিবে, কিয়ামতের দিন সেগুলি দিয়া—কয়দীদের হাসুলীর মত বড় বড় হাসুলী তৈরী

করা হইবে এবং সেই হাসুলী তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে। অন্যরা বলিতেছেন, এখানে ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। "কোন বস্তুর অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য আরবরা বলিয়া থাকে—উহা আমার গলায় পড়িয়া গেল।"—কবির)। ছুরা বানি-এছরাইলের ১৩ আয়তে এই ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় :—

وكل انسان الزمنٰه طائره فى عنقه

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মফলকে আমরা তাহাদের স্কন্ধে অপরিহার্য্য করিয়া দিয়াছি।" বাঙ্গলায়ও আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—"সংসার গলায় পড়িয়াছে", "আমি অমুকের গলগ্রহ হইয়াছি"।

আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে-স্বর্গ ও মর্ত্তের সমস্ত সম্পদের মালেক একমাত্র আল্লাহ। মীরাছ শব্দের অর্থ, উত্তরাধিকারের বস্তু—উত্তরাধিকার নহে। এই অংশে বলা হইতেছে যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালেক হইতেছেন আল্লাহ। সুতরাং তাঁহার কার্য্যে যথাযথভাবে সেই সম্পদ ব্যয় করাই মানুষের কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে সেই সম্পদকে ব্যয় না করার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানুষের নাই।

১৯ রুকু'

১৮০ তাহাদিগের উক্তি আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন— যাহারা বলিয়াছে যে, 'আল্লা'ত হইতেছেন অভাবগ্রস্ত আর অভাবশূন্য হইতেছি আমরা', আমরা নিশ্চয়ই লিখিয়া রাখিব তাহাদিগের (এই) বচনকে এবং তাহাদিগের অন্যায়রূপে নবী-হত্যাকে, আর বলিব—অগ্নি-দণ্ড ভোগ করিতে থাক তোমরা।

١٨٠ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮১ —ইহা হইতেছে তোমাদিগের পূর্ব্ব-সঞ্চিত স্বহস্ত-কৃত কর্ম্মেরই প্রতিফল, (এই দণ্ডের) আরও কারণ এই যে, কোন শ্রেণীর বান্দাদিগের প্রতিই আল্লাহ্ মহা-অত্যাচারী নহেন।

١٨١ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۚ

১৮২ যাহারা বলিয়াছে — নিশ্চয় আল্লাহ আমাদিগের প্রতি এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তাবৎ আমরা কোন রছুলের প্রতি ঈমান আনিব না— যাবৎ না তিনি আমাদিগের নিকট এমন বলি আনয়ন করেন - আগুন

١٨٢ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ

قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞

যাহাকে খাইয়া ফেলে; তুমি (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও (হে এহুদীজাতি!) আমার পূর্ব্বেও'ত বহু রছুল তোমাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সহকারে এবং তোমাদিগের কথিত (হোম বলি) কে সঙ্গে লইয়া, কিন্তু তথাচ তাহাদিগকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে কি কারণে? — যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

১৮৩ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۞

১৮৩ অতএব তোমাকে যদি ইহারা অসত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে (তাহাতে অভিনব কিছু নাই), কারণ তোমার পূর্ব্বকার এমন বহু রছুলও (তাহাদিগের দ্বারা) অসত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ ও লিখিত প্রস্তর ফলক এবং দীপ্তিকর কেতাব।

১৮৪ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ

১৮৪ মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিতে হইবে; আর নিজেদের কর্ম্মফলগুলিকে তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত

হইবে কিয়ামতের দিনে ; সে সময় (নরকের) আগুন হইতে দূরে অবসারিত ও বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইবে যে ব্যক্তিকে, সিদ্ধ মনোরথ হইল সেই ব্যক্তি ; বস্তুতঃ তুন্‌য়ার এই জীবনটা'ত মোহের অবদান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞

১৮৫ (হে মোমেনগণ !) নিশ্চয় তোমরা পরীক্ষিত হইবে নিজেদের ধনে ও প্রাণে, এবং তোমাদিগের পূর্ব্বে কেতাবপ্রদত্ত হইয়াছে যাহারা - তাহাদিগের পক্ষ হইতে আর মোশ্‌রেক হইয়াছে যাহারা - তাহাদিগের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে নিশ্চয়ই বহু ক্লেশদায়ক বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে ; কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযমী হইয়া চল, তবে নিশ্চয় ইহা হইতেছে অভিপ্রেত সঙ্কল্প সাধনা।

١٨٥ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۞

১৮৬ আর কেতাব প্রদত্ত হইয়াছিল যাহারা, আল্লাহ যখন তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন — " তোমরা এই

١٨٦ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ

وَلَا تَكْتُمُونَهُ ز فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

কেতাবকে জনগণের সমীপে অবশ্য অবশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবে এবং তাহাকে (কখনই) গোপন করিবে না!" কিন্তু সেই কেতাবকে তাহারা ফেলিয়া দিল নিজেদের পিঠের পশ্চাতে আর তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে — বস্তুতঃ সে মূল্য কতই না মন্দ[৪১৩]!

১৮৭ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ص فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৮৭ নিজেদের কৃত (পাপ) কর্ম্মের জন্য উৎফুল্ল হয় যাহারা আর নিজেদের অ-কৃত (পুণ্য) কর্ম্মের জন্য প্রশংসিত হইতে পছন্দ করে যাহারা[৪১৪], তাহাদিগের সম্বন্ধে কখনও মনে করিওনা যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ হইয়া বসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮৮ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ع ۝

১৮৮ বস্তুতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত-রাজ্যের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লারই; আর (সেই) আল্লাহ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান[৪১৫]।

টীকা :—

৪০৭ **আল্লাহ অভাবগ্রস্ত**

আল্লার পথে ও আল্লার কাজে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য পূর্ব্বের বহু আয়তে তাকিদ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব রুকুর শেষ আয়তেও এই হিসাবে কার্পণ্যের নিন্দা করা হইয়াছে। একদিকে এই উপদেশ, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে আল্লার সত্য-নবী বলিয়া গ্রহণ করিতে সকলকে তাকিদ করা হইতেছে। এহুদী ও কপট প্রভৃতি এছলামবৈরীদলের নেতারা এই দুইটী নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দুইটী সংশয় পেশ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা পায়। প্রথম সংশয়টীর উল্লেখ এখানে করা হইতেছে এবং দ্বিতীয় সংশয়টী ১৮২ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

যে-আল্লাহ নিজের কাজের জন্য মানুষের কাছে অর্থ-ভিক্ষা করেন, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সত্যকার ঈশ্বর যিনি, ধনের অভাব তাঁহার নাই, মানুষের কাছে ভিক্ষা করার কোন দরকারই তাঁহার হইতে পারে না। মোহাম্মদ যদি সত্যসত্যই আল্লার প্রেরিত হন এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলি যদি বস্তুতই আল্লার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি'ত নিজেই যথেষ্ট ধন-দওলৎ দিয়া মুছলমানদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি আমাদের কাছে অর্থ-ভিক্ষা করিতেছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আমরাই হইতেছি ধনী আর মোহাম্মদের আল্লাহ হইতেছেন কাঙ্গাল ও অভাবগ্রস্ত। অধিকন্তু মোহাম্মদ যে সত্যকার নবী নহেন, তাহাও ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে। এই শ্রেণীর নানারূপ অজ্ঞ-জনোচিত শ্লেষ করিয়া তাহারা এছলামকে জনসাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাইত।

কোন একজন এহুদী এইরূপ উক্তি করায় আলোচ্য আয়তটী নাজেল হইয়াছিল— এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোনই হেতু নাই। কারণ, প্রথমতঃ কোরআনে বা হাদিছে ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আয়তের সর্ব্বত্রই বহুবচনাত্মক সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা কোন একজন লোকের উক্তি হইলে এইরূপ ব্যবহার কখনই সঙ্গত হইত না।

এই শ্লেষ বা সংশয়ের উত্তরের প্রতি পরবর্ত্তী আয়তে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৪০৮ **লিখিয়া রাখা**

লেখা, লিখিয়া দেওয়া ও লিখিয়া রাখা প্রভৃতি পদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিভিন্ন টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে এখানে 'লিখিয়া রাখিব' পদের তাৎপর্য্য :— তাহার প্রতিফল দিব, কদাচ বিনাদণ্ডে ছাড়িয়া দিব না। এখানে এহুদী সমাজকে জাতির

হিসাবে বলা হইতেছে যে, সত্যের বিরোধীতা করিতে তাহারা চেষ্টার ত্রুটী কোন দিনই করে নাই। মিথ্যা রটনা করিয়া, অসঙ্গত সংশয় উপস্থিত করিয়া, এমন কি সাধ্যে কুলাইলে সত্যের বাহক নবীদিগকে হত্যা করিয়া বা হত্যাচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া, সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ তাহারা চিরকালই করিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত পাপের প্রতিফলে আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নমের আজাবে (অথবা কোন জ্বালাময় প্রতিফলে) নিক্ষেপ করিবেন। এই প্রতিফল আল্লার অটল বিধান।

৪০৯ কৃতকর্ম্মের প্রতিফল

এই আয়তটী উপরের আয়তের শেষ অংশ। আল্লাহ তাহাদের অপকর্ম্মগুলিকে বিনা প্রতিফলে যাইতে দিবেন না। এই প্রতিফল হিসাবে তাহাদিগকে জাহান্নমের আগুনে নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিবেন—এই অগ্নিদণ্ড ভোগ করিতে থাক। এই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আরও বলিবেন যে, তোমরা নিজেরা দুনয়ায় যে সব পাপ সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছ, এই দণ্ড তাহারই প্রতিফল মাত্র। এইরূপ প্রতিফল না দিলে অবিচার করা হইত। যেহেতু বিনা কারণে কাহাকে দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করা যেরূপ অন্যায়, কোন মানুষকে তাহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার বা প্রতিফল না দেওয়াও সেইরূপ অন্যায়। ন্যায়বান ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লার পক্ষে এইরূপ অবিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন শ্রেণীর বান্দার প্রতি তিনি এইরূপ মহা-অত্যাচার করিতে পারেন না। এখানে "আবিদ" শব্দের বিশেষ তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছি—"কোন শ্রেণীর বান্দা" বলিয়া। কোন শ্রেণীর বান্দা বলিতে মুছলমান অমুছলমান সকলকে বুঝাইতেছে। 'আবিদ' না বলিয়া 'এবাদ' বলিলে কেবল মুছলমাম বান্দাদিগকে বুঝাইত। আলোচ্য আয়ত হইতে পরোক্ষভাবে বোঝা যাইতেছে যে, নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের সুফল বা কুফল মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে আল্লার সকল শ্রেণীর বান্দাকেই ভোগ করিতে হইবে।

কোরআন পুনঃপুন বলিয়াছে—সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু হইতে বৃহত্তম গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত কোন বস্তুকেই আল্লাহ অনর্থক সৃজন করেন নাই। অর্থাৎ, বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক জীব ও জড়পদার্থকেই আল্লাহ একএকটা বিশেষ ধর্ম্ম দিয়া পয়দা করিয়াছেন এবং সেই সেই ধর্ম্ম-অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের উপর একএকটা কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যগুলি সমস্তই 'আল্লার কাজ।' অরূপ-স্বরূপ আল্লাহ এই সব উপকরণ-উপলক্ষের মধ্য দিয়াই নিজের মঙ্গল-ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন। এই সব কর্ত্তব্যের আবার স্তর আছে, সকল উপকরণের পক্ষে সব কর্ত্তব্যপালন করা সেই জন্য সম্ভব হয় না। গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রবলতর শক্তির দরকার। সেই জন্য মানুষকে তিনি পয়দা করিয়াছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান জীবরূপে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ম্মভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। নিকৃষ্ট জীব ও জড়পদার্থগুলি নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলে, বোধশক্তি

বর্জ্জিত অবস্থায়। তাই কর্ত্তব্যকে তাহাদের প্রকৃতিগতভাবে অপরিহার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মানুষের অন্তরে কর্ত্তব্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যুগপৎভাবে জ্ঞানের ও প্রেমের ভিত্তির উপরে। কারণ অন্যের অসাধ্য গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি তাহাকে পালন করিতে হইবে। অন্ধ জড় বা অজ্ঞ জীবের দ্বারা সৃষ্টির ব্যবস্থা, স্তর ও পর্য্যায়ের পার্থক্য অনুসারে, সেই সব কর্ত্তব্যপালন করা সম্ভবপর নহে। মানুষের কর্ত্তব্যকে জড়াদির ন্যায় প্রকৃতিগতভাবে অপরিহার্য্য করিয়া দেওয়া হয় নাই এই কারণে। অজ্ঞতাবশতই হউক আর দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় হউক, আরবের এহুদী নেতারা এই সত্যটাকে উপেক্ষা করিয়া 'আল্লার কাজের' অন্যায় ও বিকৃত তাৎপর্য্য দিয়া জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিতেছিল। তাই বলা হইতেছে যে, নবীহত্যার ন্যায় তাহাদের এই উক্তিটাও মহাপাতক ও অবশ্যদণ্ডার্হ।

৪১০ হোম বলি

এছলামের সত্যতা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়তের বিরুদ্ধে ইহা এহুদীদিগের দ্বিতীয় সংশয়। এহুদীরা বলিয়াছিল, মোহাম্মদকে আমরা নবীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, এহুদীজাতির প্রতি আল্লার নির্দ্দেশ এই যে, 'যে নবী এরূপ কোরবানের ব্যবস্থা না করিবেন, আগুন যাহাকে খাইয়া ফেলে' তাঁহাকে আমরা সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিব না। মোহাম্মদ তাহার ব্যবস্থা করেন নাই, সুতরাং সদাপ্রভুর নির্দ্দেশ মতে তিনি এহুদী জাতির পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারেন না। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, এহুদী-শাস্ত্রের হোমবলি Burnt Offering বা অগ্নিকৃত উপহারের তাৎপর্য্য ও ইতিহাসটী ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

এহুদীদিগের মধ্যে হোমবলির প্রবর্ত্তন হয় মোশির বা হজরত মুছার আমল হইতে। বাইবেলের সাক্ষ্য অনুসারে স্বয়ং সদাপ্রভু মোশিকে ডাকিয়া ইহার বিধিব্যবস্থাগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। সদাপ্রভু এই নির্দ্দেশে বলিতেছেন:—"হারোণ যাজকের পুত্রগণ বেদির উপরে অগ্নি রাখিবে, ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে।" তাহার পর কোরবানের মাংস বা অন্য বস্তুগুলিকে সেই আগুনের উপরে দিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ইহাই হইতেছে "হোমবলি, বা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার।"—লেবীয় ১—৭, ১০ পদ। ঐ পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২, ১৩ পদে সদাপ্রভু ইহাও আদেশ করিতেছেন যে, বেদির উপরে এই হোমাগ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না।

বাইবেলের এই অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, হোমের আগুনকে পুরোহিতরাই জ্বালাইবেন, ইহা সদাপ্রভুর নির্দ্দেশ। সে আগুন যে স্বর্গ হইতে বা সদাপ্রভুর সন্নিধান হইতে সমাগত হইবে, ইহার সামান্য একটু আভাস ইঙ্গিতও এই মূল ব্যবস্থায় কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আমাদের একদল আধুনিক লেখক বাইবেলের এই অংশটুকু পাঠ করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গ হইতে আগুন নামিয়া আসিয়া বলির মাংস দগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এরূপ দাবী

এহুদীরা করে নাই, করিতে পারে না। কারণ হোমবলির ব্যবস্থায় স্বর্গীয় আগুনের কোনই উল্লেখ নাই। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তফছিরকারগণের প্রদত্ত বিবরণকে অসঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এহুদীরা হজরতের কাছে এইমাত্র বলিয়াছিল যে, এহুদী-শরিয়ত অনুসারে হোমবলির ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত আমরা আপনাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিব না।

আমাদের মতে আধুনিক লেখকগণের এই সিদ্ধান্তটী আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ, এহুদী শরীয়তের অন্য সমস্ত বিধি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করিয়া চলিলেও তাহাতে নবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা থাকিতেছে না, অথচ হোমবলির একটী মাত্র ব্যবস্থাকে অমান্য করিলেই তাঁহাকে আর সত্যনবী বলিয়া মান্য করা যাইবে না, এহুদীদের এরূপ বলার কোন হেতুই থাকিতে পারে না। তাহার পর, তাহারা হজরতের নিকট হোমবলির প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহাকে হজরতের পক্ষে অসাধ্য মনে করিয়া। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, এহুদীরা যে হোমবলির কথা বলিয়াছিল, তাহার আগুন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে, ইহাই ছিল তাহাদের দাবী।

এহুদী ধর্ম্মের ইতিহাস, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ ও বিকারের অতি শোচনীয় ইতিবৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই বিকারের ফলে কালক্রমে এহুদীদিগের মধ্যে এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, বেদির ঐ আগুন প্রথমে সদাপ্রভুর নিকট হইতে সমাগত হইয়াছিল। তাহা একবার নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে, পীর-পুরোহিতরা নানারূপ সাধনা ও যাগযজ্ঞ করিয়া আবার তাহাকে স্বর্গরাজ্য হইতে আমদানী করিয়া লন। হজরত মূছার বহু শতাব্দী পরে বাইবেলের উপকথা সঙ্কলকরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, দায়ূদ ও শলোমনের যাগজজ্ঞের ফলে এই আগুন দুইবার নামিয়া আসিয়াছিল (১ বংশাবলি ২১—২৬, ২ বংশাবলি ৭—১ পদ)।

একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া এহুদীজাতির বাইবেল বা পুরাণ উপাখ্যানখানা পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এক সময় তাহারা স্বর্গের হোমাগ্নিকেই সত্যনবীর একমাত্র নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ এলিজা ও এলিয় ভাববাদীর হোমাগ্নি নামাইয়া আনার উপাখ্যানটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। গল্পটী সংক্ষেপে এইরূপ :—এহুদীবংশের একটা বিরাট অংশ সদাপ্রভুর পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিয়া 'বাআল' নামক কোন পরজাতীয় দেবতার আশক্ত হইয়া পড়ে। এলীয় ভাবদাদী কিছুতেই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, স্থানীয় রাজার মধ্যবর্ত্তীতায় বাআলদেবের যাজকদিগকে চ্যালেঞ্জ দিয়া স্থির করিলেন—বা'ল দেবের পুরোহিতরা একটা বৃষ বলি দিয়া তাহার মাংস বেদির উপর রাখিয়া বা'লদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিবে—স্বর্গ হইতে আগুন আসিয়া আমাদের এই বলিকে গ্রাস করুক! যদি তহোদের প্রার্থনা অনুসারে আগুন নামিয়া বলিকে দগ্ধ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সত্যবাদী, আর তাহাদের ঠাকুর বা'লদেব সত্য ও অন্যথায় তাঁহারা মিথ্যাবাদী

ও তাহাদের ঠাকুরও মিথ্যা। ইহার পর এলিয়ও নিজের ও নিজ সদাপ্রভুর সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য এইরূপ পরীক্ষা দিবেন, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া গেল। সকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বা’লদেবের যাজকরা নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ, নর্ত্তন ও আর্ত্তনাদ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আগুন কিন্তু নামিল না। তখন এলিয় নিজের বৃষটা কোরবাণী করিয়া তাহার মাংস বেদির কাষ্ঠস্তূপে সাজাইয়া দিলেন এবং বাহিনীগণের প্রভু ও এছরাইলীয়দের সদাপ্রভুর নিকট প্রর্থনা করিতে লাগিলেন। ফলে “সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইল এবং হোমীয় বলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল এবং প্রণালীর জলও চাটিয়া খাইল। তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল--সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর” (১ রাজাবলি ১৮—৩৮)।

এই সমস্ত পদ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, সত্যনবীর নিদর্শনস্বরূপ সদাপ্রভুর সন্নিধান হইতে হোমাগ্নি নামিয়া আসার দাবীই এহুদীরা হজরতের নিকট পেশ করিয়াছিল। কোরআন এই দাবীর সঙ্গতি স্বীকার করে নাই, স্পষ্টভাষায় তাহার প্রতিবাদও করে নাই। এহুদীদের দাবীর প্রতিবাদে কোরআন যে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সার এই যে, ‘হে এহুদীজাতি! তোমাদের এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মোহাম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সব রছুলকে তোমরা আল্লার সত্যনবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ, তাঁহারা সকলে নিশ্চয়ই সদাপ্রভুর নিকট হইতে হোমাগ্নি নামাইয়া আনিয়াছিলেন। অথচ তোমাদের স্বীকৃত বাইবেল হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, সেই নবীদিগের মধ্যে অনেককেই তোমরা হত্যা করিয়াছ বা হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছ! সত্যই যদি তোমাদের লক্ষ্য হইবে আর আগুনের মোযেজাই যদি তাহার নিদর্শন হইবে, তাহা হইলে এই সব মহাপাতকের অনুষ্ঠান করা তোমাদিগের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্যের প্রতি বিরোধ করাই এহুদীজাতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

এহুদীদিগের নবীহত্যার প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে এলিয় ভাববাদীর হোমাগ্নি নামাইয়া আনার কেরামত এহুদীদিগের দাবীর প্রধান অবলম্বন, সমসাময়িক এহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও চেষ্টার ক্রটী করে নাই। বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, আগুনের মোযেজা দেখাইবার কিছুদিন পরেই এলিয়কে প্রাণভয়ে প্রান্তরে পলায়ন করিতে হয়। এই সময়ে তিমি সদাপ্রভুর নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়া বলেনঃ—“আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্‌যোগী হইয়াছি; কেননা ইস্রায়েল-সন্তান গণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গদ্বারা বধ করিয়াছে; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে” (১৯—১০, ১৪)। এই এলিয় ভাববাদিও যে অবশেষে এহুদীদিগের খড়্গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবনের ইতিবৃত্তটা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে

তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এলিয়ের কএকজন শক্তিশালী ভক্তও তখন বিদ্যমান ছিল। তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করার জন্য এহুদী প্রধানরা এই নবীকে গুমখুন করিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, এলিয়কে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাওয়ার জন্য "অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ" নামিয়া আসে এবং অবশেষে এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে আরোহন করিয়া স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন। এলিয়ের ভক্তরা ইহা বিশ্বাস করিল না, তাহারা ৫০ জন বলিষ্ঠ লোককে তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত করিল। এই লোকগুলি পূরা তিনদিন খোঁজ করিয়াও এলিয়ের কোন সন্ধান বাহির করিতে পারিল না (২ রাজাবলি ২—১১ হইতে ১৮ পদ)।

এখানে লক্ষ্য করার আর একটা বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর আজগৈবী কেরামতকে কোরআন কোন নবীর সত্যতার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। কোরআনের মতে নবীরা যে সব স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ بينات ও আল্লার বাণী সঙ্গে করিয়া আনেন, তাহাই হইতেছে তাঁহাদের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আয়তের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সত্যটী সহজে নজরে পড়িয়া যাইবে।

৪১১ নবীদিগের সত্যতার নিদর্শন

এই আয়ত হইতে জানা যাইতেছে যে, হজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী রছুলগণ তিনটী জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিলেন :—

(১) বাইয়েনাত—বাইয়েনাঃ শব্দের বহুবচন। ইহার অর্থ :—

الدلالة الواضحة عقليـــة كانت او محسوسة

অর্থাৎ যে প্রমাণের ফলে জ্ঞানের বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির দ্বারা কোন একটা বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যায়, বাইয়েনা বলিতে সেইরূপ যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাদিকে বুঝাইয়া থাকে (রাগেব)। নবীদিগের সত্যতার ইহাই হইতেছে প্রথম নিদর্শন।

(২) জোবোর—জাবুর শব্দের বহুবচন। ইহার ধাতুগত অর্থ, কঠিন ও দৃঢ় বস্তু বিশেষ, প্রস্তর, প্রস্তর নিক্ষেপ করা, প্রস্তরের দ্বারা কূপের গাঁথুনি করা, প্রস্তরের দ্বারা এমারৎ গ্রথিত করা ও লেখা প্রভৃতি। সাধারণতঃ জোবুর শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, লিখিত পুস্তক বা কেতাব। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, জোবোর ও কেতাবে কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কারণ, আয়তে বলা হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীরা আসিয়াছিলেন বাইয়েনাৎ, জোবোর ও কেতাব সঙ্গে লইয়া। সুতরাং জোবোর ও কেতাব নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে। অন্যথায় জোবোরের পর আবার কেতাবের উল্লেখ করায় দ্বিরুক্তি দোষ ঘটিয়া যায়। ইহার উত্তর দেওয়ার জন্য অনাবশ্যক কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। কিন্তু জোবোর শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ হইতেছে প্রস্তর ও লিখন। কাজেই এখানে ইহার সহজ অর্থ হইবে লিখিত প্রস্তরফলক বা আল্‌ওয়াহ। হজরত মূছা এইরূপ আল্‌ওয়াহ বা লিখিত প্রস্তরফলক সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

(৩) আল্-কেতাবুল্ মুনীর :—বিশ্বচরাচরের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়, মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে যে কেতাব।

ফলতঃ নবীদিগের সত্যতার প্রমাণ দাঁড়াইতেছে মোটের উপর দুইটী :—সাধারণ যুক্তিপ্রমাণ এবং আল্লার কেতাব—সেই কেতাবের ভিতরকার নূর বা জ্যোতি।

৪১২ বিপদ ও পরীক্ষা

মুছলমানের সাধনমার্গ অতি বন্ধুর, অতিশয় বিপদসঙ্কুল। এ পথের যাত্রীকে অগ্রসর হইতে হয় নিজের ধন ও প্রাণকে 'হাতে করিয়া'। কেবল ইহাই নহে। এহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাব জাতিরা এবং পৌত্তলিক ও মোশ্‌রেক * সমাজগুলি মুছলমানকে অতি কঠোর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে। এই পরিস্থিতি সমাগত হইবে যখন, তখন মুছলমানের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে ধৈর্য্যধারণ করা। ধৈর্য্য হারাইলে মানুষ মনুষ্যত্বের সমস্ত মহিমা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, ফলে বিচার বিবেচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের শক্তি তখন আর তাহার থাকে না। এই বিচার বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নামই তাক্‌ওয়া বা সংযম। অধীর হইলেই অসংযম আসিবে এবং মুছলমান তাহার আত্মার শক্তি হারাইয়া বসিবে।

১৩শত বৎসর পরে সেইদিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই কোরআনের শাশ্বৎবাণী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—হে মোছলেম জাতি! এই বিপদে তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর, সংযত হইয়া চল, ধীরস্থির পদবিক্ষেপে নিজের সঙ্কল্প সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাক, ইহাই হইতেছে অভিপ্রেত বীর-ধর্ম্ম।

৪১৩ এহুদীদিগের পতনের কারণ

উত্থান পতন সকল জাতিরই আছে, কিন্তু এহুদীজাতির পতনের সীমা নাই, তাহার আর উত্থান নাই। কারণ তাহাদের জাতীয়জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে কেতাবের উপর, সেই কেতাবকে তাহারা অমান্য করিল, তাহার অবমাননা করিল—তাহার কতক অংশের বিকৃত অর্থ করিল, কতক অংশ লুকাইয়া ফেলিল এবং আল্লার সেই কেতাবকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বহু দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহারা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিল নিজেদের স্বার্থপর ও সংকীর্ণ-চেতা পীরপুরোহিতদিগের আদেশ নিষেধের।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া দুনয়ার মুছলমানজাতিকে সাবধান করিয়া বলা হইতেছে—তোমরা যদি আল্লার কেতাবকে বর্জ্জন করিয়া না ফেল, তাহাহইলে শতবিপদের মধ্যেও সে তোমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে। পৃথিবীর সমস্ত আহলে কেতাব ও মোশরেক জাতি একত্র হইয়াও তোমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু এহুদীদিগের ন্যায়

* সকল পৌত্তলিকই মোশরেক, কিন্তু সকল মোশরেক পৌত্তলিক নহে।

তোমরাও যদি কোরআনকে কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে, দূরে--নিজেদের গতিপথের পশ্চাতে—ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে এই পতনের পর তোমরাও আর উত্থানের আশা করিতে পার না।

কোরআন-বর্জ্জিত মোছলেম সমাজ, সাবধান হও !

৪:৪ দুইটী মারাত্মক ব্যাধি

জাতীয় জীবনের দুইটী মারাত্মক ব্যাধির প্রতি এখানে মুছলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। ইহার প্রথমটী হইতেছে পাপ ও অন্যায় কাজ করিয়া মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত না হওয়া, বরং সে জন্য আরও উৎফুল্ল হইয়া ওঠা। ইহা হইতেছে আত্মার দুঃসাধ্য বিকার। দ্বিতীয়টী হইতেছে, বিনা কর্ম্মে ও বিনা সাধনায় credit বা যশ অর্জ্জন করার আকাঙ্খা। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত। জাতির দেহে এই দুইটী রোগ স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিলে, তাহার মুক্তি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

৪১৫ আশার বাণী

স্বর্গ ও মর্ত্তরাজ্যের একমাত্র মালেক হইতেছেন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ। অতএব তোমাদের সাধনাকে আশীর্ব্বাদ মণ্ডিত করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ। তিনি তোমাদিগের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

২০ রুকু

১৮৯ গগন মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃজনে এবং দিবস ও রজনীর পরস্পর অনুবর্ত্তনে, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জন্য নিশ্চয় বহু নিদর্শন নিহিত আছে[২১৬]—

١٨٩ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۚۙ

১৯০ (সেই সব তত্ত্বজ্ঞানী) যাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখিয়া থাকে দণ্ডায়মান[২১৭] ও উপবিষ্ট ও শায়িত (সকল) অবস্থায় এবং (সঙ্গে সঙ্গে) গভীরভাবে চিন্তা করিয়া থাকে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজন (-নৈপুণ্য) সম্বন্ধে, (ফলে তাহাদের অন্তর আকুল স্বরে বলিয়া ওঠে) হে আমাদের প্রভু! এ সমস্তকে তুমি অনর্থক-ভাবে সৃজন কর নাই, না না, মহিমময় তুমি, (তোমার সৃষ্টি অনর্থক কখনই হইতে পারে না), অতএব নরকের শাস্তি হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর[২১৮]!

١٩٠ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

১৯১ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় নরকে প্রবেশ করাও যাহাকে তুমি, বস্তুতঃ তাহাকে তুমি

١٩١ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ

فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ◎

লাঞ্ছিত করিয়া দিলে ; আর (সেই লাঞ্ছনার দিনে) কেহই থাকিবে না অত্যাচারীদিগের সহায় !

١٩٢ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ◎

১৯২ হে আমাদের প্রভু ! এক আহ্বানকারীর[১১৯] ডাক আমরা শুনিলাম, তিনি ঈমানের পানে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন— 'হে লোক সকল ! নিজেদের প্রতিপালক-প্রভুতে বিশ্বাসবান হও !' ফলে ঈমান আনিয়াছি আমরা, হে আমাদের প্রভু ! অতএব আমাদিগের অপরাধ-গুলিকে তুমি আমাদের তরে ক্ষমা করিয়া দাও, এবং আমাদিগের মন্দ (ভাব ও কর্ম্ম) গুলিকে আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদিগের (সংশ্রব) হইতে বিলুপ্ত করিয়া দাও, আর (সঙ্গে সঙ্গে) এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও, যাহাতে আমাদের মরণ হয় সাধুসজ্জনদিগের দলভুক্ত হইয়া !

١٩٣ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ◎

১৯৩ আর হে আমাদের প্রভু ! তুমি নিজ রছুলগণের মধ্যবর্ত্তিতায় যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছ, তাহা আমাদিগকে (ইহকালে) দান কর এবং (পরকালে-) কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে যেন লাঞ্ছিত করিও না ; নিশ্চয় ওয়াদার ব্যতিক্রম তুমি কখনই কর না ।

١٩٤ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ج بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ج فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۞

১৯৪ সুতরাং তাহাদের প্রভু (এই বলিয়া) তাহাদিগের ডাকে সাড়া দিলেন যে, কোন কর্ম্মীর কর্ম্ম (-ফল) কে আমি কখনও পণ্ড করিয়া দেই না[৪২১]—তা' সে পুরুষ হউক বা নারী হউক, একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত তোমরা—অতএব হেজ্‌রৎ করিয়াছে যাহারা আর নিজেদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে যাহারা এবং সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও নিহত হইয়াছে যাহারা, তাহাদিগের মন্দগুলিকে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের (সংশ্রব) হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং এমন কানন-কলাপে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া দিব, যাহার তলদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদী-নির্ঝরমালা — আল্লার সন্নিধান হইতে (আগত) পুণ্যফলরূপে; আর আল্লার হুজুরে (নির্দ্ধারিত) আছে সুন্দরতর পুরস্কার।

١٩٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ط

১৯৫ আর কাফের হইয়াছে যাহারা, নগরে নগরে তাহাদিগের আধিপত্য দেখিয়া (হে মোছলেম) তুমি যেন প্রপঞ্চিত হইও না;[৪২২]—

১৯৬ অতি অল্পসময়ের অবদান এগুলি, অতঃপর তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নম ; কতই না মন্দ সে আবাস !

١٩٦ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৯৭ কিন্তু নিজেদের প্রভু সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলে যাহারা, তাহাদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) আছে এমন কানন-কলাপ, যাহার তলদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদী-নির্ঝরমালা— সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী— আল্লার সন্নিধান হইতে (আগত) আতিথেয়রূপে ; আর আল্লার সমীপে যাহা আছে, সজ্জনগণের জন্য তাহা (হইতেছে) উৎকৃষ্টতর।

١٩٧ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

১৯৮ আর আহ্লে-কেতাবদিগের মধ্যে এরূপ লোকও নিশ্চয়ই আছে, যাহারা ঈমান আনয়ন করে আল্লার প্রতি, এবং তোমাদিগের নিকট যাহা নাজেল করা হইয়াছে ও তাহাদিগের নিকট যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহার প্রতি— আল্লার প্রতি বিনয়-অবনত অন্তরে, আল্লার আয়তগুলিকে

١٩٨ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا

তাহারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে না ; এইযে লোক-সমাজ, নিজ প্রভুর সন্নিধানে ইহাদিগের অজূরা (নির্দ্ধারিত) রহিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (হইতেছেন) ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

১৯৯ হে মোমেন সমাজ! তোমরা নিজেরা ধৈর্য্যশীল হইবে ও ধৈর্য্যশীল হইতে পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং (জাতির শত্রুদিগের) সম্বন্ধে সদা-সতর্ক ভাবে অবস্থান করিবে, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিবে — যেমতে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।[৪২৩]

১৯৯ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع

টীকা :—

৪১৬ স্বষ্টির মধ্যে স্রষ্টার নিদর্শন

ছুরা বকরার ১৫৩ টীকায় এই আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, আল্লার স্বষ্টির মধ্যেই জ্ঞানবান সমাজের অসংখ্য নিদর্শন নিহিত আছে। এখানে ১৯০ হইতে ১৯৩ আয়ৎ পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানবানদিগের লক্ষণ ও পরিচয় বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীর বর্ণনায় জানা যায়—হজরত রছুলে করিম অর্দ্ধ-রাত্রের পর তাহাজ্জদের জন্য শয্যাত্যাগ করিয়া ছুরা আলে-এম্‌রানের শেষ দশটী আয়তের আবৃত্তি করিতেন (বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, নাছাঈ প্রভৃতি)।

৪১৭ জেক্‌র বা "মনঃ-যোগ"

জেক্‌র-শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণে রাখা। আল্লাকে জেক্‌র বা স্মরণ করা অর্থে, আল্লার সহিত মনের "যোগ" সাধন করা। এই জেক্‌র বা যোগ মনেরই একটা ভাব বা সাধনার নাম। শব্দের সহিত মূলতঃ তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু মনের কোন ভাব অথবা মস্তিষ্কের কোন চিন্তাই ভাষার বাহনকে অবলম্বন না করিয়া আত্মপ্রকাশই করিতে পারে না।* বলা বাহুল্য যে, এই যোগ বা জেক্‌রের জন্য শব্দের আশ্রয়গ্রহণের আবশ্যক করে না। তবে এক শ্রেণীর লোক এরূপ আছেন, শব্দের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা স্মরণীয় বিষয়টীর প্রতি মনঃসংযোগই করিতে পারেন না। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মুছলমান-নামধারী এক শ্রেণীর তথাকথিত "মারফতী ফকির" আল্লার বিভিন্ন নাম ও কলেমা লইয়া যেরূপ বিকট চিৎকার আরম্ভ করিয়া থাকে এবং "জর্ব্ব" "লতীফা" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যে উৎকট ও উদ্ভট কৃচ্ছ্র সাধনার প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহা জেক্‌র নহে, এছলামের সঙ্গে তাহার কোনই সম্বন্ধ সংশ্রব নাই। ইহা একদিকে এ দেশের বামমার্গী প্রভৃতি ভ্রান্ত "সাধক" সমাজের অন্ধ-অনুকরণ, অন্যদিকে "রিয়া" বা লোক দেখান বুজুর্গী প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। আল্লার সহিত মনঃসংযোগ ঘটিবে যখন যাহার, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ উৎকট লম্ফঝম্প বা উদ্ভট হৈ হৈ চিৎকার আদৌ সম্ভবপর নহে। শেখ ছা'দী যথার্থই বলিয়াছেন:—

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز   کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدعیان در طلبش بے خبرانند   وان راکه خبر شد، خبرش باز نیامد

হে প্রভাতের বিহঙ্গ! প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ কর, পতঙ্গের নিকট হইতে। দেখ, সর্ব্বস্ব দগ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিল সে, অথচ এতটুকু শব্দও বাহির হইল না। তাঁহার পাওয়ার আকাঙ্খার এইযে দাবীদারের দল, ইহারা সব তত্ত্বজ্ঞানহীন—তত্ত্বলাভ করিয়াছে যে, তাহার তত্ত্ব আর কখনও পাওয়া যায় নাই।

৪১৮ ফেক্‌র বা "ধ্যান"

জ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ অবদান সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া, তাহা হইতে একটা পরোক্ষ সত্যের সন্ধান লাভের চেষ্টা করা,—ফেক্‌র শব্দের সাহিত্যিক তাৎপর্য্য ইহাই। এখানে বলা হইতেছে যে, যাহাদের জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টির অবদানগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তায় লিপ্ত হয় যাহারা, সৃষ্টি হইতেই তাহারা স্রষ্টার নিদর্শন জানিতে পারে। ফলতঃ জেক্‌র মনের ও ফেক্‌র মস্তিষ্কের সাধনা। জ্ঞানের সাহায্যে মন ও মস্তিষ্কের একত্র সংযোগ সাধন করিয়া সত্যলাভার্থে ধ্যান ও ধারণায় আত্মনিয়োগ করিবে যাহারা, তাহাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনাআপনি ধ্বনি উঠিবে—"প্রভুহে! বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি,

* অবশ্য শেষস্তরের সাধন ও সাধকদের কথা স্বতন্ত্র।

তোমার সৃষ্টির কোন অংশ, কোন অণু অনর্থক নহে।" মানুষ হইতেছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সব অপেক্ষা মহৎ, তাহার জীবনের সার্থকতা সকলের অপেক্ষা অধিক।

সৃষ্টির এই বিরাট বিশাল গ্রন্থ, আল্লার অস্তিত্বের ও মহিমার চরম ও পরম দর্শন। নাস্তিক হও, অজ্ঞতাবাদী হও বা সন্দেহবাদী হও, একবার কোরআনের শিক্ষা-অনুসারে এই স্পষ্ট ও সহজ-প্রাপ্য দর্শনের শরণ গ্রহণ কর। বিদ্যার বদ-হজম্ দূর করিয়া, পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত সংস্কারকে বিসর্জ্জন দিয়া, সাত্তিক ও সত্যাশ্রয়ী মন লইয়া জীবনের অন্ততঃ দুইএকটা মাসও এই ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিয়া দেখ; সব সন্দেহ, সব বিভ্রম আপনাআপনি দূর হইয়া যাইবে, তোমার আত্মা আল্লার মহিমার অনুভূতিতে স্বতই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এ জন্য ফিলোজফীর চির-অবরুদ্ধ লৌহ-কপাটে মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যা করার আর আবশ্যক করিবে না।

৪১৯ মোনাদী

"নেদা" হইতে উৎপন্ন। নেদা-অর্থে ডাক দেওয়া, আহ্বান করা। মোনাদী-অর্থে আহ্বানকারী। তফছিরকারগণের অধিকাংশের মতে "আহ্বান-কারী" শব্দে এখানে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বুঝাইতেছে। কাহারও কাহারও মতে "আহ্বান-কারী" হইতেছে কোরআন। এমাম রাগেব বলেন—এখানে "আহ্বানকারী" বলিয়া মানবের জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমাদের মতে আহ্বানকারী বলিয়া হজরতকেই বোঝান হইয়াছে। কোরআন হইতেছে তাঁহার আহ্বানের চির-উদাত্ত ধ্বনি, আর জ্ঞান হইতেছে সেই আহ্বানকে আত্মাগত করাইয়া দেওয়ার প্রধানতম উপকরণ।

৪২০ আল্লার ওয়াদা

নবীদিগের মারফতে সমাগত আল্লার শাশ্বত প্রতিশ্রুতি এইযে, নবীর অনুসরণকারী মোমেনগণ যদি সত্যকারভাবে বিশ্বাসী হয় এবং সেই বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় যদি যথাযথভাবে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষের সমস্ত দুরভিসন্ধি পণ্ড করিয়া দিয়া সত্যকে আল্লাহ জয়যুক্ত করিবেনই। ছুরা এবরাহিমে বলা হইয়াছে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র যদি এরূপও হয় যাহাদ্বারা পর্ব্বতমালাও স্থানচ্যুত হইয়া যাইতে পারে, তবুও আল্লাহ তাহাকে পণ্ড করিয়া দিবেন। ইহার পরেই বলা হইতেছে—

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ، ان الله عزيز ذو انتقام

"অতএব তুমি মনে করিও না যে, আল্লাহ তাঁহার রছুলগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ হইতেছেন প্রবল, প্রতিফল-দানকারী (৪৭)।" ছুরা মোমেনের ৫১ আয়তে বলা হইতেছে—

انا لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحيوة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد

"আমাদের রছুলগণকে আর (তাহাদের অনুসরণকারী) মোমেনবর্গকে আমরা নিশ্চয় জয়যুক্ত করিব—পার্থিব জীবনে এবং পরকালে কিয়ামতের দিনে।"

মোমেনগণ এখানে প্রার্থনা করিতেছেন--হে আমাদের প্রভু! তুমি নিজ রছুলগণের মারফতে যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দান করিয়াছ, আমাদিগতে তাহা পূর্ণ কর। অর্থাৎ যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য দিয়া আমাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতির উপযুক্ত পাত্ররূপে গঠন করিয়া লও!

সত্য ও তাহার বাহকগণ পরিণামে জয়যুক্ত হইবে আর অসত্য ও তাহার বাহকগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই হইতেছে আল্লার সেই শাশ্বত ও সনাতন প্রতিশ্রুতি।

৪২১ জয় কর্ম্ম-সাপেক্ষ

এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ বলিতেছেন যে, কোন কর্ম্মীর কর্ম্মফলকে আমি কখনই পণ্ড করিয়া দেই না। অর্থাৎ, এই প্রতিশ্রুত বিজয়লাভ মোমেনদিগের কর্ম্ম ও সাধনার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বিজয়লাভের জন্য যে সাধনার একান্ত আবশ্যক, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া তোমরা যদি কেবল "দোওয়া" করিয়াই ক্ষান্ত থাক, তাহা হইলে সে প্রতিশ্রুতির আশা তোমরা করিতে পার না। এই সাধনার পরিচয় এই ছুরায় যথেষ্ট স্পষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে।

ছুরা মোমেনের উদ্ধৃত আয়তের সহিত আলোচ্য আয়তটীর একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আল্লার এই প্রতিশ্রুতি কেবল পরকালের নাজাৎ বা বেহেশ্‌তলাভে সীমাবদ্ধ নহে। এই জীবনে দীন হীন, লাঞ্ছিত ও পরপদদলিত অবস্থায় কোন গতিকে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী করিয়া লওয়া আর পরকালের সুখ-সৌভাগ্যের আশায় আত্মবঞ্চনা করিয়া যাওয়া, কোরআনের আদর্শ কখনই নহে। পারলৌকিক জীবনের ন্যায় মুছলমানের পার্থিব জীবনও সকল আনন্দে, সকল গৌরবে ও সকল মহিমায় জয়মণ্ডিত হইবে—ইহাই এছলামের শিক্ষা ও কোরআনের আদর্শ।

আয়তে ইহাও বলা হইতেছে যে, কর্ম্মে ও কর্ম্মের পুরস্কারে জাতির সকল ব্যক্তির সমান অধিকার আছে, পুরুষ ও নারী বলিয়া এছলামে কোন পার্থক্য নাই। কারণ পুরুষ ও নারী "একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত"—অর্থাৎ ইহাদের সমবায়ে জাতি বা জমাআৎ সংগঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অধিকার ও দায়িত্ব পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান। ইহা এছলামের একটা অপ্রতিম বৈশিষ্ট্য, জগতের সকল "ধর্ম্মশাস্ত্রই" নারীকে এ-অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

৪২২ আশার বাণী

১৯৫ ও ১৯৬ আয়তে মুছলমানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—নগরে নগরে কাফেরদিগের আধিপত্য দেখিয়া তুমি যেন প্রপঞ্চিত হইও না, অর্থাৎ হতাশ ও কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িও না। তাহাদের এ আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হইবে না।

এখানে "কাফের" বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে "কাফেরদিগের আধিপত্য" বলিতে মক্কার মোশ্‌রেকদিগের আধিপত্যকে বুঝাইতেছে। আবার কাহারও কাহারও মতে মদীনার এহুদীরাই এখানে লক্ষ্য। কিন্তু এই দুই মতের কোনটাকেই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, যে সময় ছুরা আলে-এম্‌রানের শেষ রুকু' নাজেল হইয়াছে, তখন মক্কার কোরেশ বা মদীনার এহুদীদিগের প্রাধান্য ও আধিপত্যের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে সময় নগরেনগরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তারিত হওয়া'ত দূরের কথা, কর্ম্মফলের অভিশাপে নিজেদের দেশে আত্মরক্ষা করিয়া থাকাই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এ সময়ে "নগরে নগরে" মক্কার মোশ্‌রেক বা মদীনার এহুদীদিগের কোন "আধিপত্য" ছিল না, বা তাহার জন্য মুছলমানদিগের "প্রপঞ্চিত" হওয়ারও কোন আশঙ্কা ছিল না। পক্ষান্তরে, পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ছুরা আলে-এম্‌রানের প্রথম হইতে ১৯ রুকু' পর্য্যন্ত খৃষ্টানদিগের কথাই মুখ্যতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১৯৮ আয়তেও তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। সুতরাং ছুরার প্রধান আলোচ্য এবং এই আয়তের উপক্রম-উপসংহারের দিক দিয়া বিচার করিলে স্বতঃ মনে হয় যে, আলোচ্য আয়তেও সেই খৃষ্টান জাতির ভাবী প্রভুত্ব ও আধিপত্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মুছলমানকে বলা হইতেছে—তোমার জাতীয় জীবন প্রথমবার জয়যুক্ত হওয়ার পর, তোমাদের কর্ম্মফলে আবার খৃষ্টান জাতির উত্থান হইবে, নগরে নগরে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দুর্দ্দিন সমাগত হইলে খৃষ্টান জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া মুছলমান যেন প্রপঞ্চিত, আত্মবিস্মৃত ও আদর্শ বর্জ্জিত না হইয়া পড়ে।

সেই দুর্দ্দিন আজ সমাগত হইয়াছে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এইযে, কোরআনের সতর্ক-বাণীকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, মুছলমান আজ খৃষ্টান-প্রভাবে এতদূর প্রপঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের অনেকে সেই প্রপঞ্চকেই জাতির জীবন-বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে!

৪২৩ সফলতার উপকরণ

জ্ঞান ও কর্ম্মের দিক দিয়া জাতির জীবনকে সুগঠিত করিয়া তোলার এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখার জন্য যে যে উপকরণের দরকার, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান হইতেছে 'ছবর' বা ধৈর্য্য। মোমেনের কর্ত্তব্য হইবে, প্রত্যেক সাধনায় ও সাধনার প্রত্যেক পরীক্ষায় নিজে ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকা এবং অন্য সমস্ত মুছলমানই যাহাতে এরূপ ক্ষেত্রে ধৈর্য্যহারা না হয়, তাহার অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাওয়া। পূর্ব্বের বিভিন্ন টীকায় এই ছবর বা ধৈর্য্যের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ধৈর্য্য সম্বন্ধে আদেশ দেওয়ার পর বলা হইতেছে و رابطوا "রাবেতু"। ইহা ربط ধাতু ধাতু হইতে উৎপন্ন। শত্রু যেমন তোমাকে আক্রমণ করার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তুমিও সেইরূপ তাহার মোকাবেলায় নিজের ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেছ,

অভিধানে ইহাই "রাব্‌ত"-শব্দের মূল অর্থ। শত্রু তোমাকে আক্রমণ করার অথবা অন্য প্রকারে তোমার অনিষ্টসাধন করার জন্য যে সঙ্কল্প বা ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহার মোকাবেলা করার জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকাকেই ব্যবহারে "রব্‌ত" বলা হয়। শত্রুদিগের সঙ্কল্প ও অভিসন্ধিগুলি যথাযথভাবে জ্ঞাত হওয়া এবং তাহার প্রতিবিধানের উপযুক্ত সম্পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া সতত প্রস্তুত থাকাই হইতেছে এই সতর্কতা। *

* কেহ কেহ মনে করেন, এক নামাজের পর হইতে অন্য নামাজের সময় পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকার নামই রেবাৎ। ইহা খুবই অসঙ্গত অভিমত। হজরত আবু-হোরায়রা প্রভৃতির বর্ণিত দুইএকটী রেওয়ায়তে এরূপ বলা হইয়াছে, সত্য। কিন্তু رباط فی سبیل اللّٰه সম্বন্ধে হাদিছের বিশ্বস্ত পুস্তকগুলিতে যে অসংখ্য রেওয়ায়ৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অন্যায় হইবে (দেখ—মুহীত)। তাহার পর, জেহাদ-শব্দ চেষ্টা ও সাধনা-অর্থেও ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্যান্য কোন সৎকার্য্যকেও হজরত রছুলেকরিম "জেহাদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—এই অজুহাতে সর্ব্বত্র জেহাদকে "চেষ্টা করা" প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করা যেরূপ ঘোরতর অন্যায়, হজরত আবু-হোরায়রা প্রভৃতির ঐ বর্ণনাগুলির দোহাই দিয়া সর্ব্বত্র রেবাৎকে নামাজের এন্তেজার বলিয়া গ্রহণ করাও সেইরূপ অন্যায় হইবে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদিছে জেহাদ ও রেবাৎ প্রভৃতি শব্দের অন্য প্রকার প্রয়োগগুলি allegorical (مجاز) বা রূপকভাবে করা হইয়াছে। রূপকের স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকিলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই শব্দগুলিকে তাহাদের حقیقت বা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করিতেই হইবে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব প্রণীত
"মোস্তফা-চরিত" ও "আমপারা"
—সম্বন্ধে দেশের অভিমত—

"মোস্তফা-চরিত সম্বন্ধে বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও মনীষীবৃন্দ কি বলেন দেখুন ঃ—

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র "দি মুসলমান"এর প্রবীণ সম্পাদক **মওলবী মুজিবর রহমান সাহেব** বলেন :—"মওলানা আকরম খাঁর এই গ্রন্থ মওলানা শিবলীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (সিরতনুনবী) অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইয়াছে।... ... ... তিনি (মওলানা আকরম খাঁ সাহেব) হজরতের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ঘটনাকে কোরান এবং হাদিসের উক্তি সমূহের সহিত কঠোর সমালোচনামূলক তুলনার অগ্নি পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।.........আমরা আজ এমন একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ লাভ করিয়াছি,—যাহা সম্পূর্ণতা, ব্যাপকতা এবং ভ্রান্তিহীনতার দিক দিয়া বিশ্বের যে কোন ভাষায় লিখিত হজরতের শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থের সহিত তুলিত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।"

মোসলেম-বঙ্গের গৌরব, বহু ভাষাবিদ, অধ্যাপক **ডাক্তার মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এম, এ, বি, এল, ডি, লিট** লিখিয়াছেন :—"আপনি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের পুচ্ছগ্রাহিতা ত্যাগ করিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদে পদে গবেষণা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার "মোস্তফা চরিত" হজরতের সমস্ত জীবন-চরিতের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে করি।......আপনার এই দানের জন্য বাঙ্গালী মুসলমান ধন্য হইয়াছে। আপনার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে।"

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর, নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবক, **হাজী পীর বাদশাহ্ মিঞা সাহেব** বলেন :—"আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, বাঙ্গলা ভাষায় এমন কি উর্দ্দু ভাষায়ও কোরান, বিশ্বস্ত হাদিস ও তফসিরের অবলম্বনে লিখিত এরূপ পুস্তক আর নাই।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক মনীষী **শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয় বলেন :— ... ... "সাহিত্য হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মওলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা-চরিত।"... ... যদি বলি যে "মোস্তফা-চরিত" বাংলা ভাষায় লিখিত চরিত-কাহিনী সমূহের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক, তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না, বুঝিতে হইবে। এরূপ Critical এবং well-documented biography জগতের যে কোন সাহিত্যের সম্পদরূপে

গণ্য হইবার যোগ্য। দুঃখের বিষয় এমন অমূল্য গ্রন্থেরও শিক্ষিত হিন্দু সমাজে তেমন আদর নাই। নানা কারণে ইহা যার পর নাই পরিতাপও ক্ষোভের কথা। আমরা মুখে কেবল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলি। শুধু মুখে বলি তাহা নহে—এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার মত খাঁটী কথা যে, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের গতি নাই,—গতি নাই,—গতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য, সম্প্রীতি আসিবে কোথা হইতে? খালি Politics হইতে ইহা আসিতেই পারে না; কারণ Politics দ্বন্দ্বের স্থান; সেখানে Right, Privilege অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি, ভাগ-বাটোয়ারার কথা প্রতি পলে উত্থিত হয়।......হিন্দু বলিতে পারেন,—মুসলমান মত, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভাবচিন্তার ধারা জানিব কি প্রকারে? মুসলমান বাংলা সাহিত্যের তেমন আলোচনা করেন না, বা বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রচার করিবার চেষ্টা করেন না। এতদিন এ কথা বলা চলিত, কিন্তু আর তাহা বলা চলে না। মওলানা আকরম খাঁর দুইখানি পুস্তক "মোস্তফা-চরিত" ও "আমপারা" এই অভাব পূরণ করিয়াছে।"

কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সভাপতি, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী সাহেব Bar-at-law, ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যিকে" এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন আমাদের মহানবীর ঘটনা-বহুল জীবনকে সাহিত্যের সূক্ষ্ম তুলিকায় প্রতিফলিত করা বড় সহজ কাজ নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে ব্যর্থ মনোরথ...হয়েছেন। এটি আমাদের কম গৌরবের কথা নয় যে, আমাদের একজন বাঙ্গালী মুসলমান এ বিষয়ে যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যা আমরা কল্পনাও করিতে সাহস করিনি, তাই তিনি বাস্তবে পরিণত করিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর এই গ্রন্থ পড়তে পড়তে আমরা একেবারে তন্ময় হয়ে যাই;—পারিপার্শ্বিক জীবনের কথা আমরা একেবারে ভুলে যাই;—দেশ, কাল এবং সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করে আমরা সাফা আর মারওয়ার পাহাড়তলীতে উপস্থিত হই। আর সেই 'সরওয়ারে কায়েনাতের' দিদার লাভ ক'রে প্রকৃতই ধন্য হই। আর যে শক্তিশালী লেখকের অছিলায় আমরা এই একবাল লাভ করি, তাঁকে তখন "মারহাবা" না বলে থাকতে পারি না।

পুস্তকের বর্ণনা কতদূর সুন্দর হ'য়েছে, পাঠক নিম্নে উদ্ধৃত এবারত থেকেই তার বিচার করুন। হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ ইস্‌লামের একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। মওলানা সাহেব সেই ঘটনাটীর বয়ান এইভাবে করেছেন :—

—"ওমর কোরেশ বংশজাত প্রথিতনামা বীর। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজোদৃপ্ত নয়ন যুগল, উজ্জ্বল লোহিতাভ দেহকান্তি, সুগম্ভীর বদন মণ্ডল; তাঁহার সর্ব্বজন-বিদিত শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত মিলিয়া তাঁহার নামে বিশেষ গুরুত্বের

সৃষ্টি করিয়াছিল। ওমর পূর্ব্বে এছলামের যে ঘোর শত্রুতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এহেন ওমর বামদেশে দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত করতঃ আকরমের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। হজরত আবুবকর, হামজা, আলী প্রভৃতি সকলেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন ছাহাবী ছিদ্র পথ হইতে দেখিলেন ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ওমরকে এই অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া হজরতকে বলিলেন—"খাত্তাবের পুত্র ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।" বীরবর আমির হামজা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন,—তাহাতে কি?—আসিতে দাও।

গর আজ্ রাহে-সেদ্ক আমাদা মারহাবা,
ওগার বাশাদ্ উরা বা খাতের দগা।
বা তেগে কে দারাদ্ হামায়েল ওমর,
তনাশ রা সোবক্ সার সাজম্ জে সর্। *

'যদি সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, মারহাবা, আসুন! অন্যথায় তাঁহারই তরবারী দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত করিব।' কিন্তু ইহাতে হজরত একটুও বিচলিত হইলেন না,—ওমর কি করিতে পারে? তাঁহার রক্ষক সর্ব্বশক্তিমান প্রভু—যে তাঁহার সঙ্গে আছেন। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, আসিতে দাও।

ওমর গৃহে প্রবেশ করিলে, হজরত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সবলে ঝটকা দিয়া বলিলেন—'আর কতদিন, ওমর! আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে?' লজ্জিত অনুতপ্ত ওমর, ভক্তিগদ্-গদ্ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'মহাত্মন্! আমি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যই আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। মোস্তফা-চরণের দাসানুদাস ওমর আজ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছে যে, সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না, এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রছুল।'

অনুতাপ, ভক্তি ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে "কলেমা" পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে আল্লার নামের জয়গান শ্রবণ করিয়া হজরত উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিলেন—আল্লাহো-আকবর। উন্মুক্ত প্রান্তর পার হইয়া কাবার প্রান্তর-প্রাচীরকে কাঁপাইয়া সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল—"আল্লাহো-আকবর।"

বলুন দেখি, পাঠক! সমস্ত ঘটনাটী কি আপনার চোখের সামনে আলোক-চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে না? ঘটনার এই জ্বলন্ত বর্ণনা-সমাবেশে গ্রন্থখানি এমন অপূর্ব্ব সজীবতা

---

* گـر از راه صـدق آمده مـرحبا ا
وگـر بـاشـد اورا بخاطـر دغا
بـه تیغـے کہ دارد حمـایل عمـر
تـنـش را سبکسـار سـازم زسـر

লাভ ক'রেছে যার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মৃত প্রাণও সজীব হ'য়ে উঠে। যে বাঙ্গালী মুসলমান এই গ্রন্থ পড়েন নি, তিনি প্রকৃতই এক মূল্যবান সাহিত্য-রস থেকে বঞ্চিত আছেন।

"মোস্তফা-চরিত" কেবল হজরতের জীবন-কাহিনী নয়। আরবের সেই অভূতপূর্ব্ব, চিরস্মরণীয় যুগটী লেখকের সুনিপুণ লেখনী স্পর্শে, জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আমরা কেবল আজ হজরতকেই দেখি না; উভয় দলেরই প্রথিতনামা ধুরন্ধরদিগকে আমরা জীবন্ত, মূর্ত্ত অবস্থায় দেখিতে পাই। কখনও আমরা দেখি,—দুষ্ট আবু জেহেল তার কুটীল চক্ষু পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কখনও দেখি আবুসুফিয়ান ভীত, শঙ্কিত পাদক্ষেপে শিবির থেকে শিবিরান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটাছুটি ক'রছে। পক্ষান্তরে আবার কখনও কোরেশ-শ্রেষ্ঠ আবুতালেবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাদের কাণে বজ্র-নির্ঘোষের মত বেজে উঠে, কখনও আমির হামজার তল্‌ওয়ারের দ্যুতি আমাদের চোখ ঝল্‌সে দেয়,—আবার কখনও বীরকেশরী আলীর হুঙ্কারে আমাদের শরীরকে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে।

সেই প্রাতঃস্মরণীয় মোস্‌লেম মোহাজের ও আন্‌সারগণ আমাদের মানসপটে আমাদেরই নিকটতম আত্মীয় অন্তরঙ্গদের মত বীরদর্পে, উন্নত মস্তকে, ভীতিশূন্য হৃদয়ে পাদচারণা করিতে থাকেন। তাঁদের জলন্ত তেজ, তাঁদের অচল-অটল ঈমান, তাঁদের আত্মত্যাগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই দুর্ব্বল প্রাণের মধ্যেও সংক্রমিত হ'য়ে উঠে। আপনা থেকেই আমরা তখন তাঁদের সমস্বরে চীৎকার করে উঠি—"আল্লাহো-আক্‌বর!"—"আল্লাহো-আক্‌বর!"—"লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলুল্লাহ্।"

"ভারতবর্ষ" বলেন:—"হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র জীবন-চরিত ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আরও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই মোস্তফা-চরিতের ন্যায় সুবৃহৎ পুস্তক আর বাহির হয় নাই। এই আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকেও মোস্তফার জীবন কথা শেষ হয় নাই—আরম্ভ হয় নাই বলিলেই ঠিক হয়; ইহা মাত্র উপক্রম ও ইতিহাস বিভাগ; পরবর্ত্তী গ্রন্থে জীবন-কথা বিবৃত হইবে বলিয়া খ্যাতনামা সুধী গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন। গতানুগতিক ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন-কথার আলোচনা না করিয়া শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; প্রমাণ ও যুক্তিকে মূল ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত! সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের নিকট আমরা ইহাই আশা করি। এই গ্রন্থের ভাষা এমন সুন্দর, লিপি-কুশলতা এমন প্রকৃষ্ট ও যুক্তি-পরম্পরা এমন সুসংবদ্ধ যে আমরা গ্রন্থকার মহোদয়কে অসঙ্কোচে বলিতে পারি, তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রকার একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। শ্রীযুক্ত আকরম খাঁ মহোদয় সে অভাব পূরণ করিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। (১৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা—আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল)

"আমপারা" সম্বন্ধে মনীষীবৃন্দ ও বিশিষ্ট সংবাদপত্র কি বলেন দেখুনঃ—

বঙ্গের গৌরব অক্লান্ত কর্ম্মবীর, সর্ব্বজন-বিদিত আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে, টি বলেনঃ—"আপনার উপহার প্রদত্ত কোর-আন শরীফ আমপারা' সাদরে গ্রহণ করিমাম। বলা বাহুল্য, আমি ইহার প্রতি ছত্র যত্নের সহিত পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। এই যে "কারাগারের সওগাত" ইহা পড়িয়া John Banyan এর Pilgrim's Progress-এর কথা মনে পড়ে। তিনিও কারাগৃহে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এতদিন আমরা Stanley Lanepool প্রভৃতির নিকট হইতে এসলাম ধর্ম্মের তথ্য অবগত হইতাম। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মোসলমানগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। টীকা ও অনুবাদের ভাষা যেমন সরল ও প্রাঞ্জল তেমনই মোলায়েম। আমরা বাল্যকালে "মুসলমানী বাংলা"য় লিখিত "চাহার দরবেশ" প্রভৃতি পড়িতাম। কিন্তু আজকাল আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ যেরূপ সুন্দর বাংলা লেখেন, তাহাতে আমাদের অবনত মস্তক হইতে হয়। ইহার মধ্যে পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে দুইটী স্থানে আমাদের মন আকৃষ্ট হইল, যথা—"আবেদের এবাদৎ রেয়াজত এবং সাধকের তপস্যা ও সাধনা ······ আর বিশ্ব-চরাচর কোন্ এক স্বর্গীয় ভাবের আবেশে ······ ছুটিয়া চলিয়াছে" (পৃঃ ৬৩)। পুনশ্চ,—"কৈশোরে, যৌবনে তুমি কপর্দ্দকহীন কাঙ্গাল ছিলে ······ যে মহাসম্পদ তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার যক্ষের ধন নহে ······ বিলাইয়া দাও তাহা অভাব-জর্জ্জরিত বিশ্ব-মানবকে" (৭৮ পৃঃ)। ফল কথা বাংলা সাহিত্যকে আপনি এক অপূর্ব্ব উপহার প্রদান করিলেন। আমার মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দু পাঠশালায় মোস্‌লেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাপস ও সাধুদিগের জীবনী ও উক্তি পড়ান উচিত। ইহাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রধান সহায়ক হইবে, আমার এইরূপ ধারণা।"

বাংলার বিখ্যাত নেতা ও কর্ম্মী মওলানা পীর বাদ্‌শাহ্ মিঞা সাহেব ৪ঠা পৌষ (১৩৩০ সাল) তারিখের একখানি পত্রে লিখিয়াছেনঃ—"আপনার 'আমপারা'র বঙ্গানুবাদ পড়িয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। অনুবাদ ও টীকার ভাষা অতি মধুর হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইয়াছে। আমি আশা করি, বাঙ্গলার প্রত্যেক মুসলমান ইহার এক একখানা ক্রয় করিয়া ও পাঠ করিয়া কোরআন পাকের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং প্রত্যেক নামাজে যাহা পাঠ করেন, তাহার অর্থ বুঝিয়া এবাদত করিতে সক্ষম হইবেন। আমি আশা করি, বাঙ্গলার অমুসলমান ভাইগণও ইহা পাঠ করিয়া এস্‌লামের মহিমা জানিতে অমনোযোগী হইবেন না। আমি ফকির, খোদাতালার দরবারে এই মোনাজাত করি,—দয়াময় আপনার এস্‌লামের খেদমতে নেক-বদলা এনায়েত করুন। আমি ইহার বহুল প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

"দৈনিক বসুমতী" বলেন :—……"মহাগ্রন্থ কোর-আনে ভাষার ও ভাবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার সঠিক ভাব বজায় রাখিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এমন কি তিনি ব্যতীত অন্যের দ্বারা এরূপ গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাংলার মোসলমানের সংখ্যা কম নহে, এবং পবিত্র কোরআনের এই অনুবাদও তাঁহাদের পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাংলার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীও ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন :—… …"মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফ 'আমপারার' অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাব ও ভাষার সরলতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।…… যাঁহারা ভাল আরবী জানেন না, তাঁহারাই কেবল এই 'আমপারা' পড়িয়াই পবিত্র কোরআনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।……প্রত্যেক সুরার অনুবাদ, ভাবার্থ ও টীকা সুন্দর হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য।…… ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।"

"প্রবাসী" বলেন :—……"মহাগ্রন্থ কোর-আন শরিফ ৩০ ভাগে বিভক্ত। আমপারা ঐ ৩০ ভাগের শেষ ভাগ।……আরবী শব্দের পাশাপাশি ইহার বাংলা অনুবাদ থাকায় ইহা পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।……প্রত্যেক দিন পাঁচবার নামাজের সময় মোসলমানগণ আমপারার সুরা পড়িয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোসলমান আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া সুরার ভাব ও মর্ম্ম অনুভব করিতে পারেন না। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধারণ মোসলমানগণ (যাঁহাদের সংখ্যা বাংলায় খুব বেশী) ইস্লাম ধর্ম্মের শিক্ষা ও সার বুঝিতে পারেন না। এই আমপারাখানি বাংলার মোসলমানের সে অভাব দূর করিবে।……ইহা হিন্দু-মোসলমান উভয় সম্প্রদায় সমাদরে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

ফরওয়ার্ড বলেন : … … This is a Bengalee translation of Ampara or the alst Chapter of the Holy Qoran………The Moulana Sahib has further embellished his translation with illuminative commentaries that render it easier even for a non-Muslim to grasp and appreciate the beauties of the Holy Scriptnres of our Mohammedan fellow-countrymen...The teachings of the Qoran are now accessible to the vast majority of our countrymen ; whose ignorance of Arabic had………stood in the way of their deriving instruction and inspiration from the Holy Book…"

DR. ABDULLAH SUHRAWARDY, M.A Bar-at-law, Ph. D. D. Lit, M. L. A writes… ..."In my opinion the most commendable feature of the work is the *BHABARTHA*. It is the soul of the SURAS dealt with, and couched as it is in a rapt, devotional and at times poetical style appeals to the spiritual sense of the reader...... *I strongly commend this "present from the prison" to the acceptance of the educated and cultured youth*……

সুবিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক "দি মুসলমান" বলিতেছেন :—(ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ) "মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বঙ্গানুবাদ 'আমপারা' মুসলিম সাহিত্য-জগতে এক অতি অমূল্য উপহার,—ইহাকে শুধু অনুবাদ বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে। ইহাতে কোরআনের মূল আরবী আয়ত স্বাধীন ও আক্ষরিক অনুবাদ ও তদুপরি গ্রন্থকারের টীকা ও ব্যাখ্যা সবই আছে। সত্যের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার টীকা ও টিপ্পনী সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু ভাষ্য টীকাকারের মতামত নিয়া বিচার-বিতর্ক জুড়িয়াছেন। কোরআনের কোন কোন অংশের ভাব ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়া তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে প্রবল যুক্তিতর্কের সমাবেশ রহিয়াছে। এবং তাহার অনেকাংশে অতীত টীকাকার ও ভাষ্যকারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে! ...... গ্রন্থকার কোরআন হইতেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুসলমানের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানুষের সেবা। সুতরাং যে মানব-প্রেমিক সে স্বদেশ-প্রেমিক না হইয়া পারে না। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের আমপারা পড়িয়া এবং তদনুরূপ আচরণ করিয়া প্রত্যেক মুসলমানই যে সমাজ-সেবী, সজ্জন ও স্বদেশ-ভক্ত হইতে পারিবেন, তেমন বিশ্বাস আছে।

এই কাগজের সম্পাদক গ্রন্থকারের সঙ্গে জেলে থাকিয়া এই অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে অসহযোগী মুসলিম বন্দীরা মিলিয়া এক কোরআন-ক্লাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ইহাতে শিক্ষা-দান ভার লইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বঙ্গানুদিত কোরআন হইতে ক্লাসে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। মওলানা সাহেব তাঁহার টীকা ও ব্যাখ্যা পড়িয়া যাইতেন, আর ছাত্রেরা তাঁহার চারিদিকে প্রশ্ন করিত। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা নেহাত কচি কচি বালক ছিলেন না,—বরং কেহ কেহ বয়সে তাঁহার বড় ছিলেন। এই সকল প্রশ্নোত্তরের ফলে কেবল যে তাঁহার ছাত্রেরাই জ্ঞানলাভ করিতেন, তাহা নহে; বরং অনেক সময় ওস্তাদজীকেও অনেক শিখিতে হইত। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা যে এই পবিত্র গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতত্ব বিচারক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পবিত্র গ্রন্থ আজ শুধু মুসলমানের নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমান বাঙ্গালীর হাতে শোভা পাইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। ইহার কাগজ, ছাপা বাঁধাই সবই পরিপাটী এবং অতি মনোরম।

সুনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—"আমপারার অনুবাদও এক বিচিত্র। কোরআনের দুরূহ পদাবলীর যে এরূপ মনোহর ও গভীর ভাবপূর্ণ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব— পূর্ব্বে কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে মওলানা সাহেব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন।"

স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য অভিমত দেওয়া গেল না।

[মোস্তফা-চরিত্রের মূল্য ৭৲। আমপারার মূল্য বাঁধাই ২৷০]